হাসির গল্প

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
২০, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

গ্রন্থন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

বৌদ্ধ-সাহিত্য ও ইতিহাসবেত্তা, পুরাতত্ত্ববিদ্, সুপণ্ডিত
ডক্টর সুকুমার দত্ত, এম. এ, বি. এল, পি. এইচ. ডি.

সুহৃদ্বরেষু—

বাঙালীর সারা জীবনটা কান্নার ভেতর দিয়েই কাটে। তাই, গল্প পড়িয়ে তাঁদের মুখে ক্ষণিকের একটু হাসি ফোটাবার ইচ্ছায়, আমি এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত হাসির গল্প লিখেছি, তা'র থেকে বাছাই করে কয়েকটা গল্প এই বইখানিতে দেওয়া গেল। গল্পগুলি 'মাসিক বসুমতী', 'দেশ', 'আনন্দবাজার', প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হ'য়েছিল। কয়েকটি ভাষান্তরিত হ'য়ে গুজরাটী, ইংরাজী ও হিন্দী পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে। শিশু-সাহিত্যের যশস্বী লেখক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের আগ্রহ, চেষ্টা ও পরিশ্রমে বইখানি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হল ; এজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

[illegible]ালয়া
[illegible]৬৬ বঙ্গাব্দ

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

—সূচী—

স্বর্গ-মর্ত্য

॥ প্রথম সিঁড়ি ॥

স্বর্গের ইন্দ্রালয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেবরাজ গালে হাত দিয়ে ব'সে আছেন। দুশ্চিন্তার কারণ অনেকগুলি। তন্মধ্যে প্রধান কারণ, মর্ত্য থেকে স্বর্গযাত্রীর সংখ্যা দিন-দিন কমে এসে, এখন এত কম সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে যে, স্বর্গকে আর স্বর্গ ক'রে রাখা দায় হ'য়ে উঠেছে। বহু মৃত লোক এখন স্বর্গের বদলে দলে-দলে অন্য একস্থানে যেতে লেগেছে। এর ফলে, সেই স্থানটা দিন-দিন যেমন গুলজার হ'য়ে উঠছে, স্বর্গের দপ্-দপানি সেই হারে দিন-দিন কমে আসছে। স্বর্গে জনসংখ্যা কমে আসার ফলে, স্বর্গ যেন মরুভূমি হ'য়ে উঠছে—মরুভূমি ঠিক নয়—আসল কথা, অর্থাৎ স্বর্গ যেন বনে-জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে। কিম্বা হয়তো দু' রকমই হচ্ছে। মোটকথা, জনসংখ্যা কমে গেলে, লোকসমাগম ও লোক-চলাচল কমে আসে, এবং তার ফলে সেই স্থান যা হ'য়ে পড়ে—তাই; অর্থাৎ, মরুভূমিও হ'য়ে পড়ে এবং চারিদিক বনে-জঙ্গলেও ভরে যায়। স্বর্গেরও সেই অবস্থা। পথে-ঘাটে ঘাস গজিয়ে গেছে; পার্ক-স্কোয়ারগুলোতে প্রাতঃ ও সান্ধ্য-ভ্রমণকারীর অভাব ঘটাতে সেগুলো জঙ্গলে ভরে গেছে। সরোবরগুলোতে কেউ আর নামে না, মনে হয়—সেগুলো যেন কচুরি-পানার মাঠ। নিয়মিত বৃষ্টির অভাবে 'মন্দাকিনী'র জল শুকিয়ে আসছে; 'নন্দন'এর ভালো-ভালো গাছপালা জলাভাবে নিস্তেজ ও পুষ্পশূন্য হ'য়ে আসছে। বড়-বড় গাছের সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে, সুতরাং বৃষ্টি হবে কেমন ক'রে? যে-স্বর্গ একদা গাছে-গাছে অন্ধকার হ'য়ে থাকত, দেবতা ও পুণ্যাত্মাদের আলোকে যে-অন্ধকার বিন্দুমাত্রও হ্রাস পেত

না, আজ সেখানে আলোয়-আলোয় কুরকুট্টি। এ-আলো মরুভূমির আগুন-আলো, ধ্বংসের দহন-আলো। আবার নতুন ক'রে গাছ না বসালে, বৃষ্টিও আর হবে না, এ আগুন-আলোও নিভবে না। বছর-দশেক আগে দেবরাজ এর কারণ অনুসন্ধানের জন্যে কমিটি বসিয়েছিলেন। তাঁরা রিপোর্ট দাখিল করেন যে, পূর্বে হু-হু ক'রে মর্ত্য থেকে যে-সব স্বর্গযাত্রী আসতেন, তাঁদের বাস-গৃহের জন্যে লক্ষ-লক্ষ বৃক্ষ সে সময় কর্তন করা হয়েছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে একটিও······

দেবরাজ যখন এই সব কথা চিন্তা করছিলেন, তখন শচীদেবী ঐ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং স্বামীর চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ বদন দেখে, চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দেবরাজ তাঁর চিন্তার কারণ বলাতে, শচীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন যে, একটা গাছ কাটলে, তার জায়গায় পাঁচটা চারা বসাতে হয়; সেটা করা হয়েছিল কি?

দেবরাজ বললেন—আগে হয় নি, তবে আজ দশ বছর থেকে প্রত্যেক বছরেই লক্ষ-লক্ষ গাছ পোঁতা হচ্ছে, আর তার জন্যে লক্ষ-লক্ষ ছাগল-ঘেরাও তৈরি করাতে হচ্ছে।

এখানে বলা দরকার যে, স্বর্গের এক-একটা 'ঘেরা' কুড়ি-বাইশ ফুট উঁচুর কম হয় না। মর্ত্যের ছাগলদের জন্য দু' ফুট উঁচু ঘেরাই যথেষ্ট, কিন্তু স্বর্গের অজগণের পক্ষে তা কুড়ি ফুটের কম হলেই তাঁরা দু' পা তুলে, মুখ বাড়িয়ে সব চারাগাছ মুড়িয়ে খেয়ে যাবেন।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলেন—এই দশ বছরে কত গাছ তোমাদের জন্মাল?

—তা হবে বই কি, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ তো বটেই।

—কচু! একটাও জন্মায় নি। লাগানো হয়েছিল, সেটা হয়তো সত্যি, কিন্তু সব মরে গেছে। শচীদেবী স্বামীকে রাগাবার জন্যেই চাপা-রহস্যের সুরে কথাটা বলে ফেলেছিলেন; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই জিভটা কেটে এবং মনে-মনে বেশ-একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

কারণ 'কচু' কথাটা স্বর্গে বে-আইনী এবং নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ, তার কয়েকটা কারণ আছে। তার মধ্যে একটা এই যে, অসুরগণ যখন-তখন হুঙ্কার ছেড়ে ভয় দেখাত যে, দেবতাদের তারা 'কচুকাটা' করবে। তাই দেবতারা ঠিক করলেন যে, স্বর্গের দেবতাদের যখন কচু গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তখন ঐ নিকৃষ্ট গাছটা স্বর্গের ঝোপে-ঝাড়ে আর রাখা হবে না, সব তুলে এবং পুড়িয়ে, ঐ দ্রব্য অসুরদের খাবার জন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। ওর নামটাও যেন স্বর্গের কেউ আর উচ্চারণ না করে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দেবগুরু বৃহস্পতি-তনয় শ্রীমান কচ কর্তৃক দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য-তনয়া শ্রীমতী দেবযানী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে, শ্রীমতী চব্বিশ ঘণ্টা মনে মনে 'কচ'-এর ধ্যান করত এবং 'কচ' কিংবা 'কচু' নাম শুনলেই বা কচুগাছ দেখলেই, পাগলিনীর ন্যায় বিহ্বল হয়ে সেইখানে ছুটে আসত। তাই, পাছে স্বর্গের কচু-বন দেখে বা কচু নাম শুনে দেবযানী সেখানেও ধাওয়া করে এবং ঐ সূত্রেই আবার দৈত্যরা গোলমাল বাধায়, তাই সেখানকার বেবাক কচুগাছ উপড়ে তুলে দেবতারা নীচে ফেলে দিলেন, যাতে নিষ্কচু-স্বর্গের দিকে দেবযানীর আর দৃষ্টি না পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে কথাটার উচ্চারণও আইন করে স্বর্গে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল।

সুতরাং ঐ নিষিদ্ধ কথাটা অনবধানবশতঃ বলে ফেলেই শচীদেবী ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লেন এবং নিতান্ত অপরাধীর মতো বিনয়-সহকারে বললেন—হঠাৎ মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেছে নাথ! ওটা 'কচু' নয়—'ঘেঁচু'। আমি ভিক্ষা করি তোমার ক্ষমা।

ভাষার ঢং দেখে দেবরাজ মনে-মনে চমকে উঠলেন—'আমি ভিক্ষা করি তোমার ক্ষমা'! এ কি রকম ভাষা? তা আবার শচী-দেবীর মুখে! স্বর্গের এই দুঃসময়ের দিনে তিনি শচীদেবীকে কিছু অনুযোগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না; নীরবে ব'সে রইলেন।

এখানে বলা দরকার যে, গত বছর একজন পুণ্যাত্মা সায়েবকে ভুল করে এই স্বর্গে আনা হয়েছিল। তিনি ভালো 'পিয়ানো'

বাজাতে পারতেন। শচীদেবী উর্বশী, মেনকা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর কাছে প্রত্যহ 'পিয়ানো' শিখতেন। কিন্তু মাস-কয় হ'ল এঁরা ভুলটা বুঝতে পেরে, তাঁকে খৃষ্টানী স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বর্গে এ জিনিসটার চল আছে। অনেকটা এখানকার বন্দী-বিনিময়েরই মতো।

ইন্দ্রাণী লজ্জা পেয়ে আর দাঁড়ালেন না। যেজন্যে এসেছিলেন, তা আর তাঁর বলা হল না। তিনি ধীরে-ধীরে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। দেবরাজ ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন, আর অনেক কথাই চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করতে লাগলেন, তাঁর ঘরের অশান্তিও তো কম নয়। চিরকাল তাঁর পূর্ণাঙ্গিণী অর্থাৎ ইন্দ্রাণী মুখে-হাতে পারিজাতের রেণু ব্যবহার করতেন, এখন তার জায়গায় পৃথিবী থেকে নানা রকম নতুন নতুন পাউডার, স্নো, ক্রীম প্রভৃতি আনিয়ে সেই সব ব্যবহার করেন, যার ফলে তাঁর স্বর্গীয় মুখ দিন-দিন অস্বর্গীয়ভাব ধারণ করছে। তা ছাড়া, আজকাল অপ্সরাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায় লেগেই আছে। ওদিকে, দেবতাদের মধ্যেও নানা রকম উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ দিন-দিন জমে উঠছে। মোট কথা, কি প্রাকৃতিক, কি সামাজিক, কি পারিবারিক—সকল বিষয়েই যেন একটা পরিবর্তনের ভূতুড়ে হাওয়া স্বর্গে এসে লেগেছে!

—গুড মর্নিং দেবরাজ!—হাসতে হাসতে নৃত্যের ছন্দে উর্বশী প্রবেশ করলেন—আশা করি, আপনি বা আপনারা হন সমস্ত ঠিক?

চম্‌কে উঠলেন দেবরাজ। জিজ্ঞাসা করলেন—এ-সব কী কথা? কোত্থেকে শিখলে? মনে মনে বুঝলেন, এ সেই খৃষ্টানী-স্বর্গযাত্রীটির এক বছর কাল স্বর্গে অবস্থানের ফল। মাত্র একটি বৎসর। না-জানি দু'শো-একশো বছর থাকলে কী সাংঘাতিক হত স্বর্গের অবস্থা! কিন্তু তাদেরই দোষ বেশী যারা ওদের প্রভাবে পড়ে নিজেদের চিরকালের সব-কিছু জাতীয়তা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদর্শ প্রভৃতি হারিয়ে ফেলে। উর্বশীর দিকে চেয়ে

বললেন—যেখান থেকে এই ধরণের কথা শিখেছ, তা বুঝতে পেরেছি। এ ভালো নয় উর্বশী, মোটেই ভালো নয়। স্বর্গের আদর্শ আর ভাবধারার মধ্যে মাটির পৃথিবীর কোনও-কিছু মিশিও না। স্বর্গ তা হলে আর স্বর্গ থাকবে না, নরকেরও হীন হয়ে পড়বে।···যাক, কোনো দরকার আছে আমার সঙ্গে?

উর্বশী মনে মনে একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। তা হ'লেও স্মিতমুখে বললেন—আছে দেবরাজ।

—কী দরকার, বল; আজ আমার শরীর একটু খারাপ আছে।

—শরীর খারাপ!—চম্‌কে উঠে উর্বশী বললেন—শরীর খারাপ! তা হলে কি একটু নাচের ব্যবস্থা করব?

—না, তোমাদের আজকালকার নাচে শরীর আরও খারাপ হ'য়ে পড়বে। তোমাদের দরকারটা কী, তাই বল।

—দরকারটা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ একবার মর্ত্যের কোলকাতাটা দেখে আসবার ইচ্ছে করছেন।

—তা, হঠাৎ কোলকাতাটা দেখবার ইচ্ছে হল কেন সকলের?

—বহুকাল পরাধীনতার পর, ভারত স্বাধীন হয়েছে ত, তাই এখন একবার তার মুকুটমণি কোলকাতাকে দেখে আসবার জন্যে ওদের···

—হ্যাঁ, মুকুটমণিই ছিল বটে, কিন্তু···যাক সে-সব কথা। তা, এতে আমার কোনই অমত নেই; যার যার ইচ্ছে হয়, যেতে পার, তবে···

—তবে কি দেবরাজ?

—বলছি যে, শুধু ক'জন অবলা মিলে যাওয়া তো ঠিক নয়, সঙ্গে অন্ততঃ একজন···

—যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা যদিও ঠিক অবলা ন'ন, তা হ'লেও, 'উপো' ভাইপোকে ওরা সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করছেন। কারণ এর আগে উপো দু'-দু'বার ওখানে ঘুরে এসেছে। ওখানকার পথ-ঘাটের সম্বন্ধেও খুব ওয়াকি-বহাল।

—ভালো। তা তুমিও তো ওদের সঙ্গে যাচ্ছ, উর্বশী ?

—না, সুরপতি। আমি শাপগ্রস্ত হ'য়ে অনেক দিনই পৃথিবীতে থেকে এসেছি। পৃথিবীতে আমার অরুচি জন্মে গেছে ; আর পৃথিবীর লোকদেরও আমার ওপর অরুচি ধরে গেছে। মেনকাও যাবে না।

—তা বেশ, আমার কোন অমত নেই। তুমি যেতে পার এখন।

উর্বশী সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে, যেমনভাবে প্রবেশ করেছিল, তেমনি ভাবে হাল্কা নাচের ছন্দে দেবরাজের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

॥ দ্বিতীয় সিঁড়ি ॥

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন প্রত্যূষে একদল সুন্দরী যুবতীকে দিল্লীর রাজঘাটের পথে অগ্রসর হ'তে দেখা গেল। সংখ্যায় দ্বাদশ। তাঁরা ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসকে চঞ্চল করে, ধীর পদ-বিক্ষেপে, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থানে এসে দাঁড়ালেন ও নতজানু হ'য়ে শ্রদ্ধাভরে নিজ-নিজ মস্তক সমাধি-বেদীমূলে স্থাপন করে সেখানকার ধূলি সকলেই আপন-আপন ললাটে স্পর্শ করালেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—এইবার সরাসরি কোলকাতায় যাওয়া যাক।

এঁদের সঙ্গে চঞ্চল প্রকৃতির একমাত্র যে-কিশোরটি ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—তা কি হয়? আর কিছু না হোক, তাজমহলটা তো দেখতে হবে। এই কিশোরটির নামই 'উপো'। এর আগে দেবগণ যখন মর্ত্যে আসেন তখন এই 'উপো'ই তাঁদের সঙ্গে ছিল। 'উপো'র তখন বালক বয়স। পৃথিবীর হিসাবে তা বহু বৎসর হলেও স্বর্গের হিসাবে কয়েক বৎসর মাত্র, অর্থাৎ বালক 'উপো' এখন কিশোর বয়স্ক। 'উপো'র কথামত অপ্সরাগণ সেইদিনই ট্রেনযোগে আগ্রায় এসে 'তাজমহল' দেখলেন। 'তাজ' দেখতে তাঁদের অনেক সময় গেল। 'তাজ'-এর অপরূপ সৌন্দর্যে সকলে মুগ্ধ হলেন ও নানারূপে 'তাজে'র প্রশংসা করতে লাগলেন।

শুধু 'রুচিরা' নামা অপ্সরা কোন কথা না বলে নীরবে তাজের দিকে চেয়ে বসে রইলেন। বিদ্যুৎপর্ণা তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি যে কিছু বলছ না, রুচিরা?

রুচিরা একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমি মরে গেলে, আমার মৃত দেহের ওপর এই রকম একটা সমাধিবাড়ী যদি তৈরি হয়, তাহ'লে এই দণ্ডেই আমি পৃথিবীতে জন্মে কোনও মানবের স্ত্রী হ'তে রাজি আছি।

উপো খুব বাহাদুরির ভাব দেখিয়ে বললে—তোমরা তো বই-টই তেমন কিছু পড় না, কত কবি এই তাজমহল সম্বন্ধে কত কি লিখেছেন। উরু পিসির সম্বন্ধে যিনি সেই সুন্দর কবিত লিখেছিলেন, তিনি……

উপোর কথাটা শেষ না হ'তেই 'নাগদত্তা' বললেন—রবীন্দ্রনাথ?

—হ্যাঁ! অত বড় কবি পৃথিবীর মধ্যে আর কেউ নেই। পৃথিবীর অন্য অন্য দেশ, তাদের দেশের কবিদের নিয়ে যতই বড়াই করুক, সব দিক দিয়ে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। 'তাজ' সম্বন্ধে তিনি যে কবিতা লিখেছেন, তা যে কত সুন্দর, তা আর বলবার নয়। তা ছাড়া, শুধুই কি তিনি……

'সোমা' কথার পিঠেই বলে উঠলেন—'উর্বশীদি'র নামেও তিনি কবিতা লিখেছিলেন না কি?

উপো প্রাজ্ঞের মতো বলল—কিছুই তো খবর রাখ না তোমরা……

> 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
> হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!'

এত বড় কবি পৃথিবীতে হয় নি, হবেও না। দেবরাজ বলেন—'উনিই বাল্মীকি, উনিই কালিদাস, এ জন্মে রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মেছেন।'

তিলোত্তমা উৎসুকভাবে বলে উঠলেন—কোলকাতায় গিয়ে ওর বাড়ীটা আমাদের দেখাবে উপো ?

—নিশ্চয় দেখাব। ওর বাড়ি দেখাব, ওর কীর্তি ও শেষ জীবনের সাধনার স্থান—'শান্তিনিকেতন'—তাও ফেরবার পথে দেখাব। তারপর বিবেকানন্দের গৌরব কীর্তি—বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ী, তারপর আরও আরও যা দেখাবার তা সবই দেখাব।

ঘৃতাচী বললেন—ঢাকুরিয়া লেকটাও একবার দেখিয়ে এনো।

—সব দেখাব পিসিমা, সব দেখাব। বলে উপো তাজের দিকে চেয়ে থেকে নিজের মনে গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগল—

—'প্রেমের অমৃত, আর বিরহের দীর্ঘশ্বাসে ভরা,
কন্দর্পের কণ্ঠচ্যুত পারিজাত মালা এক ছড়া !'

তিলোত্তমা বললেন—তাজমহল, না ? কে এটা লিখেছে রে ? তুই ?

—হুট্ ! আমি এসব পারি কখনও ! এটা লিখেছেন অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।—তারপর একটু চুপ করে থেকে উপো বললে—আর একটু পরেই কোলকাতার গাড়ী ; আর এখানে দেরি করলে চলবে না কিন্তু।

তখন সকলে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাজমহল ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

॥ তৃতীয় সিঁড়ি ॥

ট্রেন ছুটছে। চারিদিকে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার।

ছুটতে ছুটতে যেন ক্লান্ত হয়ে, খুব একটা বড় স্টেশনে এসে থামতেই, 'রুচিরা' উপোকে জিজ্ঞাসা করলে এটা কোন্ স্টেশন রে ?

উপো দাঁড়িয়ে উঠে বলল—বদ্ধোমান। সেই 'বিদ্যেসুন্দরে'র বদ্ধোমান, সেই 'সীতাভোগ-মিহিদানা'র বদ্ধোমান ! 'বদ্ধোমানের রাঙ্গামাটি, লাগে যেন দাঁত-কপাটি', 'কোঁচা ছোট, কাছা টান্—তার বাড়ী বদ্ধোমান'···আমি বাবা স—অ—অ—ব জানি !

পাশের একটি প্রৌঢ়বয়স্ক লোক সহাস্য মুখে উপোর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—ছোকরার খুব তালিম আছে দেখছি। তুমি তো দেখছি অনেক-কিছুই জানো হে।

—নিশ্চয়ই-ই-ই; না জানলে কি চলে মশাই? আপনার বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি? আমি থাকি এইখানেই, বাড়ি আমার 'মানকর'—'মানকর' জান তো?

—খু-উ-উ-উ-ব জানি। 'যত দেখবে হালুইকর,
সবার বাড়ি মানকর।'

—বলুন ঠিক কি না?

ঘৃতাচী উপোকে একটা ধমক দিয়ে বললেন—বড্ড ফাজিল হ'য়েছ তুমি, উপো; কী হচ্ছে এসব? চুপ করে বসে থাক, তা না হ'লে ফিরে গিয়ে আমরা তোমার সব কথা দেবরা…

ঘৃতাচীর বাকি কথা আর শেষ হ'তে পেল না; বন্যাস্রোতের মতো লোকের পর লোক এসে গাড়ি ভর্তি করে ফেললে। অসংখ্য প্যাসেঞ্জার—মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো হু-হু করে ঢুকে পড়ল। গাড়ির মধ্যে তিল ধারণের আর স্থান রইল না। তাদের ঠেলা-ঠেলি, চেঁচামেচি আর হট্টগোলে সকলে গলদঘর্ম হয়ে উঠল। উপো বলল—তখন বলেছিলাম, তোমরা মেয়েদের গাড়িতে যাও। আমার কথা যেমন শোননি, তেমনি সব এখন ভোগো। অপ্সরারা একেবারে 'চিড়ে-চ্যাপটা' হ'য়ে যেন 'ত্রাহি ত্রাহি' জপ জপতে লাগলেন। 'সুবাহু' আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন—এ কী ব্যাপার! আমি আর যাব না; এখান থেকেই আমি ফিরে যাব, আর মর্ত্যে যাব না।

—মরতে যাওয়াই বটে! আধখানা পেরাণ তো হ্যাথাই বায়েরা গ্যালো!—পার্শ্বে দণ্ডায়মানা এক যুবতী সুবাহুর উদ্দেশ্যে ঐ কটা কথা বলে ঠেলাঠেলির তাল সামলানোর দিকে মনোযোগ দিলে।

স্বাধীনতার বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কোলকাতার রূপ-সজ্জা আলোকমালা ইত্যাদি দেখবার জন্যই এই অসংখ্য নর-নারীর প্রাণান্তকর উৎসাহ ও ভিড়। এই ভীষণ ভিড়ের ঠেলা খেয়ে, ও-দিকের এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক সখেদে বলে উঠল—ক্যামনতরো মনিষ্যি গো? চেপ্টে মেরে ফেলবে না কি? রদিষ্টের ঝক্‌মারি, তাই অজুনীর-মাব কথা শুনে এলুম; এ-রকমডা জানলে কি আর আসতুম!

পাশ থেকে রজনীর মা ফোঁস করে উঠল—হ্যাঁলা ফ্যালার মা, মুই কি তোকে জোর করে এনেচি? তুই-ই তো নাপিয়ে উঠলি লা—কোলকাতার ওশনাইটা দেখে আসতে পারলে জীবনডা ধোন্যি হোত।—বল্, বলিসনি তুই? ধম্মো সাক্ষী জানবি।—অত বড় সাক্ষীর ভয়ে ফ্যালাব মার মুখ সঙ্গে-সঙ্গেই একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল।

এদিকে স্টেশনেব পর স্টেশন অতিক্রম করে, গাড়ী ব্যাণ্ডেলে এসে দাঁড়াল। একজন প্যাসেঞ্জার জানলার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে 'পানি পাঁড়ে' 'পানি পাঁড়ে' বলে চেচাতে শুরু করাতে, 'সোমা' উপোকে জিজ্ঞাসা কবলেন—কি জিনিসটা?

উপো বললে—জল; খাবেন পিসিমা?

—ভালো জল ত?

—এখানকার জল সব কলের জল; ভালো-মন্দ কি বলব পিসিমা।

ফ্যালাব মা সোমার দিকে চেয়ে বললে—রিষ্টিশানে সব পাতাল-কলেব জল মা, আপনি খেতে পার।

সোমা মনে-মনে ভাবতে লাগলেন—স্বর্গের লোক, মর্ত্যে এসেই হিম্-শিম্ খেয়ে যাচ্চি, এব ওপর মর্ত্য যুঁড়ে পাতালের জল খেলে হয়তো আমাদের রসাতলে গিয়ে পড়তে হবে।

উপো বললে—জলের চেয়ে একটা জিঞ্জারেড কি আইসক্রিম-সোডা খাও পিসিমা, প্রাণ তর্ হয়ে যাবে।

রুচিরা উপোকে জিজ্ঞাসা করলেন—সেটা কী জিনিস উপো ?

সহানুভূতিসম্পন্না হ'য়ে রজনীর মা পাশ থেকে সোমার দিকে চেয়ে বললে—খেয়োনি মা-ঠাক্‌রোন, সে তোমরা খেতে পারবেন নি। বোতলের ঢেউ, দম আটকে যাবে গো, মা!

বোতলের ঢেউ! অপ্সরারা সকলেই জিনিসটার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু গাড়ী তার জন্যে আর অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল না, হুস্‌-হুস্‌ করতে করতে সে প্ল্যাটফরম ছেড়ে ছুটতে শুরু করল।

ঘণ্টা-খানেক পরেই ট্রেন হাওড়ায় এসে একেবারে দম ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গেই উপো বলে উঠল—আগে ভিড় কমে যাক, এখন তোমরা গাড়ীতেই বসে থাক, নেমো না।

মিনিট পাঁচেক গাড়ীর মধ্যে বসে থেকে এবং আরও প্রায় আধ ঘণ্টা সময় প্ল্যাটফরমের একধারে দাঁড়িয়ে থাকবার পর, সকলে স্টেশনের বাইরে এসে পড়লেন। কিন্তু এত কষ্ট করে অপ্সরারা বাইরে এসে দেখলেন যে, সারা কোলকাতা অন্ধকার!

অন্ধকার মানে, আলোয় আলোয় অন্ধকার!

স্বাধীনতার বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সারা কোলকাতায় এত বিচিত্র সজ্জার সঙ্গে এত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, সেই সব অগণিত আলোকের উজ্জ্বল দীপ্তি, একটা মানুষের মাত্র ছুটো চোখের দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাই প্রথমটায় সকলে দেখে—অন্ধকার!

দীর্ঘ পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। সুতরাং একটু এদিক-ওদিক ঘুরে, তাঁরা হোটেলের সন্ধানে একস্থানে দেখলেন, পাশাপাশি দুটি হোটেল; একটির নাম—'রিভার-সাইড্‌ হোটেল', অপরটির নাম—'মা-গঙ্গা হোটেল'। তাঁরা 'মা-গঙ্গা'তেই আশ্রয় নিলেন।

॥ চতুর্থ সিঁড়ি ॥

পরের দিন সকাল বেলায় 'মা-গঙ্গা হোটেলে'র ম্যানেজার অপ্সরাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা ক'দিন থাকবেন ?

তিলোত্তমা বললেন—আমাদের থাকার কোন ঠিক নেই : সাতদিনও থাকতে পারি, আবার তার চেয়ে পাঁচ-সাতদিন বেশীও থাকতে পারি।

বিনয়ের সঙ্গে ম্যানেজারবাবু বললেন—আপনাদের ইচ্ছামত যতদিন হয় থাকবেন। দোতালার এই ঘরখানার ভাড়া রোজ চার টাকা হিসেবে। আর আপনাদের খাবার চার্জ পড়বে রোজ প্রত্যেকের জন্যে পাঁচ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা হিসেবে। সকাল-সন্ধ্যা দু' টাইম চা, তার সঙ্গে টোষ্ট বা বিস্কুট জেলি। দিনে ভাত-ডাল-তরকারি, মাংস, দই। আর রাত্রে ভাত বা রুটি, তরকারি, মাছ, দুধ। বেলা পাঁচটায় লাইট টিফিন। তা ছাড়া···

উপো জিজ্ঞাসা করলে—মাংসটা কি ফাউলের ?

—সেটা হয় রবিবার-রবিবার, কিম্বা কোন স্পেশ্যাল দিনে।

তিলোত্তমা বললেন—মাংসটা আমাদের দরকার হবে না, আমরা নিরামিষই···

—আমাদের মাংস গঙ্গাজলে রান্না করা হয়, সুতরাং···

—না, ও জিনিসটা আমাদের দরকার হবে না ; আমরা নিরামিষই খেয়ে থাকি। যাই হ'ক, আমাদের তা হলে রোজ সকলের জন্যে কত করে দিতে হবে সেইটে বলে দিন !

—ধরুন না, ছ-তেরং আটাত্তর থেকে তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা বাদ গেলে, হবে গিয়ে আপনার চুয়াত্তর টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা ; তার ওপর ঘরের দরুণ চার, অর্থাৎ মোট আটাত্তর টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

ও-ধার থেকে 'নাগদত্তা' জিজ্ঞাসা করলেন—নয়া পয়সাটা কি জিনিষ ? আগে কখনও তো শুনিনি।

উপো একটু নড়ে-চড়ে টপ্ করে বলে উঠল—আরে এন পি.—এন পি !

তিলোত্তমা বললেন—আমাদের তা হ'লে রোজ দিতে হবে, ঘরভাড়া নিয়ে আটাত্তর টাকা—

—পঁচাত্তর নয়া পয়সা। তবে, আপনারা যখন নিরামিষ খাবেন, তখন কিছু কম দেবেন। আপনারা রোজ পঁচাত্তর টাকা হিসেবেই দেবেন। সাতদিনের য়্যাডভান্স করতে হয়।

তিলোত্তমা উপোকে টাকাটা হিসেব করে দিয়ে দিতে বললেন। তারপর ম্যানেজারকে বললেন—আপনাদের চার্জ বড্ড বেশী !

—কিছুমাত্র বেশী নয়, মা। সব জিনিসই অগ্নিমূল্য। চার টাকার চাল চল্লিশ টাকায় উঠে, এখনও ঊর্ধ্বদিকে তার দৃষ্টি। তেল-ঘি, ডাল, চিনি, মশলা, তরি-তরকারি, মাছ,—সবই দশ-বারো গুণ চড়েছে। সে তুলনায় আমাদের চার্জ মোটেই বেশী নয়।

হোটেলে তুইজন ভৃত্য এঁদের জন্যে চা ও টোষ্ট ইত্যাদি আনাতে সব কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। উপো থলির ভেতর থেকে একতাড়া নোট বার করে গুনতে লাগল।

॥ পঞ্চম সিঁড়ি ॥

তিন দিন হ'ল অপ্সরারা কোলকাতায় এসেছেন। এই তিন দিনেই তাঁরা সারা শহরের যেখানে যা দেখবার সবই দেখে বেড়িয়েছেন। শুধু বেড়ানোই নয়, প্রত্যেকে অনেক কিছু জিনিস-পত্তরও নিজের পছন্দমতো কিনেছেন। 'রুচিরা' কতকগুলি বই কিনেছিলেন, তাই খুলে দেখছিলেন। উপো সেই দিনের খবরের কাগজখানা চোখের সামনে খুলে তাই গিলছিল।

—আজ কোথায় যাচ্ছেন আপনারা ? প্রশ্নকর্ত্রী হাসিমুখে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই, তিলোত্তমা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে

বসতে বললেন। ইনি ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী। নীচেকার একখানা ঘরেই ম্যানেজারবাবু সস্ত্রীক থাকেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তিলোত্তমা বললেন—আজ গড়ের মাঠে ঐ কি-যে-একটা কাণ্ড হবে তাই দেখতে যাব ঠিক হয়েছে। আমরা বিদেশে থাকি এসব তো দেখতে-শুনতে পাই না, তাই দু' দিনের জন্যে এসে, একটু দেখে-শুনে যাওয়া। তা, বেশীদিন থাকবারও উপায় নেই। তা ছাড়া খাবার-দাবার জিনিসপত্রর যা অগ্নিমূল্য, তাতে···

—ও-কথা আর বলবেন না, জিনিসপত্রের দাম দিন দিন একেবারে স্বর্গে গিয়ে ঠেকছে! ঐ সঙ্গে আমরাও যদি সশরীরে সেখানে উঠতে পারতুম, তা হ'লে এখানকার এই কষ্টটাকে গ্রাহ্য না করে সহ্য করে নেওয়া যেতে পারত। বলুন, ঠিক কি না?—বোলে ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী হাসতে লাগলেন।

রুচিরা তাঁর বইগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—স্বর্গেও কিন্তু সুখ নেই জানবেন।—আরও কিছু তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, তিলোত্তমার ইশারাতে চুপ করে, আবার তাঁর বইগুলোর ওপর মনোযোগ দিলেন।

ম্যানেজার-পত্নী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও-সব কী বই কিনলেন?

—এই দু' একখানা গল্প-উপন্যাস আর কবিতার বই। কিন্তু লেখা পড়ে কিছু তো বোঝবার উপায় নেই। অথচ দোকানদার বললেন—এইগুলো না কি খুব নাম-করা বই।

—কি নাম?

—কবিতার এই বইখানার নাম 'এক পাউণ্ড প্রেম'। নামটার মানেও বুঝতে পারলুম না। ভেতরকার কবিতারও না।

—মানে বোঝা যায় না? তা হ'লে নিশ্চয়ই খুব ভালো বই, এর আর কোন সন্দেহই নেই। পড়ুন তো ওর একটা কবিতা, শুনি।

রুচিরা এক জায়গায় খুলে পড়তে লাগলেন—

দুর্দিনের অভিসার !

'একটা—
নিঝুম রাত্রির ঝুম্ ঝুম্ লগ্ন।
ছুটেছে চারিদিকে সাহারার অগ্নিরাশি—গুম্ গুম্ গুম্।
তারি পরে আমার প্রণয় অর্ণবপোত চলিয়াছে ভাসি—
দড়ি-দড়া লোহা-লক্কড় সহ।
তর্-তর্ থর্-থর্ দর্-দর্ ধর্-ধর্ মর্-মর্ !
প্রবল তুষার পাতে অনর্গল—অবিরল—অন্তরল ;
প্রেমের হৃদপিণ্ড তায় গেল জমাটিয়া আমার।
মহাশূন্যে চেয়ে চেয়ে হলুদ-রঙা-আঁখি—
চোখ গেল ঠিক্‌রিয়ে—তারাসহ—মুণ্ডসহ,
এবং প্রাণ গেল হৃদ্‌পিণ্ডসহ…'

—থাক, এ শুনে আমাদেরও প্রাণ ঠিক্‌রে বার হবার উপক্রম হচ্ছে ! হাসতে হাসতে ম্যানেজার-পত্নী বললেন।

রুচিরা গল্পের বই একখানা হাতে নিয়ে, এক জায়গায় তার থেকেও পড়তে পড়তে চোখ নামিয়ে বললেন—এ-সব তো কিছুই মানে বোঝবার উপায় নেই :

'এক কাঁচ্চা ঘুমও কেন জানি না আসেনি ভরসা করে মিতালী করতে চোখ-পল্লবের সঙ্গে—গোটা কাল্‌কের হা-হুতাশিত রাতের মধ্যে। অন্তর-কুঞ্জের বীথিতে বীথিতে ছিল অতৃপ্ত ভ্রাম্যমান কান্নার একটি উদগ্র অদমনীয় তেজস্ক্রীয়তাপূর্ণ—বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ; মহা প্রেম-সাগরের মাঝে আমরা দু'জন যেন 'রোডস্' এবং 'সাইপ্রাস'। প্রেমের দেবতার নিক্ষেপিত দুই হাতের দুইটি মাংসময় প্রাণ। মধ্যে তার অপদেবতার নিষ্ঠুর অভিশাপ রূপ—মহাশত্রু ভূমধ্য সাগরের লবণাক্ত বিপুল বারি-ব্যবধান…'

—সুতরাং এ-ও নিশ্চয় খুব ভালো বই, তার আর কোন সন্দেহই নেই। গোড়ার পাতায় দেখুন, নিশ্চয়ই দু' বছরের ভেতর এর তেরোটা সংস্করণ হ'য়ে গেছে—ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী বললেন।

এই সময় ম্যানেজারবাবুর পাঁচ বছরের ছেলেটি এসে বললে—আইয়ে মায়ি, বাবু ডাক্‌তা হায়।

ঘৃতাচী জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, ছেলেটি এরকম কথা বলে কেন ?

—আমাদের বাংলা কথার বদলে তো শিগ্‌গির হিন্দি চলবে, তাই বাবু ওকে এখন থেকেই রপ্ত করাচ্চেন।

—ও ! তাই নাকি ? বাঙ্গলা আর থাকবে না ?

—না।

বিদ্যুৎপর্ণা বললেন—অবশ্য সমস্ত বাংলা দেশের কথা বলতে পারি না, কিন্তু এ-ক'দিন কোলকাতা ঘুরে-ফিরে দেখলাম, বাঙ্গালী খুবই কম; অন্য অন্য প্রদেশের লোকেই তো কোলকাতা ঠাসা। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, মুদী—সবই তো দেখি অ-বাঙ্গালী। আফিসের বড় বড় কেরাণী, কেশিয়ার তারাও তাই। বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালীরা সব গেল কোথায় ?

একটু হাসতে হাসতে ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী বললেন—কোথাও যায়নি, বাঙ্গালী ঠিকই আছে। সময় হ'লেই দেখা দেবে। এখন তাদের দেখতে পাবেন—সিনেমার হলে আর ফুটবলের মাঠে।

এই সময় ছেলেটি তার মাকে আবার তাগাদা দিলে—আও না মায়ি।

ম্যানেজার-পত্নী তার হাত ধরে নীচে নেমে গেলেন।

॥ ষষ্ঠ সিঁড়ি ॥

ওই দিনই অপরাহ্ণ কালে গড়ের মাঠে লোকে-লোকারণ্য। কি-একটা ভয়ানক কিছু হবে। অতি কষ্টে অপ্সরারা একটা বৃক্ষতলে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভিড়ের বন্যা সেখানেও তরঙ্গাঘাত করছে। সুতরাং যা দেখবার জন্যে তাঁরা এসেছিলেন, তার কিছুই তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না, শুধু ভিড়ের ধাক্কা খাওয়াই সার হচ্ছে।

গাছের উঁচু ডালে পর্যন্ত লোক উঠেছে। যে গাছটার তলায় তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তার ওপরেও দু' চারজন উঠে বসেছিল। 'সোমা'র আর মোটেই ভালো লাগছিল না, তিলোত্তমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার আর এখানে একেবারে থাকতে ইচ্ছে করছে না; এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। ঠিক এই সময়ে গাছের ওপর থেকে ঈষৎ উষ্ণ একটা জলীয় পদার্থ তিলোত্তমার মাথায় পড়ে, মুখে, বুকে ও কাপড়ে ছিটকে পড়ল। তিনি চম্‌কে উঠে, ঘৃণা ও রোষভরে উর্ধ্বদিকে তাকাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

ব্যাপার বিশেষ গুরুতর কিছু নয়।

দু' চারজন অত্যুৎসাহী ছোকরা-দর্শক সময় থাকতে এসে সেই গাছটার ওপর ডেরা নিয়েছিলেন। তাঁরা পিঠে-ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে ফ্লাস্ক ভর্তি চা ও কাপ ইত্যাদি এনেছিলেন। সেই কাপে চা ঢালতে গিয়ে, কিছুটা উপ্‌চে নীচে তিলোত্তমার মাথায় ও মুখে পড়ে এবং কাঁধ বেয়ে কিছুটা তাঁর শাড়িখানিতেও লাগে। ব্যাপার তেমন কিছু না হ'লেও তিলোত্তমার দামী স্বর্গীয় শাড়িখানা চায়ের দাগে দাগী হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—চল ভিড় থেকে বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো যাক।

উপো বললে—আমি তো বলেছিলাম, মাঠে আর গিয়ে কাজ নেই। যেমন আমার কথা তোমরা শুনলে না, ঠিকই হয়েছে।

তখন অতি কষ্টে ভিড় ভেঙ্গে সকলে চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে-সঙ্গেই বিদ্যুৎপর্ণা, তাঁর শাড়ির আঁচলের খুঁটটা বার বার দেখে চম্‌কে উঠলেন—আমার টাকা? একশো টাকার দু'খানা নোট যে আমি আঁচলে বেঁধে এনেছিলুম! উপো ভারিক্কী মেজাজে বললে—'আঁচল-মার' তো? ঠিক হয়েছে। পকেট-মারের ভয়ে, আমি বাবা, কক্ষনো···

তিলোত্তমা অনুযোগের সুরে বললেন—বার বার বলেছি যে, টাকাকড়ি কখনো আঁচলে বেঁধে রাস্তা-ঘাটে চলবে না। এ কি স্বর্গ্‌গো পেয়েছ, যে—টাকা তো টাকা, মন-প্রাণও যদি চৌরাস্তার

মোড়ে রেখে আসা যায়, তা হলেও কেউ তা চুরি করবে না। পেট কাপড়ে বেঁধে নিতে কী হয়েছিল শুনি।

তখনি কালীঘাটগামী দোতালা 'বাস' এসে পড়ায়, সবাই তাতে উঠে পড়লেন ও মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যেই কালীঘাটে নেমে, কালীমার মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করে সকলে দেখলেন—মা নেই, শুধু তাঁর পাথরের প্রাণহীন মূর্তিটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে! কী ব্যাপার; মা কোথায়?

চমকিত হয়ে সকলে মন্দির হ'তে বাইরে এসে চারিদিকে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলেন, কালী-কুণ্ডের পাশের রাস্তাটির একধারে, অন্যান্য ভিখারী থেকে একটু তফাতে, ভিক্ষাপাত্র হাতে মা বসে আছেন। ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিতা তাঁর চেহারা শীর্ণ, শুষ্ক, দীপ্তিহীন। তাঁর শ্রীহীন, বিবর্ণ কেশগুচ্ছ তৈলাভাবে জটগুচ্ছে পরিণত। দীপ্তিহীন লোচনত্রয় কোটর প্রবিষ্ট।

তিলোত্তমা বিস্ময়-কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—মা! তোমার চিরকালের মন্দির ত্যাগ করে, পথের ধারের গাছতলায় কেন মা? আর এ রকম দুর্গতির বা কারণ কি?

মা বললেন—সব বলছি, তোমরা এইখানে ব'স। আমার দুঃখের কথা সব শুনে যাও. ফিরে গিয়ে দেবরাজকে সব জানিও। —একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মা কয়েক সেকেণ্ড নীরব হয়ে রইলেন; তারপর বলে যেতে লাগলেন—খেতে পাই না মা, খেতে পাই না। এক বেলা দু'টি ডাল-ভাত, তাও আর জোটে না। জুটবে কি করে বল, একটি ভক্তও আর আসে না। খেতে পাব কোথা থেকে মা? যারা আসে, তারা আমার জন্যে আসে না, তারা ছুটির দিনে বেড়াতে আসে। পূজারী হালদার মশাইরাও দিন-দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছেন। তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছেন না। সামান্য দু' একজন সত্যিকারের ভক্ত যা' আমার আছে, তাদের নিজেদেরই অবস্থা নানা কারণে কাহিল, তা আমার ভোগ-রাগ পূজো আর কেমন করে যোগাবেন। জিনিস-পত্রের দাম একেবারেই আগুন।

ঘৃতাচী বললেন—সে তো দেখতেই পাচ্ছি মা। এত দুর্মূল্য হবার কারণ কি?

উপো মোড়ের পান-বিড়ির দোকান থেকে সিগারেট কিনে এতক্ষণ আড়ালে ব'সে টানছিল। এখন সামনে এসে দাঁড়াল। ঘৃতাচীর প্রশ্নের উত্তরে বললে—যে দেশ যতটা স্বাধীন, সে দেশের দুর্মূল্যতা না কি ততটাই। এ দেশ দশ বছর স্বাধীন হয়েছে, জিনিস-পত্রের দামও তাই দশগুণ বেড়েছে।

নাগদত্তা বললেন—তা হলে বিশ বছর পরে কি বিশ গুণ বাড়বে না কি? সে তো ভয়ানক কথা!

উপো বললে—ভয়ানক আর কি? তাই যদি হয়, তার উপায়ও আছে। দেশকে তখন আবার পরাধীনতায় ফিরিয়ে আনলেই হবে, তখন আবার সাবেক দামে সব এসে পড়বে।

তিলোত্তমা কট্-মট্ করে উপোর দিকে চেয়ে বললেন—তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়? কিছু নেশা-টেশা করে এলি না কি? বলা যায় না, তোমার তো গুণে ঘাট নেই।

উপোর দিকে চেয়ে শুষ্ক হাসি হাসতে-হাসতে মা বললেন—আসল কথা, দেশে পাপ ঢুকেছে। একদিকে বড় বড় চোর, কালোবাজারী, মজুতদার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ভেজালে-ভেজালে দেশকে একেবারে জাহান্নমে দিচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা যে না কচ্ছে তাও নয়, কিন্তু এইসব জঘন্য পাপ আর দুর্নীতি কিছুতেই দমন করতে পারচে না। এইসব দেখে-শুনে এক এক সময় আমার সমস্ত দেহ-মন রাগে আগুন হয়ে ওঠে; মনে করি, এইসব দেশের শত্রুদের বিনাশ করবার জন্যে আমি আর একবার সেই মহিষমর্দিনী রূপ ধারণ করি।

নাগদত্তা বললেন—আচ্ছা মা, এদের চোর কি ক'রে বলা যায়? যে পরের জিনিস নেয় সেই ত' চোর। এরা ত' নিজেদের জিনিষ চুরি ক'রে নিজেদের ঘরেরই সর্বনাশ করছে। এদের বরং মহাজন বলা যেতে পারে; বল মা, হ্যাঁ কি না?

মা মাথা হেঁট ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—যাক, তোমরা আমার হাল তো সবই দেখে গেলে, দেবরাজকে গিয়ে সব বলো। এখানে এভাবে আমি আর থাকতে পারব না, মা। আর তোমরাও বেশীদিন এখানে থেক না; যত শীঘ্র পার চলে যাও। তোমাদের দেখবার আর বাকী কী আছে?

বিদ্যুৎপর্ণা বললেন—সবই প্রায় দেখা হয়েছে, শুধু চিড়িয়াখানাটা দেখলেই হয়।

—কোনও দরকার নেই মা। চিড়িয়াখানায় যা দেখবার তা চিড়িয়াখানার বাইরেই দেখা যায়। কষ্ট করে আর চিড়িয়াখানায় যাবার দরকার কি? হয়তো, শীগ্‌গিরই এমন দিন আসবে, যেদিন চিড়িয়াখানার অধিবাসীরাই টিকিট কিনে, আর কলা, ছোলা আর পচা মাংস-টুকরো হাতে নিয়ে, পৃথিবীর মানুষদের দেখতে আসবে। —মুহূর্ত-খানেক থেমে, মা আবার বলতে লাগলেন—এখানে আর দেরি না করে তোমরা শীগ্‌গির স্বর্গে চলে যাও। নইলে হয়তো আর যেতেই পারবে না।

—কেন—কেন মা?

—আকাশে প্রায়ই রকমারি ধরণের বোমা পরীক্ষা চলছে। তাতে আমাদের যাবার-আসবার পথ খুবই বিপজ্জনক করে তুলছে। তারপর সেদিন আমার তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখলুম, আর একটা কাণ্ড শীগ্‌গিরই পৃথিবীর লোকেরা ঘটাবে; যাতে স্বর্গের পথ হয়তো আমাদের বাধ্য হয়ে একেবারেই বন্ধ করে দিয়ে, দু'দিকে দু'টো 'নো থরো ফেয়ার' দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।

অত্যন্ত ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে সকলেই বলে উঠলেন—কেন মা? কেন মা?

—সোবিয়েত রাশিয়া আর আমেরিকা নামে যে দুটো দেশ আছে, তারা আকাশে অনবরত কৃত্রিম চাঁদ ছাড়তে থাকবে। এর মধ্যে ছাড়া শুরুও হয়ে গেছে।

—নকল চাঁদ?

—হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, চাঁদের ভেতর ওরা কুকুর-বাঁদরও পাঠাচ্ছে।

আরও দু'-পাঁচটা কথা-বার্তার পর, অপ্সরারা কালীমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

॥ সপ্তম সিঁড়ি ॥

কালীমার কথা শুনে, অপ্সরারা সেইদিনই স্বর্গে ফিরে যেতেন, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় 'ঝিক্-মিক্ সিনেমা হ'লে' যে অপূর্ব নাচের শো ছিল, দু'দিন আগেই একশো ত্রিশ টাকা দিয়ে তার তেরোখানা টিকেট তাঁরা কিনে ফেলেছিলেন। সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ নর্তকীরা এদিন এখানে নাচ দেখাবেন। এঁদের হ্যাণ্ডবিলে লেখা ছিল—'আমরা হাইড্রোজেন চুম্বক আকর্ষণে স্বর্গের নৃত্য-পটিয়সী অপ্সরাদের মাটির পৃথিবীতে টেনে এনেছি···এ-নাচ দেখলে আপনাকে তাই মনে করতে হবে, যদিও এঁরা এই মাটির পৃথিবীরই। 'ঝিক্-মিক্'এর 'এয়ার-কণ্ডিশণ্ড' স্বর্গীয় সুখাসনে বসে আপনি—উর্বশী, তিলোত্তমা, বিদ্যুৎপর্ণা, রম্ভা ইত্যাদির নাচ দেখে যান'···ইত্যাদি। অপ্সরারা এই নাচ দেখবার প্রবল আগ্রহ দমন করতে পারেন নি। যথাসময়ে তাঁরা 'ঝিক্-মিক্'এ এসে তাঁদের নিজ নিজ আসনে বসলেন।

অসংখ্য দর্শক-দর্শিকাতে 'ঝিক্-মিক্' পরিপূর্ণ। একখানি আসনও খালি নেই। ভিতরে যত লোক, বাইরে তার দ্বিগুণ সংখ্যা ইতঃস্তত জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বিধাতা যদি এই একটি দিনের জন্যেও তাদের কর্ণে দর্শনশক্তি দিতেন, তাহ'লে দেয়ালের গায় কান পেতে তারা আজ এই স্বর্গ-সুখ কিছুটা হয়তো দৃষ্টিদ্বারা উপভোগ করতে পারত।

যথাসময়ে অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠল। নৃত্য শুরু হ'ল। সত্যই এ-রকম নৃত্য কেউ কখনও দেখে নি। অতি উঁচু-দরের নাচ। এ রকম 'ন ভূতং ন ভবিষ্যতি'। ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর,

পাঁচ-সাতজন প্রথম শ্রেণীর নাম-করা নর্তকী 'পদ্ম-বিলাস' নৃত্য দেখাতে শুরু করলেন, তখন সমস্ত দর্শক-দর্শিকা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা দেখতে লাগলেন। কিন্তু এই মনোমুগ্ধকর ও নিশ্চুপ পরিবেশের মধ্যে উপো একটা বিশ্রী গোলমাল তুলে সমস্ত নষ্ট করে দিলে। হঠাৎ সে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার শুরু করল—জঘন্য! জঘন্য! আমাদের টাকা ফিরিয়ে দিন। একশো ত্রিশ টাকা। এই কি আবার নাচ নাকি? পিসিমাদের যে বাঁদীর বাঁদী, সে-ও এর চেয়ে ভালো নাচে। এমন কি তাঁদের ঘরের কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত! টাকা ফেরৎ দিন—টাকা ফেরৎ দিন।

হুল-স্থুল ব্যাপার! অভাবনীয় কাণ্ড! 'হল'ময় বিষম একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। প্রথমটায় সকলেই অবাক্; কিন্তু পরক্ষণেই সকলে ভীষণ রেগে গিয়ে উপোকে এই মারে তো এই মারে! সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল, কেউ কেউ ভীষণ রেগে গিয়ে ছুটে আসতে লাগলেন। কী একটা কাণ্ড এইবার বাধে! ঠিক সেই সময়ে তিলোত্তমা প্রভৃতি দু'চার জন অপ্সরা উঠে দাঁড়িয়ে সবার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তিলোত্তমা জোড়হাত করে ও বিনয়-বাক্যে সকলকে বললেন—আপনারা ক্ষমা করুন। সম্প্রতি ভীষণ টাইফয়েড হয়ে ছেলেটির একটু মাথার দোষ হয়েছে। আমরা বুঝতে পারি নি যে, সেটা আজকে হঠাৎ এখানে এইভাবে প্রকাশ হবে। আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি। এক্ষুনি আমরা ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। অবস্থা বুঝে আমাদের ক্ষমা করুন।

এরূপ ব্যাপারে ক্ষমা হয়তো হ'ত না। জোড়হাত এবং বিনয়-বাক্য কিছুই কাজে আসত না। কিন্তু 'সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়'—এই বঙ্কিমী ন্যায়শাস্ত্র বাক্য অনুসারে সকলেই থেমে গেলেন। তখন অপ্সরাগণ উপোকে 'রাম-চিমটি' দিতে দিতে, হল থেকে বাইরে চলে এলেন; মনস্থ করলেন, আর একটা দিনও এখানে নয়, কালকেই সসম্মানে প্রস্থান করাতে হবে।

বিদ্যুৎপর্ণা বললেন—কালকের দিনটা থেকে গেলে হ'ত না?

তিলোত্তমা বললেন—কিছুতেই না। কেন, বল তো?

—মেনকাদি' অনেক করে বলে দিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে।

—শকুন্তলা? কোথা তারা থাকে?

—চোর-বাগানে। বাড়ীর নম্বরটা লিখে দিয়েছে।

হাসতে হাসতে মিশ্রকেশী বলে উঠলেন—বিদ্যুৎদি, তোমার দুঃসাহসকে বলিহারী যাই। কাল খোলা মাঠে তোমার অমন চমৎকার 'আঁচল-মার' হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তুমি কোন্ সাহসে একেবারে ঐ খোদ 'চোর-বাগানে' যেতে চাইছ? এবার তা হ'লে তুমি নিজেই ঠিক চুরি হয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে তিলোত্তমা বললেন—না ভাই, আর কোন বাগানেই নয়—চোর, বাটপাড়, সাধু, সন্ন্যাসী—আর কোথায়ও নয়, এখন একেবারে……। ব'লে ঊর্ধ্বদিকে হাতটা তুলে দেখালেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষেই, 'মা-গঙ্গা হোটেল' থেকে বিদায় নিয়ে, সকলে ঊর্ধ্বপথে আবার স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙ্গতে শুরু করলেন।

গোলোক ধাম

'গোলোক-ধাম' খেলা নয়, কিংবা 'গোলক-ধাঁধা'ও নয়। একখানা বাড়ি ; ওরই নাম—'গোলোক-ধাম'। বাড়িখানা পাড়ার মধ্যে সেরা বাড়ি। অন্য সব বাড়িকে টেক্কা দিয়ে 'গোলোক-ধাম' সৌন্দর্যে ও সুষমায় উজ্জ্বল হয়ে যেন হাসছে। শুনতুম, বাড়িখানা যিনি তৈরি করেছেন, তিনি পয়সাওলা লোক। তাই এই দু' বছর বাড়িখানা এমনিই পড়ে রয়েছে ; না-থাকেন তাঁরা নিজেরা, না-দেন কাকেও ভাড়া। তিনি শুধু মাঝে মাঝে এসে বাড়িটা দেখে-শুনে যান এবং বাড়ির চতুর্দিকে যে কদলীবৃক্ষের বাগান—কিংবা বলা যেতে পারে যে কদলী বৃক্ষের জাল বুনেছেন, তা' তদারক করে যান এবং যাবার সময় পক্ক কদলীর কাঁদি, থোড়, মোচা প্রভৃতি নিয়ে গিয়ে আনন্দে নিজের বাগানের কদলী ভক্ষণ করেন। আমি এই 'এঁড়েদ'য় বছর তিন হ'ল এসেছি এবং বহুবার তাঁকে দেখেছিও। আমারই বাসার সামনে দিয়ে গিয়ে ওঁর মোটরকে বি টি. রোডে পড়তে হয়। তাঁর বয়স ঠিক বোঝা যায় না, তিরিশও হ'তে পারে, পঞ্চাশ-পঞ্চান্নও হ'তে পারে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, চোখে খুব বেশি পাওয়ারের চশমা, মুখভাবে মোটেই জলুস নেই, একটা ম্যাড়-মেড়ে ভাব। মনে হয় যেন 'ডিসপেপটিক্'। মানুষ হিসেবে শুনেছি খুবই ভাল।

বৈশাখের মাঝামাঝি। রবিবার। বেলা আন্দাজ তিনটে। আমি আমার বাসা-বাড়ির রাস্তার দিকের ঘরখানার দরজা খুলে বসে আছি, এমন সময় গোলোকবাবুর মোটরখানা হঠাৎ এসে থেমে গেল। তিনি নিজেই গাড়ী চালাতেন। গাড়ির কি-একটা কলকব্জা আটকে গিয়েছিল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে সামনের ঢাকাটা খুলে কি-একটু নেড়ে-চেড়ে দিলেন, আবার সেটা ঠিক হয়ে ঘর্-ঘর্ শব্দ হ'তে লাগল। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—কেমন আছেন ?

বল্লুম—ভাল আছি। বাগানে গেছলেন ? ও সব কি, থোড়, মোচা ?

—হ্যাঁ। থোড় খান আপনি ?

—কেন খাব না ? পেলেই খাই। থোড়ও খাই, মোচাও খাই, কলা পেলে, কলাও খাই।

তিনি গাড়ির ভেতর থেকে কয়েক খণ্ড থোড় বার ক'রে আমায় দিলেন। এক কাঁদি কলাও গাড়ির মধ্যে ছিল। বেশ রং-ধরা। সম্ভবত মর্তমান। বেশ বড় সাইজ ও সুপুষ্ট। 'চক্ষুদান' দেবার যখন সুবিধে নেই, তখন কাঁদিটার দিকে দৃষ্টিদান দিয়ে বল্লুম—মর্তমান বোধ হয় ? চমৎকার কলা।—পাছে একটা ছড়া বাজে খরচ করতে হয়, সেজন্য তিনি টপ্ করে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন—কেমন আছেন বলুন।

বল্লুম—ভাল না। বায়ু হোচ্ছে বড্ড। ডাক্তারেরা বেশি করে ফল খেতে বলে—এই আপেল, ন্যাসপাতি, পেঁপে ঐ রকম ভাল কলা……।—মোড়কে ঘুরিয়ে এনে আবার কলার সঙ্গে জুড়ে দিলুম।—কিন্তু 'ভবি ভোলবার নয়'। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—চেঞ্জ ! চেঞ্জ ! চেঞ্জে গেলে খুব উপকার পাবেন।

একটু খাতির করতে গেলুম, যদি কিছু সুফল তাতে ফলে ; বল্লুম—চা খাবেন নাকি ? খুব ভাল দার্জিলিং চা এনেছি।

—ধন্যবাদ। চা-খাওয়াটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি ; ডিসপেপটিক রুগী ত !

—ভালই করেছেন। তারপর দু'এক কথার পর বল্লুম—অমন চমৎকার বাড়ি করলেন, নিজেরাও থাকলেন না, ভাড়াও দিলেন না, শুধু-শুধু ফেলে রেখে……

—ভাড়া দিতে পারি ; ভাল ভাড়াটে না পেলে ভাড়া দেব না। প্রায় লোক বড় নোংরা হয়। অমন সুন্দর বাড়ি, যাকে-তাকে ভাড়া দিলে,……তা ছাড়া, প্রায় লোক আজকাল ভাড়া দেবার বড় গোলমাল করে।

—তা বটে ; তবে ভাল ভাড়াটেও ত পাওয়া যেতে পারে।

—খুবই কম। আপনার মত লোক পেলে আমি এখনি ভাড়া দিতে পারি।

—তাই নাকি ? তবে আমাকেই দিন। অমন সুন্দর বাড়ি পেলে আমার তো খুবই······বলুন, কত ভাড়া দিতে হবে।

—আপনি এখানে দু'খানা ঘরে কত দেন ?

—চল্লিশ।

—আমার বাড়িতে তিনখানা ঘর। তবে ওর এক একখানা ঘর এর এক একখানার ঠিক ডবল। তারপর দুটো ঘেরা দালান, তিনটে রোয়াক, ছাদের সিঁড়ি, সমস্ত ছাদটা, প্রকাণ্ড রান্নাঘর, বাথরুম, ভাল টিউবওয়েল, চারদিকে জমি বাগান গাছপালা, লাইট, পূর্বদিকটা একেবা······

—আহা-হা, সবই তো জানি ; এখানকার মধ্যে অমন সুন্দর বাড়ি আর নেই ; অবশ্য 'সুরধনী কাননে'র কথা বা ঐ ধরণের আরো দু' একখানা বাড়ির কথা আলাদা। তা' ভাড়া কত দিতে হবে সেইটে······

—বেশি ভাড়ার লোভ আমার নেই। আমি চাই ভাল ভাড়াটে। তা আপনি এই বাড়ির হিসেবেই দেবেন—অর্থাৎ তিন কুড়ি ষাট। কিন্তু আমার ও-বাড়ির ভাড়া হওয়া উচিত একশো টাকা ; হ্যাঁ কি না, বলুন।

—তা বেশ, আমি ষাট টাকা করেই দেব। এ মাসের আর পাঁচ দিন বাকি আছে। আমি পয়লা থেকেই আপনার বাড়িতে যাব। তার আগে এক মাসের ভাড়াটা যদি বলেন তো এডভান্স দিয়ে দোব ; কেমন ?

—আপনার মত লোকের কাছ থেকে ভাড়ার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত নই। আর পয়লাই যে আপনাকে যেতে হবে, তারও কোন মানে নেই। আপনি ইচ্ছে করলে আজই যেতে পারেন :

ভাড়া আপনি পয়লা থেকেই ধরবেন।······আপনার ছুরিখানা একবার দিন তো।

ভাবলুম ছুরি কেন রে বাবা! আমার গলায় বসাবে নাকি! উঠে গিয়ে ছুরিখানা এনে দিয়ে একটু সরে দাঁড়ালুম। কিন্তু······ গলায় নয়, বসালেন—কলায়, অর্থাৎ তাঁর কলার সেই কাঁদিটাতে। ওপর থেকে দুটো ছড়া কেটে আমার হাতে দিয়ে বললেন—খাবেন; খুব ভাল জাতের মর্তমান।

বল্লুম—নিশ্চয়ই খাব, এমন কলা খাব না?

রোজ সন্ধ্যার দিকটায় পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক আমার বৈঠকখানায় এসে বসেন। 'গোলক-ধামে' আমার উঠে যাবার কথা শুনে সকলেই খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

নারাণবাবু বললেন—আপনি সুঁদোরবনের জলা ছেড়ে এখন থেকে কাশ্মীরে বাস করবেন।

কেশববাবু বললেন—নরক থেকে এবার আপনার স্বর্গবাস হবে।

অতুলবাবু বললেন—আপনি নারায়ণের একজন বড় ভক্ত। কিছু-একটু সামান্য পাপে দু-তিন বছর আপনাকে এখানে খুবই কষ্টে কাটাতে হয়েছে, এইবার তিনি আপনাকে সর্বসুখপূর্ণ······'

—সৌন্দর্যভরা এবং আনন্দময় নন্দনে নিয়ে গেলেন—হাসতে হাসতে এই কথাগুলো বলে আমি অতুলবাবুর বাক্য সম্পূর্ণ করে দিলুম।

রাত্রে ছেলেরা খুব খুশী হয়ে বললে—হঠাৎ যে ও-বাড়িটা আমাদের ভাগ্যে এভাবে হ'য়ে যাবে, এটা আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি। পেছনের মাঠের দিকটায় টানা বারান্দা। বর্ষায় ওটা যখন জলে ভরে যাবে, তখন একখানা চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসলে······

আর এক ছেলে বলে উঠল—সূর্যের প্রথম কিরণ আমাদের পূবের ঘরখানায় প্রথম গিয়ে পড়বে, বাবা! আর পায়খানা ও-বাড়ির কি সুন্দর; ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে! একেবারে দালানেরই মধ্যে: বর্ষায় একটও ভিজতে হবে না।

আমার স্ত্রী বললেন—রান্নাঘরের পাশেই শুনলাম টিউবওয়েল! ভারি সুবিধে! ওঃ! এই তিন বছর জলের কি কষ্টই গেছে! পরের বাড়ি থেকে তোলা জলে স্নান করা, গা-ধোওয়া, রান্না করা। উঃ! কি অসুবিধেই যে ভোগ করতে হয়েছে!

আমি বল্লুম—কলা দু' ছড়া পাকতে এখনো চার-পাঁচদিন দেরি, চালের জালায় রেখেছ তো? ওঁর বাড়িতে গিয়েই ওঁর কলা খাব।

বিছানায় শুয়েও অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম এল না। নারাণবাবুর কাশ্মীর, কেশববাবুর স্বর্গ আর অতুলবাবুর নন্দনের সুখ ও আনন্দের কথাগুলোই ঘুরে-ফিরে মাথার মধ্যে ভিড় জমাতে লাগল।

* * * * *

আজ তিন দিন হল, নরলোক ছেড়ে 'গোলোকে' এসে বাস করছি। বেলা এগারটার মধ্যেই যেন-তেন-প্রকারেন আহারাদি সেরে নিয়ে দালানের এ-প্রান্তে সিঁড়ির নিচে যে হাত দু-তিন জায়গা, তারির এক দিকটায় দু'-পাল্টা কোরে ভিজে সতরঞ্জি টাঙ্গিয়ে দিয়ে সেইটুকুর মধ্যে সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছি। দালানের অপর প্রান্তে, বাথরুমের মধ্যে, 'প্যান'য়ের পাশে একখানা বেতের হাল্কা চেয়ার নিয়ে গিয়ে এবং তাইতে বসে আমার কনিষ্ঠ পুত্র অশোক তার ক্লাস সেভেনের জ্যামিতি পড়ছিল। তার অনতি উচ্চকণ্ঠের সেই 'ত্রিকোণ', 'দ্বিভুজ', 'বৃত্ত' প্রভৃতি অনবরত আমার কানে এসে লাগছিল। এখানে আমিও আমার দেহের সাড়ে পাঁচ ফুট 'লম্ব'কে দ্বিভুজ—থুড়ি—দ্বি-ভাঁজ কোরে অর্থাৎ হাঁটু মুড়ে কুঁকড়ে-সুকড়ে অর্ধেক পরিমাণ খাটো করে চোখ বুঁজে পড়ে আছি; আর গৃহিণী নারায়ণের পদপ্রান্তে লক্ষ্মীর মত বসে বসে ঢুলছেন, কিংবা ঢুলতে-ঢুলতে বসে বোধ হয়-বা নারায়ণেরই ধ্যান করছেন।

ধ্যান ভঙ্গ করে একটা দুঃখের শ্বাস ফেলে তিনি বললেন—ভগবান যাট টাকাতে আমাদের জন্যে এই আড়াই হাত জায়গাই মেপে রেখেছিলেন!

আমি বল্লাম……

কিন্তু বলবার আগে কিছু পূর্বকথা উল্লেখের প্রয়োজন।

আজ তিন দিন হল আমরা গোলক-ধামে এসেছি—শুদ্ধ কথায়—উপনীত হয়েছি। যেদিন আসি, সেদিন দুপুরের খাওয়া সকাল-সকাল ও-বাড়িতে সেরে নিয়ে বেলা বারটা আন্দাজ সকলে এ-বাড়িতে এসে পড়ি। বড়ই আশা করেছিলাম যে, পুরানো বাসার অন্ধকূপ ছেড়ে ওখানে গিয়ে বাঁচব। মাঠের ধারে বাড়ি, চারিদিকে গাছপালা-বাগান, হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দুপুর-বেলায় গিয়ে মেজেয় একখানা মাদুর পেতে খুব শান্তিতে একটা ঘুম দিতে পারব। তিন বছরের কষ্ট তিন দিনের আরামে উসুল হ'য়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঘুম দেওয়া দূরের কথা, ঘরে-দালানে পা দেওয়ামাত্র মাথা পর্যন্ত যেন জ্বলে উঠল; মনে হল, হঠাৎ যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে এসে পড়লুম। সে যে কি অসহ্য তাত, তা বলবার নয়। অগ্নিগর্ভ 'বয়লারে'র পাশে থাকলে যেমন প্রচণ্ড তাপ লাগে, ঠিক সেইরকম তাপ। সব ঘরেই এইরকম। তিনখানা ঘরের সংলগ্ন যে টানা বারান্দা, তাতেও একই রকম অসহ্য উত্তাপ। অবশ্য দক্ষিণটা চাপা, কিন্তু তার জন্যে এ রকম অসাধারণ উত্তাপ হবার তো কথা নয়। আমার বাসাটারও তো দক্ষিণ চাপা ছিল, তার ওপর ঘর দু'খানাও ছিল অন্ধকূপ গুদোমের মত; কিন্তু সে ঘরও তো এ-রকম ভীষণ গরম ছিল না। সবে বোশেখের মাঝামাঝি, এখনি ঘরের মধ্যে পাঁচ মিনিটকাল দাঁড়িয়ে থাকে কার সাধ্যি! এর পর জ্যৈষ্ঠ মাসে না-জানি কি ব্যাপারই হবে! সবাই মিলে এর কারণানুসন্ধান করতে লাগলুম। সমস্ত দিন কেউ আমরা ঘরের মধ্যে বা দালানে বসতে-দাঁড়াতে পারলুম না। রাত দশটার সময় কিছুটা গরম কমল; কিন্তু সম্পূর্ণ গরম কেটে গিয়ে সাধারণ অবস্থায় আসতে রাত দুটো-আড়াইটে হ'ল।

দু'দিন এই প্রচণ্ড উত্তাপ ভোগ করে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর অসুস্থ হোয়ে পড়লুম। সকলেরই বাহ্যে-প্রস্রাব বহু পরিমাণে

কমে গেল। দিনে-রাতে কারোরই ঘুম হয় না। আমার দুই ছেলে, তাদের দুই ভগ্নীর বাড়ি পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে; একজন শ্যামবাজারে, একজন বেলেঘাটায়। আমি, আমার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র অশোক—এই তিনটি প্রাণী, এই আগুনের মধ্যে থেকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে লাগলুম। দু'দিন পরে দেখা গেল বাথরুমের ভিতরটা আর সিঁড়ির নিচেটায় উত্তাপ কম। এই দুই জায়গায় ডবল ছাদ। তাই সারাদিন সিঁড়ির নিচে ঐ আড়াই হাত জায়গাটুকুই আমাদের আশ্রয়স্থান হয়ে দাঁড়ালো। আর অশোক আশ্রয় নিলে বাথরুমের মধ্যে—পায়খানার 'প্যান'য়ের পাশে।

সুতরাং স্ত্রীর উপরোক্ত কথার উত্তরে বল্লুম—হ্যাঁ সত্যই তাই; ভগবান যাট টাকাতে আমাদের এই আড়াই হাত জায়গাই বরাদ্দ করে দিয়েছেন।

পরের দিন রোগ ধরা পড়ল। পাড়ার সব ভদ্রলোক এসে জমা হয়েছিলেন। সকলের চেষ্টা, যুক্তি ও বিবেচনার ফলে জানা গেল যে, রোগটা হল ছাদের। গোলকবাবুর দোতলা করবার ইচ্ছা ছিল এবং সেজন্য ঢালাই ছাদ পাঁচ ইঞ্চি পুরুর জায়গায় ইঞ্চি-তিন পুরু করেছিলেন; আর তা'ও মশলা খুব কম দিয়ে, তার জায়গায় লোহার শিক দিয়ে যাতে খুব মজবুত হয়, তাই করেছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি দোতলা করেননি। এদিকে একতালার ছাদে 'জল-ছাদ'ও করেনি। ফলে রোদ ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই সব লোহার শিক তেতে একেবারে আগুন হয়ে উঠত, আর সেই উত্তাপ বেলা দশ-এগারটা থেকে রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত ঘরে-দালানে জমা হয়ে থাকত।

যাই হোক, রোগ যখন ধরা পড়ল তখন প্রত্যেকেই এক-একটা দাওয়াই বাতলাতে লাগলেন। যুগলবাবু বল্লেন—সমস্ত ছাদটায় একখানা করে ইঁট বিছিয়ে দিলে, তাত অনেকটা কম লাগবে।

কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল যে, তাতে প্রায় পাঁচশো টাকার ইঁট কিনতে হবে। সুতরাং অসম্ভব।

রজনীবাবু বল্লেন—বিচালীর তড়পা। বিচালীর তড়পা! সমস্ত ছাদটা খড় দিয়ে ঢেকে রাখা!

অতুলবাবু মুখে 'হুট' করে একটা শব্দ করে বল্লেন—তা কি কখনো হয়! একটা জ্বলন্ত দেশালাইয়ের কাঠি, কি একটা পোড়া বিড়ি—ব্যস্! একেবারে লঙ্কাকাণ্ড! ও হবে না। ও খড়-টড় চলবে না। করতে হবে তোমার গিয়ে 'ইয়ে' করতে হবে।

কিন্তু 'ইয়ে'টা যে কি, তা অনেকক্ষণ ভেবেও অতুলবার মুখ থেকে বা'র হ'লো না।

নন্দবাবু বল্লেন—ডবল করে 'হোগলা'র আচ্ছাদন—সমস্ত ছাদটায়।

কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল, তাতেও বহু টাকা খরচ। সুতরাং ডবল হোগলাকেও ইট-বিচালীর পথানুসরণ করে সরে পড়তে হল।

সুবোধ কনট্রাকটারী করত। অনেক ছোট-বড়-মাঝারি বাড়ি তার হাত দিয়ে তৈরি হ'য়েচে। তাকে বল্লুম—সুবোধ, তুমি যে কিছু বলচ না? বল, কি উপায় করা যায়।

সুবোধ বল্লে—ছাদের ওপর নতুন করে 'জলছাদ' করা ছাড়া উপায় নেই।

—তাতে খরচ হবে কত?

—তা পাঁচশো।

আমার ছোট ছেলে অশোক একধারে চুপ কোরে দাঁড়িয়েছিল। সে বল্লে—বাবা, কচুরিপানা তুলে এনে সমস্ত ছাদটায় দিলে হয়।

শরৎ বল্লে—আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলুম। তখন সকলেরই মত হল যে, কচুরিপানাই এর সস্তা ওষুধ। কিন্তু মুশকিল হল, ধারে-কাছে কোন পুকুরেই কচুরিপানা নেই। প্রায় আধ মাইলটাক দূরে একটা পুকুর থেকে 'কচুরি' তুলে পাড়ের ওপর ফেলে রেখেছিল। সে পানা সবই প্রায় শুকিয়ে এসেছিল, সামান্য কিছু কাঁচা ছিল। অগত্যা সেই শুকনো 'কচুরি'ই কুলিদের দিয়ে আনিয়ে ছাদ ঢেকে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তাতেই তো হবে না; রোজ তা'তে

জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা দরকার। সুতরাং আট আনা করে রোজ একজন লোককে দিয়ে জল দেবার ব্যবস্থা করা গেল।

সুফল ফলল। সেই দিন থেকেই অভদ্র ও অগ্নিমূর্তি ঘর-দালান ভদ্র ও ঠাণ্ডা মূর্তি ধারণ করল। অসাধারণ উত্তাপটা সাধারণ ধাপে নেমে এল। ক'দিন ধরে দারুণ দুর্ভোগ ভোগ করে আমরা নিস্তার পেলুম।

কিন্তু……

* * *

উত্তাপের হাত থেকে নিস্তার পেলুম বটে, কিন্তু হঠাৎ আর এক বিপদ এসে দেখা দিল। কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল দালানের মধ্যে একটা হাত তিন-চার লম্বা এবং বেশ-কিছু মোটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছে। রংটা মেটে। 'হেলে' বা 'জল ঢোড়া' নয়, 'ঢ্যামনা' অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে rat snake বলে তা'ও নয়। গৃহিণী আঁতকে উঠলেন। আমি ভয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। ছেলে তিনটির একজনও বাড়ি নেই। আমি যে বাইরে গিয়ে কাকেও ডেকে আনবো তাও পারচি না, কারণ সেই ফাঁকে সর্পরাজ যদি সুড়-সুড় করে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকেন! এক গাছা বড় লাঠি ছিল। সেই পাঁচ হাত লম্বা লাঠিগাছা হাতে ধরে আমি দশ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে রইলুম, আর গৃহিণী—ওদিককার ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে দরজায় খিল; মায় শার্সি জানালাগুলোতেও ছিটকিনি! এদিকে আমি সাপটাকে মারতেও সাহস পাচ্ছি না; কারণ এক ঘা মারলেই যদি সে ফণা তুলে আমার দিকে তেড়ে আসে! আমি শুধু পেছন ফিরে দেখে রাখচি, দুঃসময় এলে পালাবার পথটা ঠিক আছে কি না। মহা সমস্যায় পড়লুম! ভাল গোলকধামে এসেছিলুম রে বাবা! 'গোলোক-ধামে' এসে ভীষণ 'গোলকধাঁধায় পড়া গেল দেখচি!

মিনিট দশেক একইভাবে কেটে গেল। সাপও নড়ে না, আমিও নড়ি না। গৃহিণীর আর কোন সাড়া শব্দই নেই। বাইরে থেকেও

কেউ আসে না। আমি সেই একভাবেই শ্মশানে হরিশ্চন্দ্রের মত লাঠি হাতে দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। মহা সমস্যা ও চিন্তায় পড়লুম। এমন সময় অশোকের মাষ্টার কালীবাবু এসে পড়লেন। তিনি বল্লেন—আরে, এ হলো আপনার 'মেটে' সাপ; মানুষকে কিছু বলে না। তা ছাড়া ওদের বিষ নেই।

ও ঘরের ভেতর থেকে গৃহিণী গর্জে উঠলেন—মেটে হোক আর যাই হোক, সাপ ত! আমি কিছুতেই আর এ-বাড়িতে থাকবো না, তুমি কালই অন্য বাড়ি দেখ।—

কালী মাষ্টার তাঁকে ভরসা দিয়ে বল্লেন—কোন ভয় নেই মা; এ সাপ 'জাতে'র সাপ নয়; এরা মানুষকে কামড়াতে জানে না।

—না বাবা, কিছুতেই আমি এ বাড়িতে থাকতে পারব না। আজ যখন 'ইনি' দেখা দিয়েচেন, তখন কাল যে 'তিনি' দেখা দেবেন না, তা কে বলতে পারে?

গৃহিণীর কথার মানে এই যে, তিন-চার হাত লম্বা আর মোটা 'মেটে' যখন দেখা দিয়েচে, তখন এর জাত-ভাই কেউটে-গোখ্‌রোও আসতে পারে!

যাই হোক, সাপটাকে কালী মাষ্টার লাঠি দিয়ে মেরে পাঁচিলের ওধারে জলার মধ্যে ফেলে দিয়ে বল্লেন—পাশের এই জলাটায় এদের আড্ডা। জলার জল শুকিয়ে যাওয়াতে, ওটা আপনার বাড়ী ঢুকে পড়েচে।

গৃহিণী তখনো ঘরের খিল খোলেন নি।—তা বলে একেবারে ঘরের মধ্যে! কি সব্বোনেশে কথা! কাল তাহ'লে আসবে বিছানার মধ্যে, পরশু এসে শুয়ে থাকবে ভাতের হাঁড়ির ভেতর! না বাবা! কিছুতেই আমি এ বাড়িতে থাকতে পারব না। একটা যখন এসেচে, তখন আরো আসবে। হয়তো কালই আবার আসবে।

ঠিকই তাই।

পরের দিন ঠিক ঐ সময়েই দেখি, পূর্ব দিককার ঘরের খাটের নিচে কালকের চেয়েও মোটা, ঐ জাতেরই একটা সাপ দিব্বি আরামে শু'য়ে র'য়েছে। এই রক্ষে যে, সেদিন গৃহিণী গৃহে ছিলেন না; শ্যামবাজারে তাঁর বড় মেয়ের বাড়ি গেছলেন। আগের দিনের চেয়ে আমার ভয় অনেকটা কমে গিছলো। সেদিন আমার চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে অশেষ বাড়িতেই ছিল। অশেষ আর আমি দু'জনে লাঠির পর লাঠি মেরে তার ভব-লীলা সাঙ্গ করলুম। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, লাঠির আঘাতে তার মোটা পেটটা ফেটে গিয়ে রামায়ণের সেই 'অহিরাবণে'র ছেলে 'মহিরাবণে'র মত পাঁচ-সাতটা বাচ্ছা কিল-বিল করে বেরিয়ে পড়ল। দেখতে-দেখতে আরো—আরো—আরো; সবশুদ্ধ গোটা-পনের হ'বে। সেগুলোকেও মারা হলো এবং সবগুলোকে বাইরের জলাটায় ফেলে দেওয়া হলো।

কতকটা ভয়ে, কতকটা পরিশ্রমে, আমি দেহে ও মনে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। খাটের ওপর শু'য়ে পড়লুম। শুয়ে-শুয়ে নানা রকম আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম। 'সাপের ডিম হয়, এইতো জানি। পেট ফেটে বাচ্ছা বোরোয়, এতো অদ্ভুত ব্যাপার! এখন করা যায় কি? আজ একেবারে শোবার ঘরের মধ্যে! গৃহিণীর কথা তো উড়িয়ে দিতেও পারি না যে, 'ইনি' যখন এসেছেন তখন 'তিনি'ও একদিন আসতে পারেন। মহা চিন্তায় পড়লুম। কি করা যায়!

পরের দিন গৃহিণী সকালেই 'এঁড়েদ'য় এলেন। সাপের কথা সবই শুনলেন; কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন না; শুধু 'গুম' হয়ে মিনিট দু'তিন নির্বাক অবস্থায় বসে রইলেন। তাঁকে ভরসা দেবার অভিপ্রায়ে বল্লাম—এরা দেখতে সাপেরই মত; কিন্তু বোধ হয় সর্প শ্রেণীর নয়।

তেমনি গম্ভীরভাবে গৃহিণী বল্লেন—না। ওরা ব্যাঘ্র কিংবা বেড়াল শ্রেণীর।

—কথাটা তুমি বুঝলে না। সাপের পেটে ডিম থাকে! এ যে বাচ্ছা বেরিয়ে পড়ল।

মুখখানা ভয় ও বিরক্তিতে ভরিয়ে গৃহিণী বল্লেন—পেটে ডিমই ছিল, লাঠির ঘায়ে সেই ডিম ভেঙ্গে গিয়ে বাচ্ছা বেরিয়ে পড়েচে।

ভেবে দেখলুম, গৃহিণীর কথাটাই ঠিক বটে। মনে-মনে লজ্জিত হ'য়ে পড়লুম। যাই হোক, মহা চিন্তার মধ্যে পড়লুম। ছাদ-গরমের হাত থেকে যা হোক কতকটা নিষ্কৃতি পেলাম, এখন আবার এ নতুন উপসর্গ—সাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই কি করে? নানা জনে নানা পরামর্শ দিতে লাগলেন। তার মধ্যে, হলুদ ও লংকা-পোড়ার ধোঁয়া দেওয়াটাই সকলে সমর্থন করলেন। আড়াই সের হলুদ ও এক সের লংকা আনানো হ'ল। সেইদিন থেকেই ধোঁয়া দেওয়া শুরু ক'রে দেওয়া হ'ল। কিন্তু দুটো দিনও গেল না। আবার একটা ঠিক ঐ জাতেরই সাঁপ ঘরের মধ্যে ঢুকে শুভ-দর্শন দিলেন। তার পরদিন আবার একটা! দুর্ভাবনায় আমাকে যেন পাগল করে তুললো! কাছে-পিঠে অন্য বাড়ির সন্ধান করলুম, কিন্তু পেলুম না। আমার পূর্বের বাড়ির মালিক যজ্ঞেশ্বর-বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। তাঁকে বললুম—আপনার বাড়ি ছেড়ে এসে এই সব দুর্ভোগের মধ্যে পড়েচি। আবার আপনার বাড়িতেই যাই। খালি আছে ত?

তিনি দুঃখ করে বল্লেন—খালিই ত ছিল। কালই এক ভদ্রলোক এসে গেছেন। ইস্! আপনি যদি কাল সকালেও বলতেন, তাহলে।

—কে এলেন?

—ঐ যে শিবু ঘোষালের টীনের ঘর-দু'খানায় যে ভদ্রলোক ছিল।

—কে বলুন ত?

—আপনি চিনবেন না, অল্পদিন হ'ল এখানে এসেচেন। ঐ যে 'কৃষ্ণা' নামে খুব ভালো একটা ফাউণ্টেন-পেনের কালি বেরিয়েচে, এ ভদ্রলোক হলেন এই বারাকপুর অঞ্চলে তার 'সেল্‌স্‌ম্যান'। বেশ

উপায় করেন।···আচ্ছা, তুলাল ঘোষের পুরানো বাড়িটার খোঁজ করেছেন ?

—সেটা খালি নেই, তাতে কা'রা আছে।

মহা সমস্যায় পড়লুম। কি করা যায় ? সাপের হাত থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় ? এই সময় একজন বল্লেন—কার্বলিক এসিড না হ'লে সাপ আসা বন্ধ হয় না। কার্বলিক হ'ল ওর একমাত্র উপায়।

সেইদিনই কার্বলিক এসিড আনান হলো ও জলের সঙ্গে মিশিয়ে বাড়ির চারদিকে ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল, বিশেষ করে—পূবের দিকটায়।

সেদিন আর সাপ এলো না। তার পরদিনও না। তার পরের দিনও না। তখন রোজ সন্ধ্যার আগে বাড়ির চারদিকে কার্বলিক দেওয়া চ'লতে লাগলো। ভগবানের দয়ায় সেই থেকে সাপ-আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

সাপ-আসা বন্ধ হলো বটে, কিন্তু···

আর এক নতুন উৎপাত আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

আগেই বলেচি, বাড়িটার চারিদিকেই কলা-বাগান। অসংখ্য কলাগাছ বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। 'এঁড়েদ'তে এমনিতেই ভয়ানক মশার উপদ্রব; তারপর আষাঢ় মাসে যেমন বর্ষা নামলো, সঙ্গে-সঙ্গেই কলাবনের লক্ষ-লক্ষ নয়—কোটি-কোটি মশা এসে আমাদের ঘর-দোয়ার-দালান ভরে গেল। যিনি যতই মশার দেশে থেকে থাকুন, গোলোক-ধামের সে-মশার পরিমাণ, আকার আর তাদের ভীষণ কামড়ের জ্বালা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। কেবলই কি সন্ধ্যার পর ? সকাল, তুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত্রি—সর্বক্ষণই দলে দলে অসংখ্য মশা সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিতে লাগলো। 'মশা মারতে শুধু গালেই চড়' নয়, সর্বাঙ্গে চড় মেরে-মেরে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠলো। এ মশা তাড়ালে যায় না, পাখার বাতাসে যায় না। অদ্ভুত মশা ! তার ওপর—'একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর'। মশার সঙ্গে

আছেন—ঝাঁকে ঝাঁকে বড় সাইজের মাছি। এই দুই প্রবল শক্তিশালী 'কম্‌বাইণ্ড ফোর্স' তিন দিনের মধ্যে আমাদের একেবারে কাবু করে ফেললে। 'ফ্লিট' আনানো হলো, 'স্প্রে' আনালো হলো; কিন্তু কোনও ফলই তাতে হলো না। 'ফ্লিট'-এর বিশ্রী কড়া গন্ধে আমাদের মাথা ধরতে লাগলো, আমরাই কাবু হয়ে সরে যেতে লাগলুম, কিন্তু মশক-মক্ষিকার কিছুই হলো না! সামান্য কিছু সময়ের জন্যে তারা গা-ঢাকা দিত বটে, কিন্তু আবার যা'—তাই! বাতাস করবার জন্যে দু'ডজন হাত-পাখা ও ছয়টা বাড়তি মশারি কিনে আনা হলো, কিন্তু দিনরাত ত আর খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মশারির মধ্যে ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা চলে না। কী করা যায়? ভেবে দেখলুম, কিছুই করা যায় না। মানুষ 'হালে পানি' না পেলে—অর্থাৎ কোনও উপায় করতে না পারলে, যা করে থাকে, তাই করতে লাগলুম; অর্থাৎ ভগবানকে ডাকতে লাগলুম। তাই কি একমনে নিশ্চিন্তে ডাকবার উপায় আছে? সঙ্গে-সঙ্গেই অসংখ্য মশা এসে কপালে, মুখে, কানে, ঘাড়ে, পিঠে, পেটে, পায়ে, অলিতে-গলিতে তীব্র দংশন ক'রে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। মশা-মাছির উৎপাতে যখন এই রকম অতিষ্ঠ হয়ে এবং অর্ধমৃত হয়ে পড়েছি, ঠিক সেই শুভ সন্ধিক্ষণে একদিন চরম দুর্ভোগ ঘটে গেল।

সেদিন রাত্রে প্রায় সারারাত ধরেই বৃষ্টি হয়েছিল। ভোর পাঁচটায় বিছানা থেকে ওঠা আমার চিরকালের অভ্যাস। সেদিন ঐ সময় উঠে দেখি, দালানের দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ করচে, ছেলেদের শোবার ঘরের দরজাটাও খোলা। এত ভোরে ওরা ত কেউ ওঠে না। ঘরের ভেতর ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাতেই আমার চক্ষুস্থির! যা-কিছু ও-ঘরে ছিল, চোরে সমস্তই নিয়ে গেছে! অশেষের বড় সুটকেসটা, অমলের ট্রাংক, অসীমের ইলেকট্রিক 'গীটার,' ওর মায়ের সংসার খরচের হাত-বাক্সটা—সবই। অর্থাৎ প্রায় হাজার টাকার জিনিস! তারপর রান্নাঘরে গিয়ে দেখা

গেল, সেখানেও মহাপ্রভু বেশ-কিছু দয়া করেছেন। যা-কিছু বাসন-পত্তর ছিল, তার একখানাও নেই। তার ওপর, বলতে লজ্জা করে, উনানের মধ্যে একটা নোংরা কাজ করে রেখে দিয়ে গেছে। ওঃ! আমার মাথা ঘুরে গেল! দুর্ভোগের চূড়ান্ত! কলা-বাগানে এসে আজ দুঃখ-দুর্দশার ষোল-কলাই পূর্ণ হলো! কিংবা তা'ও বলা যায় না; অপরং বা কিম্ ভবিষ্যতি! পাড়ার সকলে বল্লেন—বর্ষাকালটায় চোরের উপদ্রব একটু হবে; বাড়িটা একেবারে মাঠের ধারে নির্জন জায়গায় কিনা! তবে……।

আর 'তবে'র দরকার নেই; ছেলেদের বল্লুম—যত টাকাই ভাড়া হোক, অন্য বাড়ির খোঁজ কর। যেখানেই হোক; এমন কি 'যমের বাড়ি' হলেও সেইখানে যাব, 'গোলোক-ধামে' আর কিছুতেই থাকবো না,—একটা দিনও না।

ভগবানের অশেষ দয়া, অশেষ সেইদিনই দক্ষিণেশ্বরে একখানা বাড়ির খোঁজ নিয়ে এলো। এঁড়েদ' আর দক্ষিণেশ্বর পাশাপাশি, একেবারে লাগোয়া। তখনি আমি সেই বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করলুম। ভাড়া জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন—ভাড়া পঞ্চাশ করে। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা চল্লিশ করেই দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু……

'কিন্তু'র কথা আর বলতে না দিয়ে বল্লুম—পঞ্চাশ করেই আমি দেবো।

ভদ্রলোক আশার অতীত আনন্দে হাত দুটো কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বল্লেন—তা হলে, কবে থেকে আসবেন? আপনাকে আমি জানি। আপনি এঁড়েদ'র যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ি আছেন ত?

—ছিলুম; কিন্তু বর্তমানে আছি মাঠের ধারে ঐ নতুন কলাগাছ-ওলা বাড়িতে।

—গোলোক-ধামে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তাহ'লে এখন এই পঁচিশটি টাকা নিন—'অ্যাড্‌ভান্স' হিসেবে; বাকী পঁচিশ টাকা মাসকাবারে দিয়ে দেবো,—কেমন? আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার—নমস্কার! কবে তাহ'লে আসবেন?

—আজই। ও-বেলা।

—বেশ। তাহ'লে আমি এখনি ঘরগুলো সব ধুইয়ে রেখে দি।

তারপর আর একদফা পাল্টা-পাল্‌টি নমস্কারের পালা শেষ করে আমি বাইরে চলে এলুম। সদর দরজার পাশে, দেওয়ালের গায়ে, বাড়িটার নাম একখানা ট্যাবলেটে লেখা ছিল। সব অক্ষরগুলো পড়া যায় না। কোনও দুষ্টু ছেলে বোধ হয় কাদার পোঁচ দিয়ে সবটা ঢেকে দিয়েছিল। বৃষ্টির ছাঁটে সবটা ধুয়ে উঠে গেছে, তবুও মধ্যেকার দু'তিনটে হরফ এখনো কাদায় ঢাকা রয়েছে, পড়া যায় না। ট্যাবলেটখানা চোখে পড়তেই আমি ব্যস্ত হয়ে আবার ভেতরে ঢুকে ভদ্রলোককে ডাকলুম। তিনিও ব্যস্ত হয়ে বাইরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আবার ফিরে এলেন যে?

—দয়া করে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিন। এ-বাড়িতে আমার থাকা চলবে না।

ভদ্রলোক খুব বিস্মিত ও ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন—কেন—কেন?

—আপনার বাড়ির নাম ত গোলোক-ধাম?

—আজ্ঞে না,—'গোবিন্দ-ধাম'। কেন বলুন তো?

—না, কিছু না। কাদা-মাখা রয়েছে কিনা, মাঝের অক্ষর দুটো পড়া যায় না। গোলোক-ধাম যদি হতো, তাহ'লে বিনা-ভাড়াতেও আমি থাকতুম না। যাক—নমস্কার; কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রলোক এতই বিস্মিত হ'য়েছিলেন যে, এবার আমার নমস্কারের উত্তরে প্রতি-নমস্কারের কথাটা তাঁর খেয়ালই হলো না! আমি সদর দরজার কাছ বরাবর যখন চলে এসেছি, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে বাজলো—বাবাই নামটা দিয়ে গেছলেন। তাঁর নাম ৺গোবিন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রায়······

বাকী কথাগুলো আর শুনতে পেলুম না। শোনবার আবশ্যকও ছিল না।

* * * *

সেইদিন অপরাহ্ণেই 'গোলোক-ধাম' ছেড়ে 'গোবিন্দ-ধামে' এসে পড়লুম এবং এসে যেন নবজন্ম লাভ করলুম। রিক্‌শায় ওঠবার সময় দেখলুম, আমার সেই ছোট ছেলে অশোক, হেঁট হয়ে যেন খানিকটা মাটি তুলে নিচ্ছে। আমি বল্লুম—নে—নে, খানিকটা মাটি নিয়ে আয়। 'গোলোক-ধাম'-এর পুণ্য মৃত্তিকা একটু ঘরে রাখা ভাল। অশোক বল্লে,—মাটি নয় বাবা, একটা পাথরের গুলি।

রিক্‌শায় চেপে, বার-বার বাড়িটার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলুম। তিন মাস এখানে থেকে বুঝতে পেরেছিলুম—শুধু বোঝা নয়, হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছিলুম যে, সত্যই এটা 'গোলোক-ধাম'—অর্থাৎ 'বৈকুণ্ঠ'। তবে, লক্ষ্মী-নারায়ণের সে-'বৈকুণ্ঠ' নয়। গত যুগে নীলকর সাহেব-নারায়ণদের ও কোন-কোন জমিদারের কাছারী-বাড়িতে অবাধ্য প্রজাকে পীড়ন ও শাসন করবার জন্যে যে 'বৈকুণ্ঠ' থাকতো, এ হ'ল সেই 'বৈকুণ্ঠ'। সে-'বৈকুণ্ঠে' যে তিন দিন থাকতো, তা'কে আধ-মরা হ'য়ে বেরিয়ে আসতে হতো। শ্রীভগবানের অপার কৃপায় আমি প্রায় তিন মাস এ-বৈকুণ্ঠে কাটিয়ে সুস্থ শরীরে ও বহাল তবিয়তে বেরিয়ে আসতে পারলুম। সুতরাং আসবার সেই শুভক্ষণে আমি প্রাণ খুলে মনে-মনে 'গোলোক-ধামের' স্তুতিগান গেয়ে, তাঁকে ও তাঁর মালিককে নমস্কার জানিয়ে বল্লাম—

ওঁ শ্রীগোলোক বাবুকায় নমঃ,
ওঁ তস্য গোলোক-ধামায় নমঃ,
ওঁ ছাদায় নমঃ,
ওঁ সাপায় নমঃ,
ওঁ মশায়ো নমঃ,
ওঁ চোরায় নমঃ,
ওঁ নমো—নমো—নমঃ !

এক খিলি পান

॥ এক ॥

সকাল বেলায় মতিলালের বৈঠকখানায় বসিয়া পাঁচজন আলাপ-আলোচনা করিতেছিল,—তুই ভ্রাতা জ্যোতিলাল ও মতিলাল, আর মতিলালের তিন বন্ধু—রমেন, তিনকড়ি আর শশাঙ্ক। পাঁচটি খালি চায়ের বাটি টেবিলের উপর পড়িয়াছিল ; পাশে মতিলালের পানের ডিবা।

আলোচনা চলিতেছিল, আবার শীঘ্রই একটা তৃতীয় মহাযুদ্ধ নিশ্চয়ই বাধিবে। সেই যুদ্ধে, একদিকে পৃথিবী ধ্বংস পাইবে, অপরদিকে নতুন করিয়া আবার গড়িয়া উঠিবে।

তিনকড়ি বিজ্ঞের মত বলিল—অর্থাৎ, সেইখান থেকেই হবে—যুগ পরিবর্তন ; নবযুগের সৃষ্টি হবে তখন থেকেই ; পুরোনো যুগ ধ্বংসের মধ্যে মিলিয়ে যাবে।

শশাঙ্ক কহিল—নবযুগ সৃষ্টির কি যে আর বাকী আছে, তা তো বুঝি না। চিরকালের চার টাকার চাল পনের টাকা হয়ে, সেইটেই র'য়ে গেল। ছ' আনার সরষের তেল আর আট আনার নারকোল-তেল পাকা-পাকি প্রোমোসান্ পেয়ে বসেছে—তু' টাকায় আর চার টাকায়। আট আনার মাছ হয়ে উঠলো—আট্-আষ্টে চৌষট্টি আনা ; এবং এই রকম সবই। সুতরাং······

'সুতরাং'কে একটা থাবা মারিয়া, জ্যোতিলাল কহিল—কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা হচ্ছে······

আশ্চর্যের কথাটা বলিবার আগে মুখটাকে একটু সরস করিয়া লইবার ইচ্ছায় জ্যোতিলাল মতিলালের পানের ডিবাটা খুলিয়া, শেষ যে খিলিটা তার মধ্যে ছিল, সেটা মুখে পুরিতে গেলে, মতিলাল লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—ঐ এক খিলি মাত্র আছে, ওটা আর তুমি খেও না······—কিন্তু নিষেধের আর সময় রহিল না ; তৎপূর্বেই পানের খিলিটি জ্যোতিলালের মুখমধ্যে গিয়া

পড়িল। খুব বিরক্ত হইয়া মতিলাল কহিল—তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। একটা বিবেচনা নেই যে……।

পান চিবাইতে-চিবাইতে জ্যোতিলাল কহিল—থাম্—থাম্, ভারি ত একখিলি পান, তার আবার……

—ভারি হোক্, হাল্কা হোক্, তা'র ত কোন কথা হচ্ছে না; আমি খাব বলে ঐ খিলিটা রেখে দিয়েছিলুম, আর তুমি টপ্ করে……

আচ্ছা, তোকে আমি দশ খিলি পান এনে দেবো এখন।

মুখখানাকে বাঁকাইয়া মতিলাল কহিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ, দাও তুমি সবই। রোজ সকালে সমানে এসে চা খেয়ে যাও, কখনো দেখলুম না, যে এক পাউণ্ড চা, বা এক পো চিনি হাতে ক'রে নিয়ে এলে।

জ্যোতিলালের মুখখানা হাঁড়ীর মত হইয়া উঠিল; কহিল—তা তুই ত বল্লেই পারতিস্ যে, চা খেতে গেলে দাম দিতে হবে। তা-ই দিতুম তা হ'লে।

—আমি ত 'হট্-টি'র দোকান খুলে বসিনি, যে দাম নিয়ে……

ক্রমশঃই কথার পিঠে কথা বাড়িতে লাগিল। বে-গতিক দেখিয়া বন্ধুত্রয় একে-একে গাত্রোত্থানপূর্বক অন্তর্ধান হইল।

এদিকে দুই ভ্রাতার উত্তর-প্রত্যুত্তর চরমে উঠিয়া বৈঠকখানাকে মাত্রা ছাড়াইয়া গরম করিয়া তুলিল। জ্যোতিলাল রাগে কাঁপিতে-কাঁপিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল—আচ্ছা, দেখে নোব তোকে পাজী, র‍্যাস্কেল কোথাকার!

মতিলালও অগ্নিশর্মা হইয়া কহিল—আমিও দেখে নোব তোমায়—ব্রুট্, ছোটলোক কাঁহেকা!

হায় রামচন্দ্র! হায় লক্ষ্মণ! বহু জন্মান্তর গ্রহণের পরে, তোমরাই কি জ্যোতিলাল-মতিলালরূপে এবার জন্মগ্রহণ করিয়াছ?

*　　*　　*　　*　　*

বাপ মারা গিয়াছেন আজ পাঁচ বৎসর।

তার পর হইতেই দুই ভাই পৃথক। মা আছেন; কাশীবাসিনী। আট টাকা করিয়া যোল টাকা দুই ছেলেকে সেখানে মাসোহারা পাঠাইতে হয়।

পৈত্রিক বাড়ীখানায় পূর্ব-পশ্চিম এক সারিতে চারিখানা শয়ন-ঘর। পূবের শেষ ঘরখানার উপর দ্বিতলে একখানা ঘর এবং পশ্চিমের শয়ন ঘরখানার সংলগ্ন বৈঠকখানা। সুতরাং খুব সহজেই বাড়ী ভাগ হইয়া গিয়াছিল। জ্যোতিলাল দ্বিতলের ঘরখানা সমেত নীচের পূবদিকের দুইখানা ঘর লইয়াছিল; আর মতিলাল পশ্চিমের দুইখানা ঘর ও তৎসংলগ্ন বৈঠকখানা আপন দখলে রাখিয়াছিল। কিন্তু সদর ছিল একটা; এবং সেটা ছিল—মতিলালেরই দিকে। সুতরাং ঐ সদর দিয়াই জ্যোতিলালকে বাড়ী ঢুকিতে হইত; তাহার অংশে আসিবার ভিন্ন পথ বা দরজা ছিল না। বাড়ী ভাগের সময় সালিসিতে ঐরূপ বন্দোবস্তই করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

পুত্র দুইটিকে ভালোরূপ লেখাপড়া শিখাইবার সকল প্রকার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন হিসাবী পিতা হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, চাকুরীর দ্বারা উহাদের ভবিষ্যৎ-জীবন সচ্ছল ভাবে কাটিবে না। ইহা বুঝিয়াই তিনি দুই পুত্রকে দুইখানি ষ্টেসনারী দোকান করিয়া দিয়াছিলেন; একখানি শ্যামবাজারে, একখানি রাধাবাজারে। এই রাধা-শ্যামের দৌলতেই, দু'জনের রাজার ন্যায় ধন-দৌলত না হইলেও, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উপযুক্ত বেশ-কিছু আয় হইত, যদ্দারা উভয়ের সংসারে কোনরূপ অভাব-অনটন দেখা যাইত না। বিশেষতঃ যুদ্ধের এই কয় বৎসরে তাহাদের উভয়ের ব্যাংক-ব্যালান্স বেশ মোটা রকম ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

সুতরাং দুই বধূর অলংকারের ভারের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের অহংকারের ভারটাও যথানিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই জ্যোতিলালের মুখে পানের ব্যাপারটা শুনিয়া বড়বউ কহিল,—কাল থেকে সোনার ডিবেয় করে এক ডিবে পান নিয়ে বোসো; বুঝলে?

—আমি কি আর ওর বৈঠকখানায় ঢুকবো না কি! গলায় দড়ি!

—সদরের 'প্যাসেজ্'টা ত ওর একলার নয়; তুমি সেইখানে একখানা চেয়ার পেতে বসে-বসে রোজ একশো খিলি করে পান খাবে। খেতেই চাও, নইলে আমার মাথা খাবে। আমি পান সাজবার জন্যে একটা ঝি না-হয় আলাদা-ই রাখবো।

দোকানে বাহির হইবার সময় হইয়াছিল। জ্যোতিলাল উপস্থিত এ-বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া, গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া কল-ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

পরদিন প্রাতে যথারীতি মতিলালের বৈঠকখানায় চায়ের আড্ডা বসিয়াছিল এবং রোজ যাহারা হাজির থাকে, তাহারা সকলেই হাজির ছিল; গর-হাজির শুধু জ্যোতিলাল। কিন্তু শীঘ্রই জ্যোতিলাল হাজির হইল—বাজার হইতে; সঙ্গে এক ঝাঁকামুটে। মুটের ঝাঁকায় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে—প্রকাণ্ড এক পানের তাড়া, আর ভিন্ন-ভিন্ন ছোট আকারের ধামাতে—এক ধামা সুপারী, এক ধামা খয়ের, এক ধামা এলাচ, এক ধামা লবঙ্গ, ধনের চা'ল, যোয়ান মৌরি ইত্যাদি।

বৈঠকখানার খোলা দরজার সামনে, 'প্যাসেজে'র রোয়াকটার উপর বিনা কারণে শুধু-শুধুই একবার ঝাঁকাটা নামানো হইয়াছিল; কারণ, সঙ্গে-সঙ্গেই জ্যোতিলাল মুটের উদ্দেশ্যে কহিল—আচ্ছা, একদম্ ভিতরমে চ'লো। সুতরাং উভয়েই 'একদম্ ভিতরমে' চলিল।

এই ব্যাপারে মতিলাল ও আর-সকলে পরস্পর চোখ টেপা-টিপি করিল।

রাত্রে মতিলাল দোকান হইতে বাড়ী আসিলে, ছোটবউ কহিল —আজ সারাদিন বাড়ীর মধ্যে পানের বন্যা বয়ে গেছে এবং সেই বানের জল চারিদিকে এখনো ছড়াছড়ি।

মতিলাল জামা-কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল—কি রকম ?

—রকম আর কি ! উঠোনে, দোয়ারে, রকে চারিদিকেই পানের খিলি আর পানের পিচ্।

—আমাদের দিকেও না কি ?

—আমাদের দিকে কি করে হবে ; ওদের দিকে।

মতিলাল কিছু না বলিয়া মুখ-হাত ধুইতে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা মতিলাল বন্ধুদের লইয়া বৈঠকখানায় চা খাইতে বসিলে, জ্যোতিলাল একখানা খবরের কাগজ ও প্রকাণ্ড এক পানের ডিবা হাতে লইয়া বৈঠকখানার 'প্যাসেজে'র রোয়াকে আসিয়া বসিল। মুখে ঠাসা একমুখ পান। তাহার কিছু-কিছু রস, দুই কষের ফাঁক দিয়া গড়াইয়া পড়িতে উদ্যত। তাহার সামনে বৈঠকখানার দরজা খোলা ছিল। জ্যোতিলাল খানিক খানিক খবরের কাগজের খবর পড়ে, আর পিক্-পিক্ করিয়া এ-পাশে, ও-পাশে, সামনে, পিছনে পানের পিচ্ ফেলে। দেখিতে দেখিতে সারা 'প্যাসেজ'টা পানের পিচে নোংরা হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা মতিলাল বরদাস্ত করিতে না পারিয়া কহিল—প্যাসেজ্টা এ রকম নোংরা করা ত ভাল হচ্ছে না।

ফোঁস করিয়া জ্যোতিলাল বলিল—ভাল হচ্চে, কি মন্দ হচ্চে, সে আমি বুঝবো।

তখন তার উপর আরো একটু ফোঁস্ করিয়া মতিলাল কহিল—প্যাসেজ্টা ত আর তোমার একলার নয়, সুতরাং আমাকেও কিছু বুঝতে হবে।

ঘরের ভিতর হইতে তিনকড়ি জ্যোতিলালের উদ্দেশ্যে কহিল—জ্যোতিদা, সামান্য কারণ নিয়ে কেন মিছিমিছি……

হাউই বাজীর মত জ্যোতিলাল গর্জাইয়া উঠিল—শ্যট্ অপ্ ইউ ননসেন্স্—ইউ হ্যাভ্ নো······যত সব র‍্যাজ্‌লাটে খোসামুদের দল···কাঁহেকা!

মতিলাল ভীষণ গরম হইয়া উঠিয়া কহিল—মুখ সামলে কথা কইবে, বলে দিচ্চি! ওরা আমার কাছে এসেচে, তোমার কোন কথার ওরা ধাব ধারে না।

—জুতো মেরে তোর মুখ ছিঁড়ে দেবো, পাজী, রাস্‌কেল, কাঁহেকা!

ক্ষিপ্তের মত মতিলাল দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার পর যা' ঘটিল, তা' অবর্ণনীয়। দুই ভ্রাতার গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিল। ভীষণ কাণ্ড। দুইজনেই ক্ষত-বিক্ষত হইল। সদর দরজা খোলা ছিল; সুতরাং পথে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে এবং রমেন, তিনকড়ি, শশাঙ্ক প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া দুইজনকে দুইদিকে টানিয়া লইয়া গেল। রুদ্ধ আস্ফালনে দুই ভাই গর্জাইতে লাগিল।

বন্ধুদের পরামর্শে মতিলাল তখনই স্থানীয় পুলিস-থানায় গিয়া 'ডায়েরী' লিখাইয়া আসিল। খবর পাইয়া, বড়-বউয়ের পরামর্শে জ্যোতিলালও কিছু পরে 'ডায়েরী' লিখাইতে ছুটিল। সেদিন আর কাহারো দোকানে যাওয়া হইল না। স্ব স্ব বন্ধুবর্গের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, দুই ভাই সারাদিন ধরিয়া নানারূপ শলা-পরামর্শ আঁটিতে লাগিল এবং তাহার ফলে দুইদিন ধরিয়া উকীলের বাড়ী হাঁটা-হাঁটির পর, তৃতীয় দিনে ফৌজদারী কোর্টে উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়া দিয়া আসিল।

দুই বধূও নেহাৎ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। বড়বউ তাহার ছোট ভাইকে চিঠি দিল—'রমেশ. পত্র পাঠ তুমি এখানে চলিয়া আসিবে।' ছোটবউ দেশে তাহার দাদাকে লিখিল—'দাদা, কিছুমাত্র দেরী না করিয়া তুমি এখানে আসিবে, বিশেষ আবশ্যক; অন্যথা করিও না।'

দুইজনের কেহই আসিতে অন্যথা করিল না! দিন চারি-পাঁচের মধ্যেই ইহারা দুইজনে আসিয়া পড়িল। ছোটবউয়ের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বিষ্টু, অর্থাৎ ছোটবৌয়ের দাদা কহিল—ব্যাপার তাহ'লে রীতিমত গড়িয়েচে! আচ্ছা, কুচ্ পরোয়া নেই; দিচ্চি সব ঠিক কোরে।

রমেশ তা'র দিদিকে কহিল—এক দফা নালিশ ত রুজু হয়েচে, ঠিকই হয়েচে; তারপর দেখা যা'ক, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!

॥ তিন ॥

দুই সংসারে দুই শ্যালকের আবির্ভাব হইবার পর হইতে, জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িতে সুরু করিল। আড়াই মাসের মধ্যে, দুই নম্বর দাওয়ানী ও তিন নম্বর ফৌজদারী মামলা উভয়পক্ষ হইতে দায়ের হইয়াছিল। এই আড়াই মাসের মধ্যে, দোকান দুইখানি দৈবাৎ কোন-কোন দিন খোলা হইয়া থাকিবে, তাহা প্রায় বন্ধেরই সামিল। পাঁচ-পাঁচটি মামলার তদ্বির-তদারক, সাক্ষী-সাবুদ, উকীল-মোক্তার, মুহুরী-পেসকার ইত্যাদিতে দুই পক্ষেরই হু-হু করিয়া অর্থ ব্যয় হইতেছে। যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহা ব্যয় হইয়া গিয়া উভয়েরই কিছু-কিছু ঋণ হইতে সুরু হইযাছে। তত্রাপি কোন পক্ষই নরম নহে, বা ঠাণ্ডা নহে। দুই পক্ষেই শক্তিশালী দুইটি দল গঠিত হইয়াছে, একদলের 'হেড্'—রমেশ, অপর দলের 'হেড্'—বিষ্টু।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, চা ও পান-সিগারেটের সঙ্গে দুই দলেরই বৈঠক বসে। রমেশ বীরের মত মেজের উপর কিল মারিয়া বলে—নেবেচি যখন, তখন এর শেষ না কোরে আর ছাড়বো না; দেখা যাক, কতদূর কি হয়!

বৈঠকখানা ঘরে বিষ্টু আড়ে-আড়ে মতিলালের দিকে চাহিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া হুংকার দেয়—কিছুতেই ছাড়া হবে না! ঘুঘু দেখেচে, ফাঁদ ত দেখেনি।

শশাঙ্ক একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল—'ডুবিচি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি!' ওদের নাস্তা-নাবুদ করতে হ'বে; কি বল মতি?

মতিলাল কোন উত্তর না দিয়া, যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তেমনি ভাবেই সামনের দেয়ালের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তিনকড়ি কহিল—সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী; রমেশটার কি তেজ দেখেচো?

দর্পের কণ্ঠে বিষ্টু কহিল—ওর তেজ আমি ভেঙ্গে দিচ্চি। ওকে যদি আমি জেল খাটাতে না পারি, তা হলে আমার নাম বিষ্টু নয়। ওকে দেখ না, একেবারে ঢিট্ কোরে দোবো।

—তুই ত তুই, তোর বাবা এলেও আমাকে ঢিট্ করতে পারবে না।—কথাগুলা রমেশের। মিনিট দুই-তিন হইল, সে অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। হঠাৎ রমেশের কণ্ঠের আওয়াজে সকলে চমকিয়া উঠিল। রমেশ দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল—মুখ সামলে কথা কইবি, কেষ্টা।

—তুই মুখ সামলে কথা কইবি।

—খবরদার!

—তুই খবরদার! ষ্টুপিড, ড্যাম্, ফুল!

রমেশ 'প্যাসেজে'র মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল; ঘুসি পাকাইয়া রোয়াকের উপর উঠিয়া আসিল। সঙ্গে-সঙ্গেই বিষ্টু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে মারিল এক প্রচণ্ড ধাক্কা। ধাক্কা খাইয়া রমেশ রোয়াকের উপর হইতে নীচে আসিয়া পড়িল, কিন্তু তখনই সে বিষ্টুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর চলিল ঘুসো-ঘুসি, কিলো-কিলি, চড়-চাপড় ইত্যাদি। ব্যাপারটা রক্তা-রক্তিতেই শেষ হইত, কিন্তু তিনকড়ি, শশাঙ্ক প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া দুইজনকে দুইদিকে টানিয়া লইয়া গেল। মারপিট্টা বেশী দূর গড়াইতে পারিল না বটে, তবে পরদিনই আর এক নম্বর ফৌজদারী দায়ের হইল: ফরিয়াদী—বিষ্টু, আসামী—রমেশ।

*   *   *   *   *

নূতন ফৌজদারী মামলার বিচার চলিতেছিল।

কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া—আসামী রমেশ। রমেশ মার-পিটের কথা একেবারেই অস্বীকার করিল; কহিল যে, ঘটনার দিন সে কলিকাতাতেই ছিল না। সে বরাবর দেশে থাকে এবং দেশেই ছিল। সম্প্রতি দু'একদিন হইল সে কলিকাতায় তাহার ভগ্নীপতির বাটীতে আসিয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের উকীল প্রশ্ন করিল—ঘটনার দিন চৌঠো তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন?

—দেশে।

—দেশ থেকে কোন্ তারিখে আপনি কোলকাতায় আসেন?

—পনেরই তারিখে।

—তা হলে ঘটনার দিন—অর্থাৎ চৌঠো তারিখে আপনি কোলকাতায় ছিলেন না, এইটেই সত্য বলে আমি ধরে নেব ত? না, এইটে ধরে নেব যে, আপনি হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে মিছে কথা বলছেন?

—আমি কখনো মিছে কথা বলি না।

—সাধু। কিন্তু এ কথাটা কি ঠিক যে, ঐ চৌঠো তারিখে, আপনার নামে ইনসিওর-করা একটা কভার এখানে আসে এবং আপনি সই দিয়ে সেটা নেন্?

রমেশের মুখ সহসা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল এবং তাহার সর্বদেহ অবশ হইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া হাকিম তাহাকে কাঠগড়া হইতে নামিয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

আরও খানিকক্ষণ উভয় পক্ষের উকীলদের সওয়াল-জবাবের পর হাকিম রমেশকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া রায় দিলেন:—দুইশত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাস জেল।

॥ চার ॥

—আমি গা থেকে আর গয়না খুলে দিতে পারব না।

—তা না পারলে ও জেল খাটুক। আমার কোন দিকে আর কিছু নেই।

বড়বউ ও জ্যোতিলালে কথা হইতেছিল।

—তোমার থাকুক আর না-থাকুক আমার তা জানবার দরকার নেই; তবে, গায়ের গয়না খুলে আমি আর দিতে পারবো না। মোকদ্দমা যখন করতে গিয়েছিলে, তখন বোঝা উচিত ছিল যে রাশি-রাশি টাকা খরচ হবে।

—মোকদ্দমা করতে তুমিই ত তখন লাফিয়েছিলে।

—আমি লাফিয়েছিলুম ?

—লাফাওনি ? তুমিই ত বলেছিলে যে, যত টাকা লাগুক, একবার দেখে নিতে হবে। তারপর, চিঠি লিখে মামলা-বাজ ভাইটিকে পর্যন্ত আনিয়ে ফেল্লে। এখন পেছিয়ে গেলে চলবে কেন। এ দু'শো টাকা দিতে না পারলে, তিনটি মাস ওকে জেলের ঘানি টানতে হবে !

বড়বউ আর কোন কথা না বলিয়া, মুখখানা গোঁজ্ করিয়া বসিয়া রহিল। মোকদ্দমার জন্য বড়বউয়ের গায়ের অর্ধেক গহনাই 'বিক্রমপুর' চলিয়া গিয়াছিল। ব্যাংকে যে টাকা জমা ছিল তাহার সবই গিয়াছে; শ্যামবাজারের দোকানখানার যা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা যাওয়ারই সামিল। এসব ছাড়া, বাইরে কিছু-কিছু ঋণও হইয়াছে। সুতরাং জ্যোতিলালকে খুবই ভাবাইয়া তুলিল।

দুইশত টাকা জরিমানা দিবার জন্য, বড়বউ শেষ পর্যন্ত তার গলার মব্‌চেন ছড়া খুলিয়া দিলেও, জ্যোতিলালের বিমর্ষভাব ঘুচিল না। তার এখন মোকদ্দমায় কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। কাহারও সহিত আর ভাল করিয়া কথা কহে না। মোকদ্দমার সূত্রে পাড়ার যে-সকল হিতাকাঙ্ক্ষী সকাল-সন্ধ্যায় তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত, তাহাদের নিকট হইতে সে এখন দূরে থাকিবার চেষ্টা করে।

মতিলালের অবস্থাও ঐরূপ। তাহারও ব্যাংকের টাকাগুলি গিয়াছে; রাধাবাজারের দোকানখানি টল্-মল্ করিতেছে এবং বাজারে তাহারও কিছু ঋণ জমিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে, তাহার ইচ্ছা থাকিলেও জ্যোতিলালের মত সে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর দল হইতে দূরে থাকিতে এখনো পারে নাই। মামলার সখ তাহার দস্তুরমতই মিটিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পর মতিলালের বৈঠকখানায় ছোট-খাটো একটা ভোজের আয়োজন চলিতেছিল। মাংস, পাঁউরুটি আর রসগোল্লা। একধারে স্টোভে মাংস চাপিয়া গিয়াছিল। আজিকার ভোজের কারণ—রমেশের মামলায় পরাজয় ও জরিমানা।

ঘণ্টা দুই বাদে, মাংসের ঝোলে এক খণ্ড রুটী ডুবাইয়া শশাঙ্ক বলিল—রমেশকে আজকের ভোজে আমাদের নেমন্তন্ন করা উচিত ছিল, কি বলিস্ নন্দ ?

নন্দ একখানা হাড় চুষিতে চুষিতে কহিল—একশোবার; খুব ভুলটাই আমাদের হয়ে গেছে।

তিনকড়ি কহিল—তার নাম করে খেলেই হবে'খন—বলিয়াই অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—থ্রি চিয়ার্স ফর রমেশ য়্যাণ্ড হিজ্......

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল—চুপ্ করে খেয়ে যা, চেঁচাস্ নি; ঐ শুনে আবার সে ছুটে আসুক !

তিনকড়ি কহিল—আসুক না; আর এক দফা লাগে ত লাগুক; কি বল, মতি ?

মতিলাল কোনরূপ উত্তর বা উৎসাহ না দিয়া, ঘাড় হেঁট্ করিয়া খাইয়া যাইতে লাগিল।

নন্দ কহিল—আমাদের পোস্টমাস্টারকে একদিন ভাল ক'রে খাইয়ে দেওয়া উচিত। যদিও কোর্টের অর্ডার, তা হ'লেও রমেশের সেই ইন্‌সিওর করার সই আর তারিখ দাখিল করাতেই কেস্‌টা একেবারে ষোল আনা আমাদের দিকে ঘুরে এল।

তিনকড়ি কহিল—ও যে সেইদিনই সই করে ইন্‌সিওর-কভার-খানা নিয়েছিল, তার কথা একেবারেই ওর খেয়াল ছিল না। আমাদের উকীলের ঐ এক কথাতেই ও একেবারে ভড়্‌কে গেল।

—আমিও সব শুনে একেবারে চমকে গেলুম।—খোলা দরজার সামনে যাহার ছায়া পড়িল, সে—নেড়ামামা। ঐ কথা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গে নেড়ামামা ঈষৎ টলিতে-টলিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

নেড়ামামা এ-পাড়ার একজন মাতব্বর ব্যক্তি। বয়স—পঞ্চাশের উপর। একটু 'মাই ডিয়ার' গোছের লোক। 'জলপথে' ভ্রমণ করিয়া একটু রঙে থাকা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাস। সংসারে ঐ একটি জিনিষ ছাড়া, দ্বিতীয় কোন বন্ধন তাঁহার নাই। তিনি সকলেরই সরকারী মামা।

মাস আষ্টেক হইল নেড়ামামা পশ্চিমের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আজই ফিরিয়া আসিয়া জ্যোতিলালের ও মতিলালের ব্যাপার শুনিয়াছেন।

নেড়ামামা মতিলালের উদ্দেশে কহিল—আমি থাকলে এ সব কিছু হ'তে দিতুম না, বাবা। যাক, যা হ'বার হ'য়েছে, এখন সব মিট্‌মাট ক'রে ফেল। শুনলুম, এক খিলি পান নিয়ে এই কাণ্ড। কি ভুল তোদের রে! এক খিলি পানের জন্যে কি ভোগান্তি আর অর্থ-নষ্ট একবার ভাব্‌ দেখি।······সেটা কোথায়? বাড়ীর ভেতর বোধ হয়? একবার তার সঙ্গেও দেখা ক'রে আসি।—বলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—তোরা সব যেন নিজেরাই খেয়ে ফেলিস্‌নি, একটা ডিশ্‌ মাংস, আর কিছু রসগোল্লা আমার জন্যে রাখ্‌। জ্যোতের সঙ্গে দেখা করে, আর একটা 'পেগ্‌' টেনে নিয়ে এখনি আমি আসছি।

যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—শোন্‌ মতে, যে জিনিষটার জন্যে এই মহামারী কাণ্ড বাধলো—অর্থাৎ একটা খিলি পান—সেই পানকে তোরা দু'জনে ত্যাগ কর্‌; পান তোরা

আর খাস্ নি। পুরীতে গিয়ে পানটা তোরা জগন্নাথকে দিয়ে আয় লোকে লাউ-শাক, পুঁই-শাক, কুমড়ো, তাল, বেল—কত-কি দিয়ে আসে, তোরা জগন্নাথকে পান দিয়ে আয়!—বলিতে বলিতে নেড়ামামা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

*   *   *   *

গভীর রাত্রি। সব দিক নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রিত।

হঠাৎ ছোটবউয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখিল, মতিলাল শয্যায় নাই। আস্তে আস্তে উঠিয়া দালানে আসিয়া, জানালার ফাঁকে দেখিল, দুইভাই রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া কি-সব কথা কহিতেছে, ছোটবউ ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। আবার আস্তে আস্তে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং মতিলালের ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত মতিলাল আসিল না। ছোটবউ আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন দুই দলের বন্ধুবর্গ এবং বিষ্টু ও রমেশ একটা খবর পাইয়া চমকিয়া উঠিল।

সকলে শুনিল যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী যে-কয়টা অবশিষ্ট মামলা তখনো কোর্টে চলিতেছিল, উভয়পক্ষ প্রত্যেক স্থলেই যুক্ত-দরখাস্ত করিয়া সে-সকল প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে। বন্ধুর দল ইহা লইয়া জ্যোতিলাল ও মতিলালের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতে আর সাহসী হইল না। কে-একজন এই বিষয়ে জ্যোতি-লালকে কিছু বলিবার উপক্রম করিতেই, জ্যোতিলাল তাহাকে বলিল—হাজার-পাঁচেক টাকার দরকার; কেউ যদি তা দিতে পারে, তা হ'লে আবার চালাই।—কথা শুনিয়া সে এক-পা এক-পা করিয়া সরিয়া পড়িল।

সব চেয়ে বিমর্ষ হইল—রমেশ ও বিষ্টু। তাহারা একেবারেই মুস্‌ড়িয়া পড়িল। দিন দুই-চার পরে বড়বউ একদিন রমেশকে কহিল—তুমি এইবার দেশে চলে যাও। সব যখন মিটে-সিটে গেল, তখন শুধু-শুধু আর এখানে……।

ছোটবউও বিষ্টুকে বলিল—দাদা, দেশে মা একলা রয়েচে; আর ত তোমার এখানে থাকবার কোন দরকার নেই। উনি বলছিলেন, কাল সকালে খেয়ে-দেয়ে···।—বিষ্টু মুখখানাকে বিরক্তিতে ভরাইয়া তুলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

* * * *

পুরী। জগন্নাথের মন্দিরের অভ্যন্তর।

একজন পাণ্ডার মুখের দিকে চাহিয়া জ্যোতিলাল ও মতিলাল একস্থানে দাঁড়াইয়া ছিল; উভয়েরই হাতে এক এক গোছা পান ও একটা করিয়া পুঁটুলী।

পাণ্ডা কহিল—তা হলে মহাপ্রভুকে আপনারা 'পানই' দেবেন ত?

—হ্যাঁ, পাণ্ডাঠাকুর।

—শুধুই পান দেবেন, না ওর সঙ্গে আর কিছুও দেবেন?

—পান খেতে গেলে ওর সঙ্গে যা' যা' লাগে, সবই আমরা জগন্নাথের চরণে দিয়ে যা'ব। সুপারী, খয়ের, মশলা······।

—সব এনেচেন ত?

হাতের পুঁটুলী দেখাইয়া উভয়ে বলিল—সবই এনেচি।

—পুষ্প, চন্দন ·····?

—তা'ও এনেচি।

—দশটা ক'রে কুড়িটা টাকা বার করুন।

—আপনার দক্ষিণা ত?

—মাশুল—মাশুল! প্রণামী আর দক্ষিণা সে ত আলাদা আছেই।

জ্যোতিলাল ও মতিলালকে লইয়া পাণ্ডা তখন জগন্নাথদেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

— ——

তিনি ও তাঁহার স্ত্রী

'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী। সংসারে আর কেউ......'।

মৃণালবাবু গল্প লিখিতে স্নুরু করিয়াছেন। 'মালঞ্চ' মাসিক-পত্রের সম্পাদক তাঁহাকে জোর তাগিদ দিয়া লিখিয়াছেন—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও 'মালঞ্চে'র শারদীয়া সংখ্যা আপনাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া, পূজার পূর্বেই বাহির হইবে। এ জন্য আপনার একটি গল্প যাহাতে ১০ই ভাদ্রের মধ্যে আমাদের হাতে......' ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিখানা আজই অপরাহ্নে তিনি পাইয়াছেন। এবং পাইবার পর হইতেই গল্পের প্লট্ ভাবিতেছেন। বহু প্লট্ আংশিকভাবে তাঁহার মাথায় আসিয়া যোগায়, কিন্তু ঠিক—যাহাকে বলে লাগ্‌সই হওয়া—তেমনটি আর হয় না। অবশেষে অনেক ভাবিতে ভাবিতে, রাত্রের আহারাদির পর একটা প্লট্ তাঁহার মাথার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। রাত সাড়ে দশটা। তিনি তখনই কাগজ কলম লইয়া লিখিতে স্নুরু করিয়া দিলেন—

'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী। সংসারে আর কেউ......'

মেজেয় বসিয়া তখন মনোরমা একমনে কি-একটা কাজে রত ছিল। মৃণালবাবু লিখিতে লিখিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—তুমি শুয়ে পড়ো, আমার শু'তে অনেক দেরী হবে। রাত দুপুরে বুঝি তোমার নখ কাটবার সময় হলো?

মাথা হেঁট্ করিয়া মনোরমা পায়ের নখ কাটিতে কাটিতে কহিল—এ বাড়ীর এই-ই নিয়ম; নইলে সারাদিন কেটে গেল, এই রাত দুপুরে তুমি বসলে লিখতে!

—আরে, আমার যে পূজো-সংখ্যার গল্প লেখার তাগিদ্! আমি যে মালঞ্চের গল্প লিখচি!

—ওঃ! গল্প? আমি ভেবেচি ধোপার হিসেব! তা—গল্পও ত দিনের বেলা লেখা যায়।

—তোমার যেমন নিরেট মাথা, তেমনি নিরেট বুদ্ধি! গল্প লেখার বুঝি দিনের-বেলা রাতের-বেলা আছে? যখনি 'থট্' আসবে, তখনি লিখতে হবে।

নখ কাটা হইয়া গিয়াছিল; ছুরিখানা বন্ধ করিয়া মনোরমা কহিল—তোমার 'থট্'-আসার আর ভাব্না কি। শ্বশুরমশাই তোমার যা নাম রেখেছিলেন, সার্থক নাম। তোমার মাথার ওপরই ত পদ্মাসনার আসন পাতা। তিনি একটু গা-নাড়া দিলেই ত তোমার মাথার মধ্যে 'থট্' গজ্-গজিয়ে উঠবে, তার জন্যে রাত-দুপুরে ব'সে লেখবার দরকার কি?—বলিয়া মনোরমা আলোর সুইচ্টা টিপিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ঘর অন্ধকার হইয়া গেল।

মৃণালবাবু একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন—আচ্ছা, এ কী কাণ্ড তোমার? ভারী ছেলেমানুষী বুদ্ধি!

—ছেলে-মানুষ, তা ছেলেমানুষী বুদ্ধি হবে না ত কি? ৩২ বছর বয়সে ৬০ বছরের জ্ঞান-বুদ্ধি কি করে হ'বে বল?

মৃণালবাবু আর কিছু না বলিয়া, উঠিয়া আলো জ্বালিলেন এবং পুনরায় তাঁহার গল্প লেখায় মন দিলেন—'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী।...' ইহার পর যাহা লিখিবেন, তাহা কি-ভাবে, কেমন করিয়া সাজাইয়া-মানাইয়া লিখিবেন, মৃণালবাবু হাতের উপর গাল রাখিয়া সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তাটা যেন জমাট বাঁধে না; কেমন যেন এলো-মেলো হইয়া যায়। এদিকে ঘুমও পাইয়াছিল—খুব। সুতরাং লেখাটা পরদিনের জন্য রাখিয়া, তিনি শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন সকালে চা খাইবার পর আবার গল্প লেখার কাগজ খুলিয়া বসিলেন:—'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী। সংসারে আর কেউ......'

—মৃণালবাবু আছেন না কি? অ মৃণালবাবু!

বৈঠকখানা ঘরে বসিয়াই লিখিতেছিলেন। সুতরাং উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দিতেই ও-পাড়ার নরেশবাবু প্রবেশ করিয়া কহিলেন—কি হচ্ছে মশাই, ঘরে খিল লাগিয়ে বসে?

—ওই 'মালঞ্চ'র পূজো-সংখ্যার জন্যে লেখা! বলেন কেন আর! ওঃ! কত পাপের ফলে যে লেখক হ'য়ে জন্মেছিলুম! দু'দিন একটু বিশ্রাম নেবার সময় নেই। ১০ই এর ভেতর লেখাটা পাঠাতেই হ'বে। মাঝে আর পাঁচটা দিন মাত্র আছে।

নরেশবাবু বিদ্যাতে একেবারে কাঁচকলা ঠিক বলা যায় না—মোচা; জিজ্ঞাসা করিলেন—মালঞ্চ? মালঞ্চটার মানে কি হ'ল?

—মানে হ'ল—সতরঞ্চ, প্রপঞ্চ, ষ্টীম্-লঞ্চ ইত্যাদি বলিতে বলিতে কেষ্টবাবু প্রবেশ করিলেন; নরেশবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মালঞ্চ নিয়ে মাথা খারাপ করচ কেন চাঁদ? ব্যাপার কি? ছেলে চাক্‌রীতে ঢুকেছে ত?

—আরে, ব্যাপার শুনেচ কেষ্টদা', বাজারে দেশালাই একেবারে গা-ঢাকা! কোন দোকানেই আর একটি দেশালাই নেই; একেবারে দেশ্‌লাই-ছুট্‌!—বলিতে বলিতে রামরতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল।

একে নরেশবাবু, তার উপর কেষ্টদা' আর রামরতন, আর সবার উপর—সতরঞ্চ, প্রপঞ্চ, ষ্টীম্-লঞ্চ, দেশালাই-ছুট্‌,—মৃণালবাবু এ-বেলার মত গল্প-লেখার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, কাগজ গুটাইয়া, কলম রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

* * *

বেলা প্রায় একটা।

ছাদের উপর, সিঁড়ির যেখানে ছায়া পড়িয়াছিল, মৃণালবাবু সেইখানে আহারাদির পর একখানা সতরঞ্চ পাতিয়া 'মালঞ্চ'র গল্প লিখিতে বসিলেন। সেই গল্প—সেই—'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী…।'

হঠাৎ সেই সময় ভোঁ ভোঁ করিয়া একখানা 'সি-প্লেন্' ঠিক তাহার মাথার উপর এত নীচু দিয়া উড়িয়া গেল যে, মনে হইল—আর একটু হইলেই তাহা তাঁহার মাথার সহিত ঠোকা-ঠুকি হইয়া যাইত। মৃণালবাবুর আতংক হইল। তিনি ব্যাপারটা মনে-মনে ভাবিতেছেন, এমন সময় শূন্য হইতে মাথার উপর কি-একটা দ্রব্য

ছলাৎ করিয়া আসিয়া পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গেই ঊর্ধ্বে তাকাইয়া দেখিলেন, একটা চিল ঠিক তাঁহার মাথার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে। অগত্যা আর তথায় তাঁহার বসা চলিল না; 'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী'কে মুড়িয়া, সতরঞ্চ গুটাইয়া, মৃণালবাবু দ্বিতলে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা কহিল—কি হ'ল? ছাদে বুঝি সুবিধে হ'ল না? মালঞ্চে এবার আর তোমার ফুল কিছুতেই ফুটবে না!

—ফুটতেই হবে; ফুটিয়ে তবে আমার কাজ। তোমার জন্যেই ত হচ্চে না। যেই লিখতে বসবো, একটা-না-একটা ব্যাঘাত তুমি দেবে।—বলিয়া মৃণালবাবু মাথাটা ধুইয়া ফেলিবার জন্য বাথ-রুমের মধ্যে গেলেন।

—সে কি গো! আমি ব্যাঘাত দিচ্চি কি রকম? আচ্ছা, আমি দালানে গিয়ে বসচি, তুমি প্রাণ খুলে লেখ।—বলিয়া মনোরমা দালানের আরাম-কেদারাখানায় আসিয়া বসিল।

মৃণালবাবু গল্পের কাগজখানা খুলিয়া—'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী'কে বাহির করিলেন এবং তাহার পর কি লিখিয়া অগ্রসর হইবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে মনোরমার কথার আওয়াজ তাঁহার চিন্তাকে ক্রমাগত বাধা দিতে লাগিল।—বাবুর সঙ্গে এখন দেখা নেই হোগা, বাবু গল্প লিখ্‌তা হায়।—অর্থাৎ পরদেশী চাকর চার দিনের ছুটীর জন্য বাবুকে খুঁজিতেছিল, তাহারই উদ্দেশে মনোরমার উক্তপ্রকার উক্তি।

—এখন হবে না, পুঁটীর মা, এখন যাও; বাবু গল্প লিখচেন যে এখন।—পুঁটীর মা ঝি, তাহার গত মাসের মাহিনার জন্য আসিতেছিল। চলিয়া গেল।

—কেয়া হায়? চিঠি? রেজিষ্টারী চিঠি?—সদর ঠেলিয়া এ-পাড়ার যে পোষ্ট-পিয়ন, সে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। —বাবুকা সহি দেনে হোগা? তব্ আজ নেহি হোগা; বাবু গল্প লিখ্‌তা হায়।

বিরক্তচিত্তে মৃণালবাবু লেখা বন্ধ করিয়া বাহিরের দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—আচ্ছা-গোলমাল তুমি আরম্ভ করেচ! তোমার জন্যেই দেখচি আমার গল্প-লেখা দায় হয়ে উঠলো।

মনোরমা কহিল—সে কি গো! ভালো করলে মন্দ হয়, পূরো কলিকাল কিনা! পাছে তোমার লেখার ব্যাঘাত হয়, তার জন্যে এইখানে ব'সে চৌকি দিচ্ছি, আর বলচ···

—ও-সব বাজে কথা রাখ। পিয়ন এসেছিল? রেজেষ্টারী চিঠি আছে নাকি?

পিয়ন তখনো দাঁড়াইয়াছিল। মৃণালবাবু নীচে চলিয়া গেলেন।

খানিকপরে চিঠিখানা হাতে করিয়া আসিলেন। চিঠিখানা তাঁহার এটর্নীর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। সংবাদটা শুভ; কিন্তু যতটা শুভ আশা করিয়াছিলেন, ঠিক ততটা শুভ নহে। তাই মুখটা একটু বিষণ্ণ এবং মনটা একটু অবসন্ন। সুতরাং তেমন মন লইয়া আজ আর গল্প লেখা চলে না। কি-ইবা করা যায়? মাঝে আর তিনটি দিন মাত্র আছে। যা'ক, তিন দিনেই হইয়া যাইবে। কাল সকালেই চা খাইবার পর ধরিয়া, নাইবার আগেই একেবারে শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। সুতরাং 'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী'কে তখন ড্রয়ারের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন।

পরদিন চা খাইয়াই গল্পের কাগজখানি মৃণালবাবু খুলিয়া বসিলেন।

'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী। সংসারে আর কেউ নেই······।' লিখিতে-লিখিতে মৃণালবাবু একবার ভাবিলেন—'মাত্র তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, দুইটি মাত্র প্রাণী; দু'জনকে নিয়ে গল্প জমাতে পারব কি?'—পরক্ষণেই ভাবিলেন—'খুব পারব। আমার নিজের সংসারে কি হচ্ছে! এক মনোরমাই সংসার সর-গরম করে তুলেচে! সুতরাং·········'

চিন্তায় বাধা জন্মাইয়া মনোরমা আসিয়া সামনের চেয়ারখানা অধিকার করিয়া বসিল—গল্পটা লিখচো বুঝি?

—হ্যাঁ, দেখতেই ত পাচ্চ। তুমি আবার এখানে এসে বসলে কেন ?

—আমি ত তোমার সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী ; সব অবস্থায় আমার ত তোমার পাশে-পাশেই থাকা কর্তব্য।

—এখন তোমার প্রধান কর্তব্য, গল্পটা আমায় লিখে ফেলবার সুযোগ দেওয়া। মাঝে আর তিনটে দিন বাকী, এখন আর এভাবে শত্রুতা কোরো না।

—আমি তোমার শত্রুতা করচি ?

—নিশ্চয়ই। তুমি না থাকলে, গল্প আমি কবে শেষ করে ফেলতুম।

—কিছুতেই পারতে না।

—আলবৎ পারতুম।—বেশ একটু ঝাঁঝের সহিত মৃণালবাবু কহিলেন—নিশ্চয়ই পারতুম।

—বটে ! আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি, তুমি লেখ ; 'মালঞ্চ'কে ফুলে-ফুলে সাজিয়ে দাও।—একটু অভিমান, একটু বিরক্তি মনোরমাকে পাইয়া বসিল। দালানে আসিয়া 'ফোন্', ধরিল—বি বি. থ্রি-টু-সিক্স্-ওয়ান্, প্লীজ্।·········হ্যালো, কে সুরেশ ?··· আমি ছোট্‌দি।···না, ভালই আছি।···আর-সবাইও ভালো।······ বুঝিচি। একটু সাবধানে থাকতে বলিস্।······আর শোন্ ; এখন একবার আসতে পারবি ? হ্যাঁ, ··বিশেষ দরকার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ,···আচ্ছা, তপনকে পাঠিয়ে দে।

শাঁখারীটোলায় মনোরমার বাপের বাড়ী। 'ফোন্' সেইখানেই করিল। সুরেশ তাহার ছোট ভাই ; তপন—ভাইপো, বড় ভাইয়ের ছেলে।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তপন এবাড়ীতে দেখা দিল। মনোরমা পরদেশীকে মোড় হইতে একটা ট্যাক্সি আনিতে পাঠাইয়া তপনকে কহিল—আমি দু-পাঁচদিনের জন্যে একবার ও-বাড়ী যাবো রে।

সামান্য কিছু কাপড়-চোপড় সুট্‌কেসের মধ্যে লইয়া মনোরমা মৃণালবাবুকে কহিল—আমি চল্লুম। গল্পটা এইবার তা হ'লে নিশ্চয় শেষ হ'য়ে যাবে। আর, শেষ হয়ে গেলেই, 'ফোনে' আমাকে সুসংবাদটা দিও, তখনি আবার চলে আসবো।

মৃণালবাবু কোন কথা কহিলেন না। খানিক পরেই ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল এবং মনোরমা তপনকে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া মনোরমা তপনকে কহিল—একটা কাজ করতে হবে, তপু; পেট্‌ ভরে রসগোল্লা খাইয়ে দোবো—খানকতক 'টু-লেট্‌'য়ের বিজ্ঞাপন লিখে ফ্যাল্‌। খান-পঁচিশ হ'লেই হবে'খন। সেইগুলো একটা লোক দিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই মোড়ে-মোড়ে মেরে দিয়ে আসতে হবে।

—কোন্‌ বাড়ীর জন্যে, পিসীমা ?

—সে আমি সব বলে দেবো'খন।

* * * * *

পরের দিন।

প্রাতঃকাল।

'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী। সংসারে আর কেউ নাই।'—মৃণালবাবু চা খাইয়া, পরিপূর্ণ উৎসাহে ও উদ্যমে আজ গল্পের কাগজ খুলিয়া বসিলেন। যেমন করিয়া হউক, আজ গল্প তিনি শেষ করিবেনই। তবে, কল্যকার ন্যায় আজও একবার ভাবিতে লাগিলেন, গল্পের মধ্যে আর একটি 'ক্যারেক্‌টার' আনিয়া ফেলিবেন কি না।

—বাড়ীতে কে আছেন মশাই ?

—অ মশায়! বাড়ী আছেন কি ?

—একবার বাইরে আসুন না গো!

—আরে মশাই, দরজার কড়া নাড়ুন না ভাল করে।

জনতার কোলাহল এবং ডাকা-ডাকি, গল্প-চিন্তামগ্ন মৃণালবাবুর কানে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাঁহার চিন্তারাশিকে ঠেলিয়া দিয়া

তাঁহাকে শশব্যস্তে নীচে নামাইয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, প্রায় পনের-ষোল জন লোক তাঁহার বাড়ীর সামনে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই প্রশ্নের পর প্রশ্ন-বৃষ্টি সুরু হইল—

—বাড়ীটা কোথায় মশাই ?

—শোবার ঘর ক'খানা হবে ?

—ভাড়া কি প্রকার ?

—বাড়ী একতালা, না দোতালা মশাই ?

—এই বাড়ীই কি ?

মৃণালবাবু একেবারে হতভম্ব। ব্যাপার কি ? ব্যাপার কিন্তু খুব সোজা। বাড়ীভাড়ার নোটিস্ দেখিয়া সকলে আসিয়াছে এবং দু'একটি করিয়া আরও আসিতেছে।

মৃণালবাবু প্রথমটায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু পরে সবই বুঝিলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দেখুন, আমার কোন বাড়ী ভাড়া দেবার নেই।

—নিশ্চয় আছে মশাই, নইলে মোড়ে-মোড়ে 'টু লেটে'র নোটিস্ মারতেন না। বলুন না মশায়; ভাড়া যখন দেবেনই, তখন···

—মশায়-রা, আমি দিব্বি করে বলচি, আমার কোন বাড়ী নেই। আমাকে জব্দ করবার মৎলবে, আমার কোন শত্রু মিথ্যা লিখে এই কাণ্ড করেছে।

একজন কহিল—তিনি তা হলে যেমন-তেমন শত্রু নয় —ভীষণ···

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মৃণালবাবু কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, শত্রুই বটে! টু-লেটের কাগজ আপনারা কোথায় কোথায় দেখেচেন ?

—সর্বত্র ; শিয়ালদ'র মোড়ে, বৌবাজারের মোড়ে, বৈঠকখানার বাজারে, গোলদীঘিতে, এস্···

এক ভদ্রলোক পকেট হইতে ভাঁজ-করা একখানা সেই কাগজ বাহির করিয়া দেখাইল। মৃণালবাবু তাঁকে বলিলেন—কাগজখানা বুঝি উঠিয়ে এনেচেন ?

—এ বাজারে কি আর টু-লেটের কাগজ রেখে আসতে আছে। ওঠানো না গেলে, খুঁচিয়ে ছিঁড়ে দিয়ে আসতে হয়; নইলে একখানা বাড়ীর জন্যে এক হাজার খদ্দের গিয়ে হাজির হবে।

একটি ছোকরা বলিল—আমি সহজে কাজ সারি মশাই; আমি শুধু নাম আর ঠিকানা ছুরি দিয়ে বে-মালুম চেঁচে ফেলে দি'।

ইতিমধ্যে আরও পাঁচ-সাত জন আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন এবং আরও আসিবার সম্ভাবনা জানিয়া, সকালের বেলা যখন দুপুরের দিকে গড়াইয়া গেল, তখন মৃণালবাবু স্নানাহার সারিয়া বৈকালের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে ভিতরে আসিলেন।

কিন্তু শুধু বৈকাল নয়, সারাদিন ধরিয়াই তাঁহার কাছে বাড়ীর জন্য লোক আসিতে লাগিল, আর তিনি সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলের কাছে নিজে কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে লাগিলেন।

সারাদিনের এই ব্যাপারে মৃণালবাবু বেশ-একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং সন্ধ্যার পর সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন।

পরের দিনও এ দুর্ভোগের হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। সারাদিন ধরিয়াই লোক আসিয়াছে। গল্প আর এবার তাঁহার লেখা হইল না। রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিলেন, মনোরমারই জিত। সুতরাং সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়াই তিনি মনোরমাকে আনিবার জন্য শাঁখারীটোলায় গেলেন।

বেলা প্রায় নয়টার সময় মনোরমা এ বাড়ীতে আসিল। শয়ন-ঘরের টেবিলের উপর দেখিল, সেই কাগজখানা এক ধারে পড়িয়া রহিয়াছে—সেই সবে-সুরু গল্পের কাগজ, সেই 'তিনি ও তাঁহার স্ত্রী'।

সে দিন ছিল—১১ই ভাদ্র। মৃণালবাবু কাগজখানাকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

বানচাল

সুরবালার মৃত্যুর পর সংসার ছাড়িয়া, বিবাগী হইব মনে করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, হয় হরিদ্বারে, না হয় কাশীতে গিয়া সুরবালার ধ্যানে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিব। কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। ভাগ্যে যাহা ঘটিল, তাহাই বলিতেছি। আমার মনে হয়, লেখকেরা বানাইয়া-বানাইয়া যে-সব কাল্পনিক গল্পাদি মাসিক-পত্রে লেখেন, তদপেক্ষা ইহা পড়িবার উপযুক্ত না হইবার কারণ নাই।

সুরবালাকে যখন কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলাম না, বুক খালি করিয়া যখন বুকের নিধিকে বিদায় দিতে হইল, তখন স্থির করিলাম, আমিও সংসার হইতে বিদায় লইব। হরিদ্বার আর কাশী বাছিয়া লইলাম। কাশীই বেশী পছন্দ হইল। যোগাড়-যন্ত্র, আয়োজন-প্রয়োজন সবই শেষ করিলাম। পাঁজি দেখিয়া যাত্রার দিনও ধার্য করিয়া ফেলিলাম। এমন সময় হঠাৎ—

হঠাৎ আমার মনে হইল—কিম্বা কে যেন মনের ভিতর হইতে মনকে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, 'তার ঐ শয়ন-ঘরখানাই যে তোর পরম তীর্থ; তা' ছেড়ে তুই কোথায়, কোন্ চুলোয় যাবি?'

ঠিকই ত! যে-ঘরের সুরবালা ছিল লক্ষ্মী, যেখানে দীর্ঘ বিশ বৎসর সে কাটাইয়া গিয়াছে, যেখানে সে কিশোরে আসিয়া, যৌবন-সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিল, তার সেই প্রিয়-নিকেতন আমার পরম তীর্থই ত বটে!

সুতরাং কাশী-হরিদ্বার বাতিল করিলাম। তার সেই শয়ন-কক্ষটিকে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া, সেইটাই সন্ন্যাসীর আশ্রমে পরিণত করিলাম। সুরবালার চিন্তায় বিভোর হইয়া দিনরাত সেই ঘরেই কাটাই।

কিন্তু শান্তি মিলিল না; বুকের জ্বালা নিবিল না। ঘরের আকাশ-বাতাস-আবেষ্টনী মনটাকে যেন আরও বিষাক্ত করিয়া তুলিল।

ভাবিলাম—নাঃ, এ চলিবে না। তাকে ভুলিতে হইবে। ভাল-বাসার ভিতর দিয়া তাকে ভুলিতে হইবে। ত্যাগের ভিতর দিয়া চূড়ান্ত প্রেমের ছাপ রাখিয়া যাইতে হইবে।

নীচের বৈঠকখানাঘরে একখানা দোকান খুলিলাম। চা'ল, ডাল, আটা, ময়দা, ঘি, মশলা-পাতির দোকান। ভাবিলাম—'এর ভেতর ডুবে থেকে তাকে ভুলবো। তার সেই মুখখানি—কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি—এই উপায়েই ভুলতে হ'বে।' —কিন্তু হইল না। সুরবালাকে ভুলিতে পারিলাম না। দোকানী সাজিয়া বসিলে কি হইবে? মন যে সন্ন্যাসী সাজিয়া তারই ধ্যানে মগ্ন!

খদ্দের চায় চিনি, আমি তাকে দিই করকচ; করকচ চাহিলে দিই কাবাবচিনি। ঘিয়ের পাত্রে খেঁসারী ডাল ভ'রে ওজন করি; পাঁচ ছটাক দিতে আড়াই সের ওজন চাপাই; পাঁচ আনা কেটে নিতে, এগারো আনা কেটে নি; সাত আনা দিতে গিয়ে, তেরো আনা দিয়ে ফেলি।

সুতরাং চলিল না; অন্ততঃ আমার দ্বারা চলিল না। লোক একজন রাখিয়া, তাহার দ্বারা দোকান চালাইতে হইবে। দিলাম কাগজে বিজ্ঞাপন। কিন্তু তার ফলে—সে আর কহতব্য নয়। উঃ! বাপ্ রে বাপ্! লেখক হইলে তিনি তার সঠিক এবং চমকপ্রদ বর্ণনা দিতে পারিতেন; আমি ঐ 'উঃ!' আর 'আঃ'! ছাড়া কি বা বলিব! 'স্বর্ণলতা'র নীলকমলকে যেমন একদিন কালীঘাটের ভিখারীর দল ঘেরাও করিয়া তার 'বাছা হনুমানে'র অবস্থা ঘটাইয়াছিল, আমার অবস্থা তাহা অপেক্ষাও ভয়ংকর এবং সাংঘাতিক। নীলকমল তবু প্রশস্ত রাজপথ এবং মুক্ত বায়ুর সুবিধাটুকু পাইয়াছিল; কিন্তু স্বরাজ আমলের বেকার কোম্পানীর মেম্বারগণ দলে দলে আসিয়া আমার সেই ক্ষুদ্র দোকানঘরের মধ্যে আমাকে দম বন্ধ করিয়া পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিল। সেই লোমহর্ষণ ঘটনার কথা লিখিতে গিয়া এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছে।

খাওয়া, থাকা এবং মাসে ৯ টাকা বেতনের কথা উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। ফলে, প্রায় ৯ শত কর্মপ্রার্থী আমার উপর চড়াও করিয়াছিল। কেহ ঢেঙ্গা, কেহ বেঁটে, কেহ বা মাপ-সই; কারও গায়ের রং কালো, কারো সাদা, কারো সাদায়-কালোয় মিশানো, কারও বা তামাটে। কারো গোঁফ আছে, কারো নাই, আবার কারো-বা 'ফ্লাই'-গোঁফ, কারো-বা 'লাইন'-গোঁফ—ঠোঁটের উপর দিয়া যেন একটি সরু রেখার টান। পনের দিন ধরিয়া তাহাদের উৎপাতে আমার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছিল, দোকানের জানালা-কপাট খসিয়া পড়িয়াছিল, আর জিনিস-পত্র, র‍্যাক্-সেল্‌ফ, একেবারে সব ওলোট্-পালট্! যুদ্ধের বোমা পড়িলে কি অবস্থা হয়, তা আমার জানা নাই, কিন্তু আমার উপর এই বেকার-বোমাবর্ষণের ধাক্কা বোধ হয় তার চেয়ে কিছু কম নয়। তবে একটা শুভ হইয়াছিল। ঐ পনের দিন যেমন আমাকে আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম ভুলিতে হইয়াছিল, তেমনি সুরবালার চিন্তাও একেবারে ভুলাইয়া দিয়াছিল। তা' ছাড়া, এদেরই ভিতর থেকে আমি গদাইকে পাইয়াছিলাম। 'পাইয়াছিলাম' কথাটা ঠিক হইল না। পূর্বেই বলিয়াছি, আমি ত সাহিত্যিক নই, সাহিত্যিক হইলে লিখিতাম—'আমার ভাগ্যে গদাই-লাভ হইয়াছিল।'

যাহা হইক, সে এক স্মরণীয় দিন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। বিশ-পঁচিশ জন কর্মপ্রার্থী আমাকে চারিদিক হইতে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। বাহিরের রোয়াকের উপর ঠেলা-ঠেলির সূত্রে দুই জনের মধ্যে ভীষণ মারামারি বাধিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে পথে লোক জমিয়া উঠিল। তৃষ্ণায় আমার গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, বুকের ভিতরটা আঁাই-ঢাঁই করিতেছিল। কিন্তু সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার কোন উপায় নাই। এ-হেন সময়ে, ভীড় ঠেলিয়া দেখা দিল—গদাই। গদাই যেন মন্ত্রবলে, চক্ষের নিমিষে, কাহাকেও ধম্‌কাইয়া, কাহাকেও বুঝাইয়া, কাহাকে-বা ধাক্কা দিয়া, সেই বিপুল আততায়ী দলকে হঠাইয়া দিল।

একটু চেতনা হইলে দেখিলাম, দোকানের মধ্যে বসিয়া আছি—আমি আর গদাই। সকাতরে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম,—একটু বসো ত ভাই, ভেতর থেকে একটু জল খেয়ে আসি। গদাই উঠিয়া-দাঁড়াইয়া কহিল,—আপনি বসুন, জল আমিই এনে দিচ্চি। গদাই বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দুই-তিনের মধ্যে, সামনের পান-ওলার দোকান থেকে বরফ-দেওয়া লিমনেড এক গ্লাস আনিয়া আমার হাতে দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমার নাম কি ?

গদাই বলিল,—আমার নাম, সার্, গদাধর।

খানিকক্ষণ গদাইয়ের সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিলাম, গদাই অতি চমৎকার ছোকরা। তাহাকেই আমি বাহাল করিলাম। গদাই কহিল,—আমাকে বাহাল কল্লেই হ'বে না। সমস্ত দিন ধরেই 'ক্যাণ্ডিডেটে'র দল এসে আপনাকে বিরক্ত করে মারবে; ঐ দেখুন, চার-পাঁচ জন আবার বোধ হয় আসচে !

ঠিকই বটে। গদাই দু'একটা কথা কহিয়া অতি সহজেই তাদের ভাগাইয়া দিল। অতঃপর গদাই একখণ্ড কাগজের উপর বড় বড় করিয়া লিখিল,—'এখানে লোকের আবশ্যক নাই; ৩২নং কাওরাবাড়ী লেনে অনুসন্ধান করুন।' কাগজখানি দোকানের দরজায় আঁটিয়া দিয়া, গদাই হাসিতে হাসিতে কহিল,—মরুক খুঁজে কাওরাবাড়ী লেন !

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কাওরাবাড়ী লেনটা কোথায় ?

গদাই কহিল,—তা কিন্তু জানি না। ঐ নামে যদি লেন থাকে, তাহ'লে কেওড়াতলার ঐ দিকেই হওয়া সম্ভব। —বলিয়াই হি-হি করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

॥ দুই ॥

মাস দুই পরের কথা।

দোকান ছাড়িয়া দিয়াছি। তবে গদাইকে ছাড়িতে পারি নাই; কখন পারিবও না। কেন পারিব না, সে-সব কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বাড়ীতে চারিটি প্রাণী থাকি ; গদাই, আমি, ফেলারাম চাকর, আর ঠাকুর। দিন কোন রকমে কাটিতে লাগিল। খাই-দাই, ঘুমাই, গদাইয়ের সঙ্গে গল্প-সল্প করি, আর সুরবালার কথা চিন্তা করি। কখন কখন কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়া বসি। যেখানে আমার যথা-সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া আসিয়াছি, সেই দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। কিন্তু শান্তি কিছুতেই পাই না, মনের আগুন কিছুতেই নিবিতে চায় না। শূন্য প্রাণ সর্বদাই হু-হু করিতে থাকে। গদাইকে বলিলাম,—গদাই, আমি কোলকাতায় আর কিছুতেই থাকবো না।

—কেন দাদা ?

আমাকে আর গদাই 'সার্' বলে না, দাদা বলিয়াই ডাকে। কহিলাম,—এখানে আর আমি থাকতে পাচ্চি না।

—কোথায় যাবেন ?

যেখানে হোক্। কোনও পাড়াগাঁয়। যেখানে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, ফাঁকা মাঠ, বন-জঙ্গল, পাখীর ডাক, শ্যামল প্রান্তর, ঘুঘুর করুণ—যেমন আমার এই কাতর অন্তরের সকরুণ—

—কিন্তু দাদা, ম্যালেরিয়ার যা' কাঁপুনি, কোন পাড়াগাঁয় গিয়ে কি তার ধাক্কা বরদাস্ত করতে পারবেন ?

—একেবারে অজ্-পাড়াগাঁয় যাব কেন ? না-সহর, না-পাড়াগাঁ এই রকম কোন একটা জায়গায়। সেখানে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে ডুবে থাকবো।

স্থির করিলাম, হয় নবদ্বীপ, নয় কাল্না, এই দু'জায়গার এক জায়গায় গিয়া বাস করিব। পরদিনই দ্বিপ্রহরে আহারান্তে নবদ্বীপের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে রহিল—গদাই।

নবদ্বীপে আমার এক জানা-লোকের বাড়ী ছিল ; সেইখানেই উঠিলাম ও রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন সকালে কিছু জলযোগান্তে সমস্ত সহরটা ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু—কিন্তু—! অর্থাৎ, দূরে থেকে মনের মধ্যে যে ধারণাটা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, সেটা ভাঙ্গিয়া

গেল। কেন ভাঙ্গিয়া গেল তাহা খুলিয়া বলিতে গেলে হয় ত তীর্থ-দেবতাদের আদালতে 'ডিফামেশন-কেসে'র আসামী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। তবে অপছন্দের একটা-কিছু কৈফিয়ৎ অবশ্য আবশ্যক। সে কৈফিয়ৎ আমার এই যে, বড্ডই ঘেঞ্জি, আর পথ-ঘাট বড় নোংরা; আর অনেকটা বালির চড়া ভেঙ্গে গিয়ে তবে গঙ্গায় নামতে পারা যায়।

নবদ্বীপ ছাড়িয়া কাল্‌নায় আসিলাম। অম্বিকা-কালনা। এখানে আমার শ্বশুরমশা'য়ের এক শিষ্যের বাড়ী আছে। শিষ্যের নাম—প্রহ্লাদ রক্ষিত। বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তাহার বাড়ীতেই উঠিলাম। গদাই কহিল,—ভালই হ'ল। শিষ্যবাড়ী; খাতির-যত্নের কসুর হবে না। ঠাকুর্দার আমলে আমাদের অনেক ঘর শিষ্য-সেবক ছিল।

লেখক নই বলিয়া, ঠিক মিল রাখিয়া সব কথা লিখিতে পারি নাই। একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। গদাইরা আমাদেরই ব্রাহ্মণ। উহারা গোস্বামী। শিষ্য-সেবক থাকিবার কথা বটে।

যাহা হউক, প্রহ্লাদ খুবই খাতির-যত্ন করিল। বৈঠকখানার বারান্দা গঙ্গাজলে ধুইয়া, সেইখানে আমাদের 'স্ব-পাকে'র ব্যবস্থা করিয়া দিল। ময়দা, ঘি, আলু, পটল, বেগুন, মশলা ইত্যাদি এবং তাহার সঙ্গে ঘরের-গাইয়ের সের-দুই দুধও আনিয়া হাজির করিল। প্রহ্লাদ হাত-যোড় করিয়া কহিল,—আর যা-কিছুর আবিশ্যিক হবে, হুকুম করবেন, দেব্‌তা!

রান্নার কাজে গদাই বিশেষ-রকম পটু। তাই ত ভাবি, কি শুভক্ষণেই যে আমি তাহাকে পাইয়াছিলাম! রাত এক প্রহরের মধ্যেই সে লুচি, বেগুনভাজা, আলু-পটল-কুমড়ার ছক্কা, আর পেঁপের চাট্‌নি বানাইয়া ফেলিল এবং আগে আমাকে খাওয়াইয়া দিল। খান-আষ্টেক লুচি আর আধ-সেরটাক দুধ খাইয়াই আমার উদরটি ঢক্কাকার ধারণ করিল। আমাকে পান দিয়া গদাই খাইতে বসিল। আমি পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার ভোজনের ঘটা

দেখিতে লাগিলাম। হাঁ, ব্রাহ্মণ-ভোজন বটে! অনুমান হয়—শ্রীমান্ গদাধর অন্যূন গণ্ডা-আষ্টেক লুচি অবলীলাক্রমে উদর-গহ্বরে প্রেরণ করতঃ জল-পানান্তে কেঁচে-গণ্ডুষ করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, আমি ভীত হইয়া কহিলাম,—গদাই, আর বেশী চালিয়ে কাজ নেই; শেষকালে কি······বুঝ্ছ না?

গদাই কহিল,—না দাদা, আর খাবো না—বলিয়া সে সেই দেড় সের দুধের বাটিটা তুলিয়া মুখে ধরিল।

—ভরা পেটে ঐ অতটা দুধ না-ই খেলে, গদাই!

—খাব না বলচেন?—কিন্তু তৎপূর্বেই ছটাক-খানেক ছাড়া সব দুধটাই তাহার উদরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখি, গদাধর নাই। এত রাত্রে সে কোথায় গেল? মিনিট পাঁচ-সাত কাটিয়া গেল, তবুও গদাই আসিল না। ঘরের এক কোণে মিটি-মিটি হেরিকেন্ জ্বলিতেছিল; দেখিলাম, দুয়ারের পাশে গাড়ুটিও নাই। উভয়ের ত নিকট সম্বন্ধ। বুঝিলাম। ভয়ানক ঘুম ধরিয়াছিল, আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। শেষরাত্রে কিসের একটা শব্দে আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এবারেও দেখি গাড়ু এবং গদাই, দুই-ই নাই! একটু ভীত হইয়া পড়িলাম, সঙ্গে-সঙ্গেই আমার ঘুম ছুটিয়া গেল। খানিক পরেই গদাই গাড়ু হাতে ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি ব্যাপার বল ত? কতবার······?

আমার কথার উত্তর দিবার অবকাশ গদাই পাইল না। পেট্‌টা টিপিয়া ধরিয়া এবং মুখখানাকে সিঁট্‌কাইয়া তাড়াতাড়ি সে গাড়ু লইয়া আবার অদৃশ্য হইল।

দেখিলাম, ব্যাপার তেমন সুবিধার নয়। মনে একটা আতঙ্ক হইল। প্রহ্লাদকে ডাকিয়া তুলিলাম। প্রহ্লাদ আবার পাড়ায় গিয়া এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে তুলিল। তার পর দু'ডোজ ওষুধ খাইবার পর গদাইকে আর গাড়ু লইতে হইল না এবং সারা রাত্রির অনিদ্রার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কাল্‌না আর ঘুরিয়া দেখাই হইল না। কোন রকমে সে দিনটা কাটাইয়া, পরদিন সকাল-সকাল স্ব-পাকে দু'টি মাছের ঝোল-ভাত খাইয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। গদাইকে কহিলাম,—কাল্‌নাটা আর দেখাই হ'লো না।

গদাই কহিল,—না দেখা হয়েচে ভালই হয়েচে দাদা; ভারি অপয়া স্থান!

গাড়ী ব্যাণ্ডেলে আসিলে বলিলাম,—গদাই, বদ্দিবাটীর কলা কিছু এখান থেকে নিতে হবে; তুমি একবার নেবে দেখ।

কাহাকেও খাইতে বলা শ্রুতিমধুর না হইলেও, এই মধুর ফলটি আমি একটু ভালবাসি। কথাটা কিন্তু মিথ্যা বলা হইল। অর্থাৎ একটু নয়, বিশেষ রকমই ভালবাসি। কদলী ভাল বাসিবার যোগ্য ফলও বটে। আয়ুর্বেদে পক্ক কদলীর গুণ—রুচিকর, পিত্তনাশক, বায়ু-প্রশমক, রস-রক্তবৃদ্ধিকারক এবং পুষ্টিজনক। কিন্তু পোড়া বা কাঁচা অবস্থায় ইহার গুণ যে বিপরীত, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কাঁঠালি কলা কিঞ্চিৎ লবণ-সংযোগে অমৃত তুল্য হয়। বালক-বালিকাদের দুধ-কলার মত পুষ্টিকর আহার নাই বলিলেই হয়। সর্পকেও এই দ্রব্য দ্বারা প্রথমটা পোষ মানানো যায়, যদিও পরে সে ছোবল মারিতে ছাড়ে না। যাই হোক, এত গুণ থাকাতেই কলার প্রতি আমার এত প্রীতি।

পরিপক্ক এবং পরিপুষ্ট একটি ছোট কাঁদিই কেনা হইল। লোলুপদৃষ্টি ও হস্তস্পর্শদ্বারা গদাই কদলীগুলির সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছিল। আমি তাহাকে কহিলাম,—ও-দিকে আর নজর দিও না। তুমি 'ভারবাহী মাত্র হ'য়ে থাক'; উদর-গহ্বরে ওর প্রয়োগের লোভ ত্যাগ কর।

গদাই মৃদু হাসিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

॥ তিন ॥

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম। ঘুম আসিল না, কেবল এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলাম। বুকে যাহার দিবারাত্র দাউ-দাউ চিতা জ্বলিতেছে, তাহার নিদ্রা আসিবে কেন! ও-ঘরে গদাইয়ের নাক ডাকিতেছিল। নীচের বারান্দায় ফেলা আর বামুনঠাকুরের মধ্যে কিসের একটা ভয়ানক তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। দেওয়ালের ঘড়িটা ঠং করিয়া বাজিয়া উঠিল; দেখিলাম বেলা আড়াইটা। হায় রে! সময় আর কাটে না! আগে এই সময় কোথা দিয়ে যে কাটিত, তা জানিতেই পারিতাম না। মনে ভাবিতাম, অনন্তকাল ধরিয়া সুরবালার সহিত গল্প করিলেও, তাহার শেষ হইবে না।

সহসা কাণে একটা সুন্দর সুর আসিয়া বাজিল। দক্ষিণের বাড়ীতে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিতেছিল—'আজি তোরই তরে যোগীর বেশে!' কাণে এবং প্রাণে যেন মধু ঢালিয়া দিল। উৎকর্ণ হইয়া একমনে শুনিতে লাগিলাম; রেকর্ড গাহিয়া চলিল—

আজি—তোরই তরে যোগীর বেশে,
ঘুরিয়া ফিরি' দেশে দেশে!

ঠিকই রে ঠিকই! যোগীর বেশে দেশে-দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি!—মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। উঠিলাম। কেওড়াতলার শ্মশান অভিমুখে চলিলাম।

কতক্ষণ যে শ্মশানের চাতালে বসিয়াছিলাম, জানি না; কাহার আহ্বানে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল,—মশাই গো?

চাহিয়া দেখি, একটি সৌখীন বুড়াগোছের লোক সম্মুখে দাঁড়াইয়া। কাঁচা-পাকা চুলে পরিপাটি টেরি-কাটা; মট্‌কার পাঞ্জাবীর ওপর রেশমী চাদর কাঁধে ঝুলিতেছে; দুই হাতের আঙ্গুলে গোটা চার-পাঁচ ধ্যাবড়া-গোছের আংটি ম্যাড়-ম্যাড় করিতেছে; সেকেলে পছন্দের, শিংয়ের হাতল-ওলা একগাছা

ছড়ি তাহার হাতে। লোকটাকে দেখেই কেমন একটা অপছন্দ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিছু বলছেন কি ?

লোকটি আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—বলচি বই কি ; বলবার কথা র'য়েছে কি না! নিজেরই বুকের নিধি বোধ হয় ?

লোকটা পাশে আসিয়া বসিল। তাহার কথার মর্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে কহিল,—বোধ হয় বুঝতে পারলেন না ? বলচি যে, নিজের স্ত্রীটিকেই বোধ হয় এখানে বিসর্জন দিয়েছেন ? কদ্দিন হ'ল ? কই, এর আগে কোন দিন ত…? আমার ত এখানে হাজ্‌রে দেওয়ার কামাই নেই।

কহিলাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই স্ত্রী…

মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেচি ; আমার কাজই হ'ল—এই। তা যা'ক্‌ ; মশায় আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ।

ভালই হ'য়েচে। ব্রাহ্মণেরই ঘরের বেশ ডাগোর-ডোগর, দেখতেও পরিপাটি, আমার সন্ধানে রয়েছে ; কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। দাউ-দাউ মনের আগুন জ্বলছে, বুঝতে পেরেচি ; গঙ্গাজল এনে দিচ্চি, নিবিয়ে ফেলুন।—লোকটা পকেট হইতে বিঁড়ি বাহির করিয়া ধরাইল। ধরাইয়া আবার বলিতে লাগিল —দেখুন, এই আপনাদের মত বুক-পোড়াদের জন্যে প্রায় রোজই একবার কোরে এখানটা ঘুরে যাই। রাজ্যের সিংহাসন রাজা-ছাড়া খালি রাখা চলে, কিন্তু মনের সিংহাসন রাণী ছাড়া একদিনও চলে না। আপনার ঠিকানাটা কি ?

বুঝিলাম—লোকটা ঘটক। কিন্তু সাংঘাতিক ঘটক ; শ্মশান ঘেঁটেও মক্কেল পাকড়ায়! সদ্য-বিপত্নীকদের টাট্‌কা ব্যথার সুযোগ নিয়ে, এরা সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে, আর কন্যাদায়গ্রস্তদের দায়োদ্ধার করিয়া একটা মোটা টাকা

পকেট-জাত করে। ঘটকালীতে ইনি দেখিলাম রেকর্ড ভাঙ্গিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনার নাম ?

—সত্যেশ ঘটক। দেশ-জোড়া নাম! বাংলার যত বড়-বড় ঘর, জমিদার, রাজা-রাজড়া—সব আমার একচেটে অধিকার। আপনাদের কোন্ গোত্র ?

—শাণ্ডিল্য।—লোকটার প্রতি অভক্তির আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

—আপনার ঠিকানাটা ?

মনে মনে যথেষ্টই বিরক্ত হইতেছিলাম। গদাইয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। কহিলাম,—৩২নং কাওরাবাড়ী লেন।

লোকটা পকেট হইতে নোট-বই বাহির করিতে করিতে কহিল,—কিছু ভাববেন না, সব ঠিক ক'রে দোবো'খন। আচ্ছা, কাওরাবাড়ী লেনটা নতুন হ'য়েচে বোধ হচ্চে। এটা কোন্ দিকে ?

আগেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এক্ষণে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিলাম,—নিমতলারই ঐ দিকে।

—নিমতলায়ও আমার হামেসাই যাওয়া আছে।

মনে মনে বলিলাম, কবে মৌরুসি পাট্টা নিয়ে সেখানে তুমি কায়েমী আড্ডা গাড়বে! যাই হোক, এত দুঃখের মধ্যেও সত্যেশ ঘটকের কাণ্ড দেখিয়া আমার হাসি আসিল। ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে অগ্রসর হইলাম।

বাড়ী ফিরিয়া দেখি, বাড়ীর বাতাস খুব সর-গরম। সন্ধ্যার আগেই উনানে আগুন পড়িয়া গিয়াছে। এ বেলা নতুন সংস্করণ আর এক দফা তরি-তরকারির বাজার আসিয়াছে; তার সঙ্গে একটা মস্ত ইলিশ মাছ, এক হাঁড়ি দই, ময়দা, ঘি ইত্যাদি। ফেলা রান্নাঘরে বাট্না বাটিতেছে; বামুন-ঠাকুর তরকারী কুটিতেছে; আর গদাই ষ্টোভ্ ধরাইয়া চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি ব্যাপার, গদাই ?

—বাবা এসেছেন! ওপরে যান না।

উপরে আসিয়া দেখিলাম, বারান্দার আরাম-কেদারায় গা ঢালিয়া একটি ৬০।৬২ বছরের বৃদ্ধ আরামে গড়গড়া টানিতেছেন; আর তাঁরই সামনে একটি ১২।১৩ বছরের ছেলে বড় এক ঠোঙ্গা খাবার লইয়া একাগ্রমনে সেগুলির সদ্ব্যবহারে নিযুক্ত। বুঝিলাম—ঐটিই বাবা; কিন্তু ছেলেটি? গদাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম। গদাই কহিল,—আমার ভাই হলধর!—একটু থামিয়া গদাই কহিল,—দেখলুম, আপনি ভুলে বাক্স খুলে রেখে গেছেন। কিছু মনে করবেন না দাদা; পাঁচটা টাকা নিয়ে বাজার-হাট ক'রে এনেচি। আপনার জন্যে পাকা এক ছড়া 'মর্তমান' যা এনেছি, এক-একটা যেন বোম্বাই মূলো! দেখবেন খেয়ে কি ফাষ্ট্ ক্লাস······

এত দুঃখের মধ্যেও আর একদফা হাসি ঠেলিয়া আসিল।

॥ চার ॥

দিন-দুই পরে বজবজ থেকে আমার এক বাল্যবন্ধু দেখা করিতে আসিল। ছেলেবেলা একসঙ্গে গোপাল পণ্ডিতের পাঠশালায়, তার পরে বাঙ্গালা স্কুলে পড়িতাম। তখন কালিদাসের বাবা আলিপুর-জজকোর্টে পেস্কারী না ঐরূপ কি-একটা কাজ করিতেন। এখন কালিদাস দেশেই থাকে।

আমার স্ত্রী-বিয়োগের কথা শুনিয়া কালিদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সারা সকাল বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত অনেক কথাই হইল। যা-কিছু মনের ইচ্ছা, সবই কলিদাসের কাছে ব্যক্ত করিলাম।

নবদ্বীপ কাল্‌নার কথাও বলিলাম। কালিদাস কহিল,—দিন-কতক আমার ওখানে থাকবে চল। যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে গঙ্গার ধারে আমি বাড়ী যোগাড় করে দেবো; দিব্যি থাকবে।

ভাবিলাম, মন্দ হবে না। বাল্য-বন্ধুর সাহচর্য পাবো ; তার ওপর গঙ্গার শোভা ; নির্জন-নিরিবিলি জায়গা, কোনও হট্টগোল নেই। দিন চার-পাঁচের মধ্যেই গদাইকে লইয়া বজবজে কালিদাসের বাড়ী চলিয়া গেলাম। মনে মনে সেই গানখানি আওড়াইলাম—

আজ—তোরই তরে যোগীর বেশে
ঘুরিয়া ফিরি দেশে দেশে !

বজবজ জায়গাটি আমার ভালই লাগিল। একটি-একটি করিয়া সাতটি দিন ওখানে বেশ শান্তিতেই কাটিল। গদাই কহিল, দাদা, এইখানেই থেকে যান ; ফার্ষ্ট্‌ ক্লাস্‌ জায়গা ! ভাবিলাম, তাই থাকিব। কলিকাতার বাড়ীটা ভাড়া দিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া, পূজার পর এইখানেই চলিয়া আসিব। কলিদাস কহিল,—তাই এসো ; তবে এ-ক্ষেপে আর পাঁচ-সাত দিন এখানে থেকে যাও। বাড়ীতে ত গদাইয়ের বাবা রয়েচেন, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আর ক'টা দিন এখানে কাটিয়ে যাও। গদাইও তাই বলিল। দেখিলাম, জায়গাটা আমার অপেক্ষা গদাধরেরই বেশী পছন্দ হইয়াছে।

গদাই খায়-দায় আর সারাদিন বাহিরে-বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। গঙ্গার ইলিশ আর বাতাস খাইয়া এই কয়দিনের ভিতরেই তাহার দেহে একটু চাকচিক্য প্রকাশ পাইল। কিন্তু ইহার মধ্যে যে গূঢ় কারণ ছিল, তাহা পরে জানিতে পারিলাম।

কালিদাস কহিল,—তোমার গদাই মেয়ে-স্কুলের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় কেন বল ত ? একটা খুব অল্প বয়সের মেয়ে ওখানে এসেছে মিষ্ট্রেস্‌ হ'য়ে। অন্যান্য মিষ্ট্রেস্‌রা তার ওপর খুব বিরক্ত। তার হাব-ভাব না কি ভাল নয়।

বারান্দার দড়ির উপর গদাই তাহার হাফ-সার্টটা ঝুলাইয়া রাখিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল। বুকপকেটটা নীচের দিকে ঝুলিতেছিল। দেখিলাম, তাহা হইতে ভাঁজ করা কি দু'-একখানা কাগজ আর্দ্ধেকটা বাহির হইয়া পড়-পড় অবস্থায় ঝুলিতেছে।

বাহির করিয়া, ভাঁজ খুলিয়া পড়িলাম। একখানিতে মেয়ে-হাতে লেখা ছোট একটা কবিতা। তাহাতে লেখা আছে—

তোমারে হেরিয়া হে প্রাণের বঁধু,
পরাণ পাগল মোর।
তব পথ চাহি বসে আছি হেথা
ওগো মোর মন-চোর॥
—ইতি।

অপরখানিতে লেখা আছে—

প্রাণের ব—

মন চুরি আমি কোরিনি, তুমিই কোরেচো। আমি বিদেশী; দু'এক-দিনের জোন্যে এসেছি, আবার দু-একদিন পরেই হয় ত চোলে যাবো। সুতরাং এ অবস্থায় আমার মনপ্রাণ হরণ করা কি তোমার ভালো হোয়েচে? আজ বিকেলে গঙ্গার ধারে দর্শনের সৌভাগ্য পাবো কি?—ইতি।

এটা গদাইএর হাতের লেখা। প্রথমখানির বোধ হয় প্রত্যুত্তর। 'প্রাণের ব'-কে এখনো পাঠানো হয় নাই। হয় ত স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া 'মন-প্রাণ-হরণকারিণী'কে পাঠানোর ব্যবস্থা হইবে।

কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—নতুন সেই মিষ্ট্রেস্‌টির নাম কি বলতে পার?

কালিদাস কহিল,—দাঁড়াও, আমার মেজ মেয়ে দুর্গাদের ক্লাসে পড়ায়; তার কাছ থেকে জেনে এসে বলচি।

মিনিট তিন-চার পরে কালিদাস ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—বকুলমালা।

আর বজবজে থাকা শ্রেয়ঃ মনে করিলাম না। সেই দিনই আহারাদির পর দু'টা-ছাপ্পানোর গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিলাম।

ফিরিলাম বটে, কিন্তু গদাইয়ের জন্য একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। গদাইকে রাখাও যায় না, ছাড়াও যায় না। রাখা বরং যাইলেও যাইতে পারে; একটু সতর্কতার দরকার। কিন্তু ছাড়া কিছুতেই যায় না। সুরবালার মৃত্যুর পর আমার বাড়ী-ঘরের চেহারা কি রকম ছন্ন-ছাড়া হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর বলিবার

নয়! গদাই আসিয়া তবে ঘর-দোরের পূর্ব্ব-শ্রী ফিরাইয়া আনে। তা ছাড়া, ফেলা আর বামুনঠাকুরে যোগাযোগ করিয়া চার হাতে চুরি চালাইয়াছিল, গদাই আসিয়া তবে সে সব বন্ধ করে। তার পর সকলের চেয়ে যেটা বড়—আমার দিকে দেখিবার কেহই ছিল না, গদাই আসিয়া সে অভাব পূরণ করিয়াছে। গদাইয়ের ভিতর এমন একটা শক্তি আছে, যা প্রায় আর কাহারো দেখা যায় না। তাহার গুণ অনেক। তবে, পয়সা-কড়ি বা অন্য বিষয়ে হয় ত······ তা' পয়সা-কড়ির উপর আর আমার মায়া নাই। সুরবালা চলিয়া গিয়াছে, কাহার জন্য আর পয়সা-কড়ি! এখন নির্জনে, নিঝঞ্ঝাটে দু-বেলা দু-মুঠো খাইয়া, সুরবালার সহিত মিলিত হইবার অপেক্ষায় দিন কাটাইতে পারিলেই যথেষ্ট। আর যাবও না কোথাও। কয় জায়গায় ত ঘুরিয়া আসিলাম, ঠিক মনের মত জায়গা ত পাইলাম না। তবে একবার জয়নগর-মজিলপুরটা দেখিয়া আসিতে হইবে। আমার মামাতো ভাইয়ের সম্বন্ধী ভূতনাথ অনেক দিন থেকেই বলিতেছে। ওখানটা একবার গিয়া দেখিয়া আসিব। তবে, গদাইকে আর সঙ্গে লইব না। একলাই যাইব।

পরের হপ্তায় এক দিন জয়নগরের টিকিট কিনিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিলাম। জয়নগরে পৌছিলাম যখন—তখন বেলা অপরাহ্ণ।

পরদিন প্রাতে গ্রামটা একবার ঘুরিয়া আসিলাম। ভূতনাথ কহিল,—দাদা, এখানে সিনেমা আছে, সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখে আসা যাবে।

কহিলাম,—ও-সবে আর রুচি নেই ভাই! ছিল বটে একদিন, যখন কোন হপ্তাই সিনেমা-যাওয়া বাদ পড়ত না। কিন্তু যার জন্যে যাওয়া, সেই যখন চলে গেছে, তখন আর······

বিকালবেলার দিকে আর একদফা গ্রামখানি ঘুরিয়া আসিলাম। ভূতনাথ কহিল,—কেমন গ্রাম বলুন? স্কুল দেখলেন ত? দুটো হাইস্কুল, বাংলা-স্কুল একটা, মেয়েস্কুল দু'টো, লাইব্রেরী, ব্যাঙ্ক, মিউনি—

—আচ্ছা ভূতনাথ, দেখলুম ভয়ানক গো-সাপ ঘুরচে চারিদিকে ; এখানে কি বড্ডই সাপের ভয় ?

—সাপ ? তা-না—হাঁ, ছিল বটে পূর্বে ; কিন্তু ঐ গো-সাপ থাকায় সাপ আর বড় বেশী নেই।

—কিন্তু সাপ আছে বলেই ত গো-সাপ আছে। সাপ না থাকলে ওরাও থাকতো না।

ভূতনাথ চুপ করিয়া রহিল। আমিও ভূতনাথকে আর কিছু বলিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, 'এখানে আমার চলবে না। যার চলে, সব জায়গাতেই তার চলে ; যার চলে না, তার কোন জায়গাতেই চলে না। আমার মনে হয়, যমের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও আমার চলবে না।'

সন্ধ্যার দিকে শরীরটা একটু খারাপ লাগিল। রাত্রে গা-হাত-পায় বেশ একটু বেদনা বোধ হইল। জ্বর-জ্বর ভাব। পরদিন সকালে এক কাপ চা খাইয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। যখন বাড়ী পোঁছিলাম, তখন আমার বেশ জ্বর। কোন রকমে উপরে উঠিয়া গিয়া শয্যায় ঢলিয়া পাড়িলাম।

॥ পাঁচ ॥

খুব জ্বর। কয় দিন ধরিয়া যে বেঘোরে ছিলাম. তা জানি না। এইটুকু জানি যে গদাই ডাক্তার আনিয়া ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিয়াছে। জ্বর যখন কমিল, তখন দুর্বলতা আসিয়া আশ্রয় করিল। গদাই কহিল,—কাল থেকে আর জ্বর আসেনি দাদা !

কয় দিনের প্রবল জ্বরে দেহ-মন অবসন্ন। খালিই ঘুম পায়, কিন্তু ঘুমও ভাল হয় না। তন্দ্রার মত যেন কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব ! যেটুকু ঘুম হয়—কেবলি স্বপ্ন দেখি।—যেন ছোট ছেলে আমি, কোথাকার কাদের বহু দিনের পুরাণো বাড়ীর উঠানে ছুটিয়া ছুটিয়া 'লুকোচুরি' খেলিতেছি ; যেন এক দল ছেলে মিলিয়া বই-সেলেট বগলে স্কুলে যাইতেছি ; যেন বর সাজিয়া, ফুলের মালা

গলায় দিয়া বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে কোথায় বিয়ে করিতে যাইতেছি। এই রকম যত সব বাজে স্বপ্ন।

সে দিনও অপরাহ্ণের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়া এই রকম স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যেন আমার অসুখ; সুরবালা পাশে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। সুরবালা এক বার গায়ে কপালে হাত দিয়া বলিল—জ্বর বোধ হয় কমে আসচে। তার হাতখানা আমি আমার তপ্ত বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম,—এখন ক'টা বেজেচে বল্‌তে পার?

—ছটা বেজে গেচে, সন্ধ্যা হ'য়েচে।

সঙ্গে-সঙ্গেই তন্দ্রা, স্বপ্ন, সব ছুটিয়া গেল। চোখ চাহিয়া দেখি, মাথার পাশে বসিয়া.........!

সেই মুহূর্তে গদাই ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—এ কে গদাই?

মৃদু হাসিয়া গদাই কহিল,—শান্তি। আমার ছোট বোন।

আবার চোখ বুজাইলাম। শান্তি? ছোট বোন? কি সুন্দর! যেন বর্ষার নদী, অথচ কূল ছাপায় নাই। মনের মধ্যে যেন এক ঝলক বসন্তের বাতাস বহিয়া গেল। তেমনি ভাবে চোখ বুজাইয়া পড়িয়া রহিলাম। শান্তি ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

পথ্য পাইলাম। তাহার পর কয়েক দিন কাটিয়া গেল। গদাই কহিল,—আপনি সেরে উঠেছেন, দাদা, এইবার মা আর শান্তিকে বাড়ী পাঠিয়ে দি; কি বলেন? বাবা ত বুড়ো মানুষ, এদিকে আমি একলা, তাই আপনার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে ওদের এনে ফেলেছিলুম। বড় বোনটির ত বিয়ে হ'য়ে গেছে; সে শ্বশুর-বাড়ী। বাড়ীতে ত আর কেউই নেই; তা এখন আপনার মত হ'লে—। শান্তিকে আবার এক জায়গা থেকে দেখতে আসবার কথা আছে। ১৯।২০ বছর বয়স হ'ল, কিন্তু এখনো ত—

একটুখানি নীরব থাকিবার পর কহিলাম,—তোমায় ত আমি পর বলে মনে করি না গদাই। সন্ন্যাসী হ'তেই ত বসেছিলুম;

তোমার কথা শুনেই···তা ওরা এখন কিছু দিন থাকুক না ; পূজোটা এখানে কাটিয়ে, তার পর গেলেই হবে।

—তা হ'লে পূজোর পর আপনি দাদা বজবজেই কি—

—না গদাই, কোথাও আর যাবো না ; এইখানেই থাকবো। যেখানেই যাই না কেন, মন ত আমার সঙ্গেই থাকবে। সুতরাং—

বুঝিলাম, গদাই যেন মনে-মনে বেশ প্রফুল্ল হইল।

পূজা আসিয়া পড়িল। আকাশে-বাতাসে শরতের অপূর্ব শ্রী ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দক্ষিণের জানালার ধারে আরাম-কেদারায় বসিয়া, মেঘশূন্য নীলাকাশের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছি।

সে-দিনের মত সেই দক্ষিণের বাড়ী হইতে আজও গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়া উঠিল—

পূজার থালী রেখেছি সাজায়ে,
তুলিয়া কুসুমরাশি।
হে মোর দেবতা ! চাহ তুমি ফিরে,
লহ মোর পূজা আসি।

এক-মনে গানখানা শুনিতে লাগিলাম। অপূর্ব এক মধুর স্পর্শে আমার সমস্ত মন যেন দুলিয়া উঠিল। গানের ভিতরকার অদৃশ্য এক যাত্নকরী যেন আমাকে কোন্ দূর-দূরান্তরে লইয়া গেল। গান থামিয়া গেল ; তার সুরের ঢেউ আমার মনের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শান্তি পান সাজিয়া, পানের ডিবাটা আমার হাতে দিয়া কহিল, —একটু বেড়িয়ে আসুন না ; সারাদিন ঘরে ব'সে—

—থাকতেই আমার ভাল লাগে, তা'তেই শান্তি পাই। তুমি তোমার সেই 'কেশবতী'র গল্পটা শেষ করলে না ?

একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিয়া শান্তি বলিল—আজ ক'রবো। তারপর সে ধীর পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

একটু বেড়াইয়া আসিব কি না ভাবিতে লাগিলাম। ভাল লাগে না। আগেও লাগিত না, এখনও লাগে না। মন যে কি চায়,

তা'ও বুঝিতে পারি না। মন লাগিয়ে কোন কাজই করিতে পারি না। আগে সুরবালার কথা ভাবিতে ভাল লাগিত, এখন তা'ও লাগে না। অসুখ থেকে সারিয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু সে অসুখ সারিয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই মনের মধ্যে, কোথাও কোন শিরা-স্নায়ুতে কি-যেন-এক অস্বস্তির বাঁধন বাঁধিয়া দিয়া গেল! তা' থেকে আর মুক্তি পাইতেছি না।

গদাই বলিল,—দাদা, আপনার শরীর ত সারচে না; বরং আগের চেয়ে যেন দিন-দিন আরো খারাপ হ'য়ে যাচ্চে।

—সত্যিই যাচ্চে, গদাই! কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—একটা কথা তোমাকে ব'লবো-ব'লবো ক'রে বলতে পাচ্চি না।

কিছুক্ষণের জন্য দু'জনেই নীরব রহিলাম।

তার পর শুভক্ষণে উভয়েই উভয়ের কথা বলিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে যে কি কথা, তা আমি কিছুতেই এখানে প্রকাশ করিতে পারিব না। কিন্তু সেই থেকে শান্তি আমার কাছে আসা একরকম বন্ধই করিল। অল্প কিছুদিনের জন্য পাড়ার মধ্যে উহাদের একটা স্বতন্ত্র বাসা ঠিক করিয়া দিলাম।

পূজা কাটিয়া গেল। কার্তিক কাটিবার অপেক্ষায় অধীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন গণিতে লাগিলাম।

কার্তিক কাটিল। আরও কয়টা দিন কাটিল, ১৪ই অগ্রাণের আর পাঁচটি দিন বাকী। একটি একটি করিয়া সে পাঁচটা দিনও কাটিয়া গেল।

আজ বহু কাল পরে আমার বাড়ী আনন্দ-কোলাহলে মুখর। আজ খালি-খালি আমার মনে হইতেছিল, যে যায়, সে একেবারেই যায়। তার ছায়ার পিছনে বুকের ব্যথা আর চোখের জল নিয়ে ছুটাছুটি করা—সে-বোকামির আর সীমা নেই!

শুভদিন, শুভলগ্নে শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। শাঁখের শব্দ ও উলুধ্বনিতে সারা-বাড়ী প্রতিধ্বনিত। এমন সময় বাহিরের একটা লোক ছাঁদ্‌নাতলায় আসিয়া উঁকি দিতে লাগিল। মুখ দেখিয়া বোধ

হইল, যেন সেই সত্যেশ ঘটক। ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম,—সেই ত!

সে-ও আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—সেই ত! তারপর মুখখানার একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া সে অদৃশ্য হইল। রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। আমার 'সেই ত'র মানে খুব সাধারণ আর সোজা; কিন্তু ঐ পাষণ্ডের 'সেই ত'র মধ্যে একটা তীব্র বিদ্রূপের কটাক্ষ নিহিত ছিল। আমার বোধ হয়, বিখ্যাত মেয়েলী প্রবাদ-বচনটা উহার ঐ 'সেই ত'র ভিতর তীক্ষ্ণভাবে উহ্য ছিল: অর্থাৎ—

সেই ত' মল খসালি,
তবে কেন লোক হাসালি?

কিন্তু লোকটাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

অতঃপর……

দ্বিতীয় সংস্করণ

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

শোভাবাজার বসাক স্ট্রীটের উপর যে-ঘরখানার দেওয়ালের গায় 'কামরূপ জ্যোতিষালয়'-লেখা প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ডখানা ঝুলিতেছিল, সেই ঘরের ভিতর, একদিন সকালে দুইটি ভদ্রলোকের মধ্যে বিষম বচসা চলিতেছিল। একজন—স্বয়ং জ্যোতিষী, পণ্ডিত নবজলধর সাংখ্যতীর্থ, বেদান্তরত্ন; অপরজন—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার, পিতা ৺রমাপতি সরকার, বয়স আটত্রিশ, পেশা—জমি জায়গার দালালী, নিবাস ৩৬নং হরমোহন লেন, বাগবাজার।

নবজলধর কহিল,—গণনায় উল্টো ফল হয়েচে, তার জন্য ত আমি দায়ী হতে পারি না। গণনা করেছিলেন আমার বাবা, তিনি এখন জীবিত ন'ন;—সুতরাং তাঁর গণনার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, আমাকে না হুমকি দিয়ে, আপনার এখন যাওয়া উচিৎ......

—কোথায় যাওয়া উচিৎ ?

—যমের বাড়ী।—বলিয়া বিরক্তির সহিত নবজলধর সেদিনকার খবরের কাগজখানা টানিয়া লইল।

পশুপতি একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—আপনি যে দেখচি যা' তা' বলতে আরম্ভ করলেন। আপনি একটু হুঁস্ করে এবং ভদ্রভাবে কথা বলবেন।

—যথেষ্ট ভদ্রভাবেই এতক্ষণ কথা ক'য়েচি, কিন্তু ক্রমাগত আপনার রুক্ষ মেজাজ দেখে আর অভদ্র কথা শুনে, ভদ্রতাকে আর রাখতে পারা যাচ্ছে না। রাগটাকে একটু কম করে ফেলুন।

পশুপতি ভিতর-ভিতর রাগে ফুলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ভদ্র বা অভদ্র—কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পশুপতির বয়স বর্তমানে আটত্রিশ। বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বিবাহ করে নাই এবং স্থির করিয়াছিল, ভবিষ্যতেও করিবে না; কিন্তু আজ ছয় বৎসর হইল, যাহা সে ইতঃপূর্বে স্থির করিয়াছিল,

তাহার বিরুদ্ধে অস্থির হইয়া পড়িল এবং মনে মনে দ্বিতীয় বারের জন্য স্থির করিল যে বিবাহ করিবে বটে, তবে যেখানে সেখানে যা'-তা' মেয়েকে বিবাহ করা হইবে না। ভাল জ্যোতিষীর কাছে ছু'জনের ঠিকুজী দেখাইয়া এবং মিলাইয়া যেখানে 'রাজযোটক' হইবে,—সেইখানেই শুভ কার্য সম্পন্ন করিবে ; অন্যত্র নহে।

তারপর শ্রীমতী পারুলবালার সহিত তাহার ঠিকুজীর বিচারে 'রাজযোটক' যোগ দৃষ্ট হইল এবং উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। ছয় বৎসর পূর্বে যিনি এই 'যোটক-বিচার' করিয়া দিয়াছিলেন তিনি নবজলধরের পিতা ; বছর ছুই-তিন হইল স্বর্গগত হইয়াছেন। আজ ছয় বৎসর পরে, তাঁহার গণনা যে ভুল এবং বিপরীত ফলদায়ক হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই জানাইবার জন্য, অতিমাত্রায় বিরক্ত-চিত্তে দ্বিতীয়বার পশুপতি 'কামরূপ জ্যোতিষালয়ে' আসিয়াছিল।

নবজলধর কহিল—আপনার ঠিকুজীখানা নিশ্চয়ই ঠিক ছিল না ; হয় ত জন্ম-লগ্নটা লেখার মধ্যে ভুল ছিল ; নচেৎ আমার বাবার গণনায় কখনো ভুল হয় না। আপনি যে-রকম মার-মার কোরে এলেন,·········

চোখ ছুইটা ঘুরাইয়া পশুপতি কহিল—মার-মার করে আসবার অপরাধটা কি বলুন ! চারটি কর্-করে টাকা নিয়ে গণনা করে বল্লেন যে—'রাজযোটক'! তা এমনি চমৎকার রাজযোটক যে, বিয়ে হয়েছে আজ ছ'বছর, আর এই ছ'বছর ধরেই জ্বলে-পুড়ে মরতে হচ্ছে !

বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়া নবজলধর কহিল—দেখুন, তা-ই যদি হয়, তার জন্য দায়ী ত আর আমি নই। আপনার ব্যাপার দেখে, কথামালার সেই ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের গল্প মনে পড়চে ! সকাল-বেলায় আপনি এখানে চেঁচামেচি করবেন না, বলে দিচ্চি ; আপনার কি মাথা খারাপ নাকি ?

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া পশুপতি একপ্রকার অদ্ভুত কণ্ঠে বলিল—মাথা খারাপ আমার নয়, মাথা খারাপ—আপনার।

ক্রমে ব্যাপারটা বেশ পাকিয়া উঠিল। পশুপতি ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। নবজলধর তাহাকে ঠেলিয়া ঘর হইতে রাস্তায় বাহির করিয়া দিল। ইতিমধ্যেই দু'-একজন লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে রীতিমত ভীড় জমিয়া গেল।

সেই ভীড়ের মধ্য হইতে একটি সদাশয় প্রশান্ত-বদন ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া পশুপতির হাত ধরিয়া সরাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ বদন-মণ্ডল সুদীর্ঘ কেশরাজি এবং শ্মশ্রুতে সমাচ্ছন্ন। চক্ষুর্দ্বয় আয়ত এবং উজ্জ্বল। প্রীতিপূর্ণ মধুর কণ্ঠে তিনি পশুপতিকে বললেন—মানুষের ওপর মানুষের রাগ করতে আছে কি? আপনি আমার সঙ্গে আসুন;—এ স্থানে আর থাকবেন না।

পশুপতি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার সঙ্গে চলিল। যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নাম?

—নাম একটা চিরকালের আছে বটে, আপনি আমায় 'সত্যসাধু' বলে ডাকবেন, সকলে ওই নামেই ডাকে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বাগবাজার; ৩নং হরমোহন লেন।

কিন্তু নম্বরের প্লেটখানা ভালো করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ৩-এর পর একটা অস্পষ্ট ৬ আছে, যাহা হঠাৎ নজরে পড়ে না। সুতরাং উহা ৩৬নং হরমোহন লেন; সুতরাং উহা পশুপতিরই বাড়ী।

বাড়ীখানা খুবই ছোট। ভিতরে মাত্র দেড়খানা শয়নঘর; অর্থাৎ একখানা একটু বড়, আর একখানা একেবারেই ছোট। একরত্তি একটু ফালি-বোয়াক, তারই একপ্রান্তে একটা দেয়াল তুলিয়া রান্না ঘর করা হইয়াছে। ওদিকে সঙ্কীর্ণ একটুখানি জায়গায় পাইখানা ও জলের কল-চৌবাচ্চা। কিন্তু পারিবারিক আবরুকে বজায় রাখিতে, পথের উপর একটা ছোট বৈঠকখানা ঘরও ছিল এবং তাহাতে ছোট একখানা তক্তাপোষ পাতা ছিল।

সেই তক্তাপোষের উপর মুখো-মুখি বসিয়া পশুপাতি ও সত্যসাধু।

সত্যসাধুর ডান-হাতে পেনসিল, বাঁ-হাতে একখণ্ড কাগজ, আর সম্মুখে একখানা পাতা-খোলা পঞ্জিকা। তিনি বার-বার পঞ্জিকা দেখিয়া এবং কাগজখানার উপর পেনসিল দিয়া আঁক-জোক এবং হিসাব করিয়া কহিলেন—বড়ই খারাপ যোগাযোগ! অশান্তি ত হ'বারই কথা। তবে, একটা সুবিধে এই যে, শনি আর মঙ্গলকে ঠাণ্ডা করা যেতে পারবে।

পশুপতির মুখখানা বিমর্ষ হইয়া গেল; কহিল—যোগাযোগ খুবই খারাপ তা হলে?

কাগজখানার উপর দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে সত্যসাধু কহিলেন—হ্যাঁ খুবই খারাপ; হু'জনেরই 'প'-বর্গ হয়ে ভারি খারাপ হয়েচে!

—কিসের প-বর্গ বলচেন?

—এই—ক-চ-ট-ত-প। মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্ পরোপকৃতয়ে ময়া।'

পশুপতি হাঁ করিয়া সত্যসাধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পেশাদার গণৎকারদের কাছে আর যাবেন না। ওরা এসব বিষয়ে কি-ইবা জানবে, আর কি-ইবা বলবে। এ সব দৈব ব্যাপার; দেবতার সাধক ছাড়া এ-সবের সাধনা আর কারো দ্বারা হবে না। সেদিন আপনাকে দেখেই আপনার ওপর কেমন একটা ভালবাসা পড়লো; তাই······

পশুপতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল;—প-বর্গ কি বোলছিলেন?

—আপনাদের নামের ব্যাপারে। 'পশুপতি' আর 'পারুল'—তুই হোল গিয়ে প-বর্গ; এবং শুধুই প-বর্গ নয়, প-বর্গের আত্মক্ষর!

—প-বর্গ হোলে বুঝি······

—হলে কিছুই শান্তি হবে না। অপবর্গ হওয়া চাই।

—অপবর্গ? অপবর্গ মানে?

—তাকের ওপর ওটা অভিধান না? খুলে, মানেটা দেখুন দিকি।

পশুপতি অভিধানখানা খুলিয়া দেখিল ; কহিল—মুক্তি, মোক্ষ, সিদ্ধিলাভ······

—তবেই বুঝুন, অপবর্গ না হোলে সংসারে সিদ্ধিলাভ হবে কোত্থেকে ? প-বর্গ বলেই ত যত অসিদ্ধি আর অশান্তি ! এ সব কথা জ্যোতিষীরা কোত্থেকে জানবেন। যাক, এর উপায় আছে। আমার না-হয় একটু খাটুনি হবে ; আপনার মঙ্গলের জন্যে আমি তা করে দোবো। আপনি কিছু ভাববেন না।

পশুপতির নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল ; উৎফুল্লভাবে কহিল—আমার তা হোলে অপামার্গ।

—অপামার্গ নয়—অপবর্গ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ ; আমার তা হলে অপবর্গ হতে পারবে ত ?

—হইয়ে দিতে হবে। সাধনার দ্বারা কি না হয় ? গীতায় স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে বলচেন—অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রা ব্রহ্মাপুরন্দর দিনকররুদ্রা।—অর্থাৎ আমাকে অর্চনার দ্বারা প্রীত করলে, আমি ভক্ত সাধকের জন্য সপ্ত সমুদ্রের জলও শোষণ করতে প্রস্তুত।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া উভয়ের মধ্যে কথা-বার্তা চলিল। তাহার পর সত্যসাধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; কহিলেন—কিছু ভাববেন না, সব আমি ঠিক করে দিচ্চি ; সংসারে শান্তি এনে দোবই। ঝগড়া-ঝাটি সব বন্ধ হয়ে, মা-লক্ষ্মী আমার আপনার পায়ের তলায় পড়ে থাকবেন—বলিয়া সেদিনেরই মত মধুর হাসি হাসিলেন।

পশুপতিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—চিরকাল যাতে পায়ের তলায় পড়ে থাকে, সেইটে দয়া করে করবেন। দেড়শো টাকা যা খরচার জন্যে দিলুম যদি আরো দু'-দশ টাকা বেশী খরচা হয়, ত তাও আমি······

রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া সত্যসাধু কহিলেন—সম্ভবতঃ ওইতেই হয়ে যাবে। হোমের আড়াই সের খাঁটি গাওয়া ঘি কিনতেই হয় ত পঁচিশ টাকা যাবে এখন। আচ্ছা ; যদি এতে না কুলোয়,—ত আবার কিছু নিয়ে গেলেই হবে। জিনিষ-পত্রের দাম যে আগুন !

নইলে, কুড়ি টাকাতেই—'অষ্টোত্তরী ক্রিয়া'র সব-কিছুই হয়ে যেত আগে······কালই তা হলে বর্ধমান যাচ্ছেন ত ?'

আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল সেখানে জমিটা রেজেষ্ট্রী হবে। আর রেজেষ্ট্রী হলেই আমি প্রায় শ'-পাঁচেক টাকা দালালী পাব।··· নমস্কার।

সত্যসাধু চলিতে চলিতে ট্যাঁকের কষি টিপিয়া দেখিলেন যে দেড়শো টাকার নোটের তাড়াটা ঠিকমত আছে—কি না।

* * * * *

এটিও ৩৬নং বাড়ী; তবে হরমোহন লেন নয়, রামতনু নন্দী রোড।

বহুকালের একটা পুরাতন বাড়ীর মধ্যে একখানা এঁদো ঘর। যেমন ভাঙ্গা-চোরা ঘর, তেমনি তার আসবাব-পত্র,—একখানা নড়-বড়ে পুরাণো প্যাটার্ণের খাট, তাহার উপরে বিছানাও তদ্রূপ; একটা অভদ্র কাঠের আল্‌না, গোটা দুই-চার কাঠের ও টিনের বাক্স, তিন পায়া অবশিষ্ট একখানা বেঞ্চি, একটা রং-চটা টোল্‌-খাওয়া তোরঙ্গ, খান-দুই জল-চৌকী, চাল রাখিবার একটা বেঁটে জালা, আর একটি মোটা স্ত্রী।

পূর্বোক্ত ৩৬নং হইতে এই ৩৬ নম্বরে সত্যসাধু ফিরিয়া আসিলে মোটা স্ত্রীটি কহিল—কি হ'ল ?

সত্যসাধু ট্যাঁকের পাক খুলিতে খুলিতে বলিলেন—কিছু হ'ল; শ'দেড়েক। তা'ছাড়া, ভবিষ্যতের কিছু আশাও থাকলো। কাল কিন্তু তোমাকে একবার ঢুঁ মেরে আসতে হবে, ও-তরফ থেকে যদি কিছু বার করতে পার। কাল কর্তা বাড়ী থাকবেন না······ ·········একটু চা হবে ?

—দেড়শো টাকা উপায় করে আনলে, চা একটু ত হতেই হবে —বলিয়া শৈবলিনী চায়ের কেট্‌লিটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিছু আগে বর্ধমান হইতে ফিরিয়া, কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া পশুপতি খাইতে বসিয়াছে। ভাতে ডাল মাখিয়া এবং এক গ্রাস মুখে তুলিয়া, মাখা ভাতগুলো থালার একপাশে পশুপতি ঠেলিয়া রাখিল। বাটিতে যে তরকারীটা ছিল, তাহাও একটু মুখে দিয়া, বাটিটা ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিল। পাথরবাটির অম্বলটা স্পর্শও করিল না। শুধু দুধ দিয়া একমুঠা ভাত খাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং মুখহাত ধুইয়া, ঘরের মধ্যকার কুলুঙ্গী হইতে ছোট একটা হাঁড়ি নামাইয়া, তাহা সামনে রাখিয়া বসিল। তন্মধ্যে ছিল—বর্ধমানের কিছু সীতাভোগ ও মিহিদানা। পশুপতি বর্ধমান হইতে আনিয়াছে।

একটি, দুইটি, তিনটি, চারটি—পশুপতি খাইয়া যাইতে লাগিল। পাঁচটি, ছয়টি, সাতটি, আটটি, নয়টি,—তারপর গণিয়া দেখিল, হাঁড়িতে রহিল আর সাতটি। সুতরাং উহা পারুলের জন্য রাখিয়া পশুপতি জল খাইয়া উঠিয়া পড়িল। কিন্তু উঠিয়াও আবার বসিল এবং আবার হাঁড়ির সরাখানা সরাইয়া দুইটা মিহিদানা বেশ 'মোটা'-রকম ভাবে মুখের মধ্যে ঠাসিয়া দিল। সুতরাং রহিল—পাঁচটি, ষোলটির মধ্যে।

পারুল কহিল—ভাত খেতে যদি অনিচ্ছে ছিল, সেটা সোজা করে বল্লেই ত হ'ত; তা হলে আর ভাত দিতুম না।

খুব গম্ভীরভাবে পশুপতি কহিল—অনিচ্ছে ত ছিলই না, বরং ইচ্ছেটাই ছিল; কিন্তু দেখলুম, খাবার উপায় নেই; ডালে টক, তরকারীতে টক, আর অম্বল ত পূরোপূরিই টক, সুতরাং...... .....

পশুপতি ভালবাসিত ঝাল ও মিষ্টি; পারুল ভালবাসিত টক ও তিক্ত। পশুপতি বলিয়া দিত, তরকারীতে একটু বেশী পরিমাণে মিষ্টি দিতে, কিন্তু পারুল সে কথা শুনিত না। ডাল-তরকারীতে সে, হয় তেঁতুল, না হয় টমেটো, না হয় অন্য কোনরূপ টক

মিশাইয়া রাঁধিত এবং উচ্ছে-সুক্ত, নিম-ঝোল, পল্‌তা, হেলেঞ্চা, গিমে-শাক প্রভৃতির একান্তই সে ভক্ত ছিল। এই লইয়া দু'জনের মধ্যে বহু কথা কাটা-কাটি, বহু তর্ক, বহু কলহ, বহু মনোমালিন্য ঘটিয়া গিয়াছে ; কিন্তু ফল—'যথা পূর্বং তথা পরং।'

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট-চিত্তে, রাগে গর্‌-গর্‌ করিতে করিতে পশুপতি শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। শুইবার আগে সে ঘরের খোলা জানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিল। খানিক পরে পারুলও খাইয়া ঘরে আসিল এবং প্রথমেই বন্ধ জানালাগুলি খুলিয়া দিল। পারুল ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সামান্য গরম তাহার সহ্য হয় না। পশুপতির কিন্তু ঠিক বিপরীত ; সে গরম সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সামান্য ঠাণ্ডাতে তাহার অস্বস্তি বোধ হয়। সুতরাং জানালাগুলো খুলিয়া দেওয়াতে পশুপতি রাগে ফুলিতে লাগিল।

পশুপতি—পিত্ত-প্রধান ; একটুতেই রাগিয়া অস্থির হয় এবং সামান্য ঠাণ্ডাতেই তাহার সর্দি লাগে ও খক্‌ খক্‌ করিয়া কাশে। তাহার দেহ শীর্ণ এবং শুষ্ক। যেখানে একটা কথা বলিলেই চলে, সেখানে অনর্গল বকা তাহার স্বভাব। পারুল—কফপ্রধান ; তাহার চেহারা স্থূল, কথা কম বলে এবং অল্পেতে রাগে না। সে বুঝিতে পারিল যে, জানালা খোলাতে পশুপতি খুবই রাগিয়াছে, তত্রাচ সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া এবং কোন কথা না বলিয়া, আলো নিভাইয়া দিল ও শুইয়া পড়িল।

পশুপতি আবার উঠিল এবং খোলা জানালা কয়টা পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল।

পারুল বলিল,—একে গরমে আধ-মরা হয়ে যাচ্চি, তার ওপর জানালা বন্ধ করলে একেবারেই মরে যেতে হবে।

—সেই জন্যেই ত বন্ধ করলুম ; কেন না, আধ-মরা হয়ে থাকার চেয়ে যন্ত্রণা আর নেই। তার চেয়ে, একেবারে মরা শতগুণে ভাল।

—উঃ! কি মুস্কিলেই পড়েছি!

—শীগ্‌গীরই মুস্কিলের আসান্ যাতে হয়, তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করচি। গড়ের মাঠে, খোলা হাওয়ায় তোমার একখানা ঘর তৈরীর জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত পেশ করেচি।

একটুখানি বিযাক্ত হাসি হাসিয়া পারুল বলিল—বটে! তাই না কি? তা, গভর্ণমেণ্ট কি উত্তর দিলে?

গভর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়েছে,—একেবারে মনুমেণ্টের ওপর, মুর্শিদাবাদের 'হাজার ছুয়ারী' ঘরের মত একখানা ঘর শীগ্‌গীরই তোমার জন্যে তৈরী করে দেবে; সত্যসাধু বলে একজন বড় কনট্রাক্‌টারের ওপর ঘর তৈরীর ভার পড়েচে।

—বাঃ—বাঃ, খুব শুভ সংবাদ তা হলে। তা হলে, এক কাজ করি, যে ক'দিন আমার হাওয়াখানা না তৈরী হয়, সে ক'দিন ছোট ঘরখানাতে গিয়ে শুই। তুমি আবার আজ শুধু ছুধ দিয়ে একমুঠো ভাত খেয়েছ; ঠাণ্ডা লেগে ছুধটুকু কচি-বুকে আবার জমে যাবে! —বলিয়া পারুল পাশের ছোট ঘরখানায় গিয়া শুইল। এ-ঘরের ভিতর দিয়াই তাহার দরজা ছিল।

শুইয়া শুইয়া পারুল ভাবিতে লাগিল—মহা জ্বালাতনেই পড়া গেছে! আমি যে-পথে চলবো, ঠিক তার উল্‌টো পথে যাবে! যে মেয়েলোকটি আজ ছুপুরবেলা এসেছিলেন, তাঁর নিশ্চয়ই কোন ক্ষমতা আছে। সব ঠিক-ঠিক বলে দিলেন, মায় ওঁর আর আমার নামটা পর্যন্ত! চেহারাটা দেখলেই কেমন একটা ভক্তি হয়। দেখি, তাঁর দয়াতে যদি এর কোনও উপায় হয়।.........বলে ত গেলেন, আমার মনের ছুঃখু তিনি দূর করে দেবেন। কালীঘাটের কালীবাড়ীতে ছুটো অমাবস্যায় একুশটি করে কুমারী ভোজন করাতে হবে। তিনি নিজেই সে ভার নিলেন। তার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা দিলুম, কিছুতেই তা নিতে চান না; শেষে জোর করে দিতে তবে তা নিলেন। খাঁটি লোক না হলে এমনটা কখনো হয় না। আজ ছ'বছর পরে ভগবান এইবার যদি একটু মুখ তুলে চান, ত ওঁরই দয়াতে তা হবে।

ও-ঘরে এই সময়ে পশুপতি ভাবিতেছিল—কি মুস্কিলেই পড়া গেছে, একদিনের জন্যেও শান্তি নেই! আচ্ছা 'রাজযোটক' গুণে দিয়েছিল রে বাবা! 'রাজযোটকে'র ঠেলায় অস্থির! ঐ সত্যসাধু যা বল্লেন, কথাটা খাঁটি কথা বটে। 'অপামার্গ' হওয়ার দরকার, নইলে কিছুতেই শান্তির আশা নেই। দেখি, এতদিন পরে যদি শান্তি পাই, সে তা হলে ওঁরই কৃপাতে পাব।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

পশুপতির ছোট বাড়ীতে আজ বড় রকমের সাড়া পড়িয়াছে। রাশিকৃত তরি-তরকারি, দই, সন্দেশ, রসগোল্লাতে ছোট ঘরখানা থৈ থৈ করিতেছে। দালানের একধারে একটা সের-আড়াই রুই মাছ পড়িয়া রহিয়াছে; আর একধারে পশুপতি ষ্টোভ জ্বালাইয়া চা তৈরীর কাজে ব্যস্ত। রান্নাঘরে পারুল দুইটা উনান ধরাইয়া একটাতে ভাতের হাঁড়ি ও আর একটাতে মাংস চাপাইয়া দিয়াছে।

পারুলের মেজ কাকা দশ বৎসর নিরুদ্দেশের পর, অনেক সন্ধান করিয়া, কাল পশুপতির বাড়ী আসিয়াছেন; সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। দশ বৎসর আগে, পারুলের যখন বিবাহ হয় নাই—তখন সুবোধবাবু ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স-স্ত্রীক বাড়ী হইতে চলিয়া যান। তারপর হইতে তাঁহার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নাই। হঠাৎ হপ্তা-খানেক হইল তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন এবং যেরূপভাবে এক-কাপড়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেরূপভাবে ফিরেন নাই। বিলাসপুরে কন্‌ট্রাক্‌টারী কাজ করিয়া প্রায় লাখ-দুই টাকার মালিক হইয়া ফিরিয়াছেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া সুবোধবাবু গৃহে যান নাই, কোন-একটা বড় হোটেলে থাকিয়া পারুলের সন্ধান করেন এবং সন্ধান মিলিবা-মাত্র তাহার বাড়ীতে আসেন। পারুলকে তিনি ভয়ানক ভালবাসিতেন।

চা করিতে করিতে পশুপতি পারুলের উদ্দেশ্যে হাসিয়া বলিল—মাংসে যেন টমেটো বা কোন-রকম টক দিও না; একটু ঝাল মিষ্টি দিও।

কথাটা পারুল ভালো করিয়াই শুনিল এবং পরক্ষণেই ডিসের উপর আধখানা করিয়া কাটা যে টমেটোগুলো ছিল, সেগুলো মাংসের হাঁড়িতে ঢালিয়া দিল।

দুই-চারিদিন পরে একদিন দুপুর-বেলা আহারাদির পর পারুলের কাকীমা পারুলের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে স-স্নেহে কহিলেন—তোর কি-চেহারা ছিল পারু, আর এখন কী হয়ে গেছিস! যখন আমরা কোলকাতা ছেড়ে চলে যাই,—তখন তুই কী সুন্দর দেখতে ছিলি। এখন তোর আর সে রং-ও নেই, সে লালিত্যও নেই।

—কি করে থাকবে কাকিমা। সংসারে শান্তি বলে কিছু নেই। আমি যাই এ-পথে, ত তোমার জামাই যাবে ও-পথে। আর তা ছাড়া—সংসারে নিত্যি অভাব, নিত্যি টানা-টানি। একটা বাঁধা-ধরা চাকরী ত নেই, জমি-জায়গার দালালী করে কি আর ...। ও-বছর কী অসুখটা হল কাকিমা! তিন মাস ধরে ঠায় ভুগি; সেই থেকেই ত শরীরটা গেল একেবারে ভেঙ্গে।

স্নেহ-ভরা কণ্ঠে কাকীমা কহিলেন—শোন্ মা পারু; মাস-খানেক কি মাস-দুই কোনও ভালো জায়গায় গিয়ে একটু হাওয়া বদলে আয়। কতই আর খরচ লাগবে। শ'-পাঁচেকই লাগুক, সে টাকা আমরা দোবো'খন। তুই কোথায় যেতে চাস বল্।

অপরাহ্নে বৈঠকখানা ঘরে ঘুম হইতে উঠিয়া চক্ষু চাহিতেই সুবোধবাবু দেখিলেন, পায়ের কাছে বসিয়া—পশুপতি। উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—খুব ঘুমিয়েছি আজ; বোধ হয় ঘণ্টা-তিনেক হবে। দিনের বেলা তুমি বুঝি ঘুমোও না?

—আমার ঘুম হয় না, কাকাবাবু। দিনেও হয় না, রাতেও হয় না।

মাথাটা অল্প নাড়িতে নাড়িতে সুবোধবাবু কহিলেন—তোমার স্বাস্থ্যটা মোটেই ভালো নয়, বাবা।

—ভালো ত নয়ই কাকাবাবু; ডিস্‌পেপ্‌সিয়া; চাপা অম্বল। দালালী কাজ করি, নাইবার খাবার একটা বাঁধা টাইম ত নেই।

—তা ত ঠিক, কিন্তু তা করলে ত চলবে না; শরীরটাকে সর্বাগ্রে ঠিক রাখা চাই, বাবা।

—ও-মাসে বড়-অসুখটা হল; একেবারে ব্যাসিলারি ডিসেন্‌ট্রি; তাইতেই দেহটাকে একেবারে কাবু করে দিলে।

সমবেদনার স্বরে সুবোধবাবু কহিলেন—কাবু করে দিলে ত চলবে না বাবাজী। এক কাজ কর; শ'দু'চ্চার টাকা আমি না হয় দোবো'খন, পারুকে নিয়ে তুমি কোথায়ও দিন-কতক চেঞ্জে যাও।—তাহার পর মিনিট-খানেক কি ভাবিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, তাই যাও। আমরা মাস-দুয়ের জন্য কেষ্টনগরে যাব, সেখানে একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমরা এই দুটো মাস কোন ভালো জায়গায় গিয়ে থেকে এসো। যা খরচ-পত্তর হয়, সব আমি দোবো'খন।

সব ঠিক হইয়া গেল। অর্থাৎ শীঘ্রই কোন বৈষয়িক ব্যাপারে সুবোধবাবুকে মাস-দুয়ের জন্য কেষ্টনগরে গিয়া থাকিতে হইবে। কেষ্টনগরে সুবোধবাবুর শ্বশুরবাড়ী। সেই দুইমাস পশুপতি ও পারুল কোন ভাল স্থানে চেঞ্জের জন্য গিয়া থাকিবে।

কিন্তু সোজা ব্যাপারটায় গোল বাঁধিয়া উঠিল। পশুপতি বলিল—আমি যাব পুরী। দিব্বি সমুদ্র দেখবো আর সমুদ্রের হাওয়া খাবো। না গরম, না ঠাণ্ডা; চমৎকার থাকা যাবে।

এদিকে পারুল পশুপতিকে শোনাইয়া-শোনাইয়া যখন-তখন বলিতে লাগিল—পুরী! মরে গেলেও যাব না; শেষকালে পা পিছ্‌লে সমুদ্দুরের জলে ডুবে মরি আর কি! পুরী কিছুতেই যাওয়া হবে না। যাব—মধুপুর। দিব্বি পাহাড় দেখবো আর শালবনের হাওয়া খাব। ওখানে এ-সময় মোটেই গরম নেই, বেশ ঠাণ্ডা; চমৎকার থাকা যাবে!

দিন দু'চ্চার পরে কাকীমা পারুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাওয়া তোরা ঠিক করলি মা ?

—মধুপুর যাব, কাকীমা।

সুবোধবাবু পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবাজী, কোথায় যাবে কিছু ঠিক করলে কি ?

—করেচি কাকাবাবু; পুরী।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

—মধুপুর ছাড়া আমি আর কোথাও যাবো না।

—তার মানে ?—অদ্ভুত গোছের বাঁকা মুখভঙ্গীতে প্রশ্ন করিয়া পশুপতি পারুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। পারুলও মুখখানা ভীমরুলের মত করিয়া জবাব দিল—তার মানে পুরী-টুরি যমের বাড়ী আমি যাব না। আমি মধুপুর যাব।

একটা তীব্র উপহাসের ভাবে পশুপতি কহিল—মধুপুরে বুঝি তোমার মধু আছে, তাই খেতে যাবে সেখানে !

—হ্যাঁ, তাই ত যাবো; মধুটা আমার পেটে খুব সয়; পুরী, লুচি সয় না—অম্বল হয়, চোঁয়া-ঢেকুর ওঠে !

কট্‌ মট্‌ করিয়া পারুলের মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর, পশুপতি অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে কহিল—মধুপুরই যাবে ?

—হ্যাঁ, যাবো।

—পুরী যাবে না ?

—না, যাবো না।

সহসা পশুপতির চীৎকারে ঘরের কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল—'আল্‌বৎ যেতে হবে।' বাতাসের ঘনচাপে, কড়ি ভিতর ভিতর ভাঙ্গিলেও পড়িয়া যাইতে পারিল না। নিজেরই কম্পনে পশুপতি ঘর হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহিরে গিয়া পড়িল; হুঙ্কার দিয়া বলিল—'তোমার ঘাড় যাবে।'—নিস্তব্ধ ঘরের

বাতাস-টুকুর মধ্যে 'য়ে-য়ে-য়ে-য়ে' করিয়া প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কাকা-কাকী আজ দুপুরবেলা বাড়ী ছিলেন না, কি-একটা দরকারে কোথায় গিয়াছিলেন। বৈকালে বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন, ঘরের মেঝের উপর পারুল আঁচলখানা বিছাইয়া শুইয়া আছে; পশুপতি ঘরে নাই; ঘরের দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ ছড়ানো; পানের ডাবর আর তার ছোট বাটিগুলা ছত্রাকারে মেঝের চারিদিকে গড়া-গড়ি যাইতেছে; রোয়াকের দড়িতে পারুলের নতুন শাড়ীখানা দু'ফালি হইয়া অর্ধেকটা তার ধূলায় লুটাইতেছে। কয়দিন এ বাড়ীতে বাস করিয়াই তাঁহারা পারুল ও পশুপতির হাব-ভাব অনেকটা জানিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং বুঝিলেন, উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর ছোট ঘরখানার মধ্যে বসিয়া সুবোধবাবু ও তাঁর স্ত্রী মৃদুকণ্ঠে ইহাদের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। পারুলের কাকীমা কহিলেন,—দু'জনে একেবারেই মিল নেই! আমার মনে হয়, শুভ-দৃষ্টির সময়ে কেউ কোন 'দোষ' করেচে। নিশ্চয়। নইলে এরকম কখ্খনো হয় না।

সুবোধবাবু কহিলেন—তোমাদের ঐ সব কুসংস্কার। আসল কথা কি জান? টাকা পয়সা। সংসারে অভাব-অনটন থাকলেই ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকে। কোথায় পাঁচশো টাকার দালালী পাবার কথা ছিল, তারা দু'শো টাকা দিয়ে, তিনশো টাকা ওকে ফাঁকি দিলে; সুতরাং ওর মাথা গরম হয়েই আছে। তারপর, সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, মেজাজ তিরিক্ষে হয়েই আছে। মাসে মাসে একটা বাঁধা-আয় হোক দেখি, কেমন আর ঝগড়াঝাটি হয়!

—তা হলেও, আমার মনে হয়, বিয়ের সময় কোন খারাপ লোক কোন 'দোষ' করেচে।—তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওরা না হয় নতুন করে আর একবার 'মালা-বদল' করুক।

হাসিতে হাসিতে সুবোধবাবু বলিলেন—তার মানে, শুভদৃষ্টির দ্বিতীয় সংস্করণ ?—কে রে, পারু নাকি ?—ভেজানো দরজার ও-ধারে কা'র পায়ের শব্দ হইল। কিন্তু পারুল নহে। পারুল রান্নাঘরে কাকাবাবুর জন্য হালুয়া ও চা তৈরী করিতেছিল ; আর ভাবিতেছিল যে, সেই মেয়েলোকটি জল্-জ্যান্ত ফাঁকি দিয়া তাহার কাছ হইতে পঞ্চাশটি টাকা লইয়া গিয়াছে। উঃ ! কী সাংঘাতিক ! মেয়েলোকও এ রকম জোচ্চোর হয় !

পায়ের শব্দ—পশুপতির। পশুপতি অন্ধকারে দালানে দাঁড়াইয়া খুড়-শ্বশুর ও খুড়-শ্বাশুড়ীর কথাগুলি শুনিতেছিল। সুবোধবাবুর গলার আওয়াজ পাইয়া টিপি-টিপি চলিয়া আসিয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল এবং চৌকিখানার উপর শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—সত্যসাধুটা মনে হচ্ছে একটা পাকা-চোর। অপমার্গ-টপমার্গ কিছুই করে দিলে না, অথচ ফাঁকি দিয়ে কতকগুলো টাকা বেমালুম নিয়ে গেল !—উঃ !

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

দিনকতক পরে।

সুবোধবাবুর কেষ্টনগর যাওয়া হয় নাই। হঠাৎ বৌবাজারের দিকে একখানা বাড়ী বিক্রয়ের সংবাদ পাইয়া এ-কয়দিন তিনি তাহারই পিছনে ব্যস্ত ছিলেন। সেই বাড়ীখানা তিনি তের হাজার টাকায় কিনিয়া লইলেন। কিন্তু নিজের নামে বা স্ত্রীর নামে কিনেন নাই ; দলিল রেজেষ্ট্রি হইয়াছে—পশুপতি ও পারুলের নামে।

সন্ধ্যার পর তিনি ও তাঁর স্ত্রী বড় ঘরখানার মধ্যে বসিয়াছিলেন ; সামনে একটু তফাতে বসিয়াছিল—পশুপতি ; আর কাকীমার গা ঘেঁসিয়া, ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল—পারুল। বাড়ীর দলিলখানা সুবোধবাবু পারুলের হাতে দিয়া কহিলেন—তোর বিয়েতে তোদের আমি কিছু যৌতুক দিতে পারি নি—সেটা আজ

দিলুম। বাড়ীখানায় এখন মাসে ১১৫ টাকা ভাড়া আদায় হয়; একটু ভাল করে মেরামত করলে, শ'দেড়েক হতে পারে এবং হিসাব করে চললে, তাইতেই তোদের দু'জনের সংসার বেশ-একরকম চলে যেতে পারবে।

পশুপতি পুলকের আতিশয্যে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং টিপ্-টিপ্ করিয়া সুবোধবাবু ও কাকীমার পায়ে প্রণাম করিল। পারুলও সেইখানে বসিয়া উভয়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

কাকীমা কহিলেন—কিন্তু বাবা, একটা কথা বলে রাখি; পারু, তোকেও বলচি মা। এর পর তোদের দু'জনের মধ্যে যদি কখনো ঝগড়া-ঝাটি হয়, তাহ'লে যে আগে ঝগড়া করবে, বাড়ীর ওপর তার আর কোন দাবী থাকবে না। একথাটা তোমরা দু'জনে মনে করে রাখবে।

সুবোধবাবু কহিলেন—দলিলের মধ্যে এ কথাটা খুব ভাল করেই লেখা আছে, তোমরা পড়ে দেখো। আর পরশু আমরা কেষ্টনগর যাব। তোমরাও এ দুটো মাস একটু ঘুরে এস। মধুপুরেই যাও; এ সময়টা মধুপুর খুবই ভাল; কি বল পশুপতি?

পশুপতি কহিল—আজ্ঞে, মধুপুরেই ত যাব। কী সুন্দর জায়গা! চারদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর তার গা ঘেঁসে ছোট ছোট পাহাড়ী ঝর্ণা যেন বুক-ভরা রূপোর দানা নিয়ে স্থির হয়ে রয়েচে! শালবনের হাওয়া একবার গায়ে লাগলে······

কথাটা শেষ হবার আগেই, পারুলের দিকে চাহিয়া সুবোধবাবু কহিলেন—পুরী যাবার ইচ্ছে হয়, তা'ও যেতে পার। কোথা যেতে চাস বল্, পারু। পুরীও খুব ভাল জায়গা; তাই যাবি নাকি?

—হ্যাঁ কাকাবাবু, যাব, কেমন সমুদ্দুর দেখব—সমুদ্দুরের ধারে বেড়াব,—সূর্যোদয় দেখব। চমৎকার জায়গা!

সুবোধবাবুর মুখে একটা গোপন হাসির রেখা ফুটিয়া সরিয়া গেল, তাহা কাহারও লক্ষ্যে আসিল না।

*   *   *   *   *

পুরী।

অপরাহ্নের সমুদ্র-সৈকত।

তাহারই কোন জনশূন্য অংশে পাশা-পাশি বসিয়া—পশুপতি ও পারুল।

পশুপতি কহিল—আমার দিকে চাও; ভাল করে চাও।

পারুলের পুলক-ভরা দুই চোখের দৃষ্টি পশুপতির মুখের উপর আসিয়া স্থির হইল। সেই অবসরে, পশুপতি তাহার পকেট হইতে একছড়া ফুলের মালা বাহির করিল এবং পারুলের গলায় পরাইয়া দিতে দিতে হাসিয়া কহিল—কাকীমার আদেশ এবং ইচ্ছা। অর্থাৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ শুভ-দৃষ্টি আর মালা-বদল।

পারুলও হাসিতে হাসিতে নিজের গলা থেকে মালা-ছড়াটা খুলিয়া তাহা পশুপতির গলায় পরাইয়া দিল।

এ.কে.ও.এস.

প্রাতঃকাল।

শ্রীযুত রজত রায় বারান্দার আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট। পাশের টিপয়ের উপর এক কাপ গরম চা বাষ্পরাশি উদ্গীরণ করিয়া অনাদরে ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। হাতে তাঁহার সেই দিনকার একখানা দৈনিক সংবাদপত্র। চক্ষুর স্থির দৃষ্টি সম্মুখস্থ মেঝের উপর নিবদ্ধ, এবং অন্তর অন্তহীন চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

স্ত্রী চিত্রা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল—এ কি! চা যে জুড়িয়ে বরফ হয়ে যাচ্ছে! বেহুঁস হয়ে কি ভাবছ বল ত?

—কাগজওয়ালারা এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে!

—কিসের?

—ঐ ছায়ার বিয়ের বিজ্ঞাপনটার! করেছে কি জান? একেবারে ম্যাসাকার (massacre) করেছে! আমি ওদের বিজ্ঞাপনের বিলের একটি পয়সাও দিচ্ছিনে।

—হয়েছে কি—আগে তাই শুনি।

—হয়েছে? এই—রামের মুণ্ডু শ্যামের ধড়ে, আর শ্যামের মুণ্ডু রামের ঘাড়ে বসিয়ে দিয়েছে! উঃ! 'প্রিণ্টার্স ডেভিল'ই বটে! কেলেঙ্কারী ব্যাপার না ঘটিয়ে আর ছাড়লে না দেখছি!

—ব্যাপারটা একটু খুলে বল না ছাই!

—ঠিকানা ছাপাতে সাংঘাতিক ভুল করে বসেছে! এই দেখ—বলিয়া রজত রায় হাতের কাগজখানা চিত্রার হাতে দিলেন।

শ্রীযুত রায়ের একটি পুত্র এবং একটি কন্যা। কন্যাটিই বড়, নাম—কুমারী ছায়ারাণী। ছায়ার বয়স আঠারো ছাড়াইয়া গিয়াছে; সে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। শ্রীযুত রায়ের ইচ্ছা, বি-এ পাশ করাইয়া তাহার বিয়ে দেন। কিন্তু চিত্রার ইচ্ছা 'শুভস্য শীঘ্রং'—অতএব অবিলম্বে। তাই চিত্রারই পীড়া-পীড়িতে রজতবাবু উপযুক্ত পাত্রের জন্য বাঙ্গলা দৈনিকে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু ছাপাখানার ভুলক্রমে বিজ্ঞাপনের শেষে তাঁর নাম ঠিকানার

জায়গায় হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামক অপর এক জনের নাম ও তাহারই ঠিকানা ছাপা হইয়াছিল। আর সেই লোকটির মেয়ের বিয়ের বিজ্ঞাপনের শেষে ছাপা হইয়াছিল—রজত রায়ের নাম ও ঠিকানা।—হরেকৃষ্ণ চট্টোর বিজ্ঞাপনটি এই,—

—একটি শ্যামবর্ণা, কৃশাঙ্গী কন্যার জন্য উদার-হৃদয় একটি সৎপাত্রের দরকার; বেরিবেরিতে ভুগিয়া মেয়েটির একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাত্র পছন্দসই হইলে মেয়ের নামে কলিকাতায় একখানি বাড়ী এবং পাঁচ হাজার এক টাকা যৌতুক দেওয়া হইবে।

চিত্রা বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া কাগজখানি স্বামীর হাতে ফিরাইয়া দিল; কহিল—তাহলে আবার বিজ্ঞাপন দাও; আর ওদের ভাল করে বলে এস যে, আর যেন কোন ভুল না হয়।

—তার জন্যে একটু মিষ্টি-মিষ্টি ওষুধের ব্যবস্থাও করতে হবে। ওরে বেহারী! কবিরাজ মশায়কে একবার ডাকতো।

কবিরাজ মশায়—অর্থাৎ নিশিকান্ত চক্রবর্তী, বয়স সত্তরের কাছা-কাছি—এক সময়ে শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘ, সুগঠিত চেহারা। প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন। বয়স বেশী হওয়াতে এক্ষণে সে সব ত্যাগ করিয়া, রজতবাবুর পোষ্যভুক্ত হইয়া আছেন। এইখানেই খান-দান, থাকেন, কিছু কিছু নগদ হাত-খরচাও পান; আর রজতবাবুর সাংসারিক কাজকর্ম দেখা-শুনা করেন, এখানে-সেখানে যান, ফাই-ফরমাস খাটেন।

কবিরাজ মশায় উপরে আসিলে, রজতবাবু তাঁহাকে বিজ্ঞাপনের ভুলের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন—খেয়ে-দেয়ে ওদের আফিসে একবার যাবেন; আর বেশ তুড়ে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসবেন।

কবিরাজ কহিলেন—ওর ব্যবস্থা আমি করবো এখন। বিলের টাকা দেওয়া হবে না। আপনি একবার নীচে চলুন; একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

রজতবাবু বলিলেন—মিনার্ভা ইন্‌সিওরেন্স থেকে একটি লোকের আসবার কথা আছে বটে; চলুন যাই।

নীচে আসিতেই ভদ্রলোকটি নমস্কার করিয়া, চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আমি আপনার বাড়ীর খুব কাছেই থাকি। বিজ্ঞাপনটা এখনি দেখে এলুম। আমার একটি নাতি, ···অতি চমৎকার ছেলে আই-এ পাশ করে···

—দেখুন, ও বিজ্ঞাপনটা আমার নয়; ঐ কাণা মেয়ের বিজ্ঞাপন ত? কাগজ-ওলাদের ভুলে নাম-ঠিকানা ওলট-পালট হয়ে গেছে। আপনি···

—তাই না কি? ও বিজ্ঞাপন তাহলে আপনার নয়?

—না। আপনি ৩০নং বনমালী ষ্ট্রীটে যান,—যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁর নাম—হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া ঘরের বাহিরের বারান্দা হইতে নীচে না নামিতেই আর এক ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। রজতবাবু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকে চান? আপনি ঐ বিয়ের এড্ভারটিজ্মেণ্ট (advertisement) দেখে আসছেন ত? দেখুন, কাগজে য়্যাড্রেস (address) ভুল করে ফেলেছে। আপনি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে যান; থারটি, বনমালী ষ্ট্রীট। যান, চলে যান ওঁর সঙ্গে,—ঐ যে নেমে যাচ্ছেন—জিনের কোট গায়, মাথায় ছাতা। তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া রজতবাবু অন্দরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। দু'টি অতিথি বিদায় করিলেন, ত্র্যহস্পর্শের আশঙ্কা ছিল!

বেলা বোধ হয় তিনটা বা সাড়ে তিনটা। বেহারী আসিয়া খবর দিল, পাঁচ-ছয় জন বাবু এসেছেন! রজতবাবুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল; একটু ব্যস্তভাবে কহিলেন—কোব্রেজ মশায় ফেরেন নি এখনো?

—আজ্ঞে না।

অগত্যা রজতবাবু নামিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। একসঙ্গে অনেকগুলি সবিনয় নমস্কার আসিল। আগন্তুকের সংখ্যা অর্ধ ডজন। একটি খর্বাকৃতি মোটা-সোটা ভদ্রলোক মৃদু হাসিতে হাসিতে আসিয়া সামনের চেয়ারখানি অধিকার করিলেন এবং

সেইরূপ সহাস্য মুখে কহিলেন—দেখুন, ভগবান যাকে ব্যাধি দিয়ে অঙ্গহানি করেন, তাকে আদর করে টেনে নেওয়াই মনুষ্যত্ব ; তাই আপনার বিজ্ঞাপনটা পড়েই···

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি দূর হইতে কথার পিঠেই বলিলেন,—দেখুন রজতবাবু, আমারও ওই কথা। অবশ্য ওঁনার সঙ্গে আপনার কথা হয়ে যাক, তার পর আমি আমার ছেলেটির সম্বন্ধে আপনাকে সব নিবেদন করবো। দেখবেন, এ-রকম ছেলে আজকাল আপনি—কি মহৎ আদর্শ! কি উদার—

রজতবাবু ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া কহিলেন,—দেখুন, আপনারা সব কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন বটে, কিন্তু ও-মেয়ে আমার নয়। কাগজ-ওলাদের ভুলে নাম-ঠিকানা ওলট-পালট হয়ে গেছে, সুতরাং—

—বলেন কি! ঠিকানারই ওলট-পালট!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই মেয়ের ঠিকানা ৩০নং বনমালী ষ্ট্রীট। আপনারা দয়া করে সেখানে যান। বড্ড আন্‌নেসেসারি ট্রাবল্ (unnecessary trouble) পেতে হলো আপনাদের। সরি! (sorry!)—বলিয়া রজতবাবু চেয়ার-ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আগন্তুকরাও সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, বনমালী ষ্ট্রীটটা কোথায় বলতে পারেন দয়া করে?

—শ্যামবাজার কি বেহালার ওই দিকে হবে বোধ হয় ; আমি ঠিক জানি নে।

সকলেই মনঃক্ষুন্ন হইয়া বাহিরে আসিলেন। বিদায়ী নমস্কারের পালাটি উৎসাহ বিহনে বন্ধ রহিয়া গেল।

পরের দিন।

প্রাতঃকাল।

পূর্ব্বদিনের সেই দ্বিতলের বারান্দা ; সেই আরাম-কেদারা ; সেই টিপয় ; এবং তদুপরি সেই চায়ের কাপ। প্রভেদের মধ্যে

গরম চা আজ আর শুধু-শুধু ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই ; আজ রজতবাবু নিঃশেষে তাহা পান করিয়া সিগারেটের ধূমপান করিতেছিলেন। সম্মুখে রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া—কবিরাজ মহাশয়।

রজতবাবু কহিলেন,—দেখুন, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আজকেও ঐ ননসেন্স (nonsence) বিজ্ঞাপনটার জন্যে কেউ কেউ হয় ত এসে জ্বালাতন করতে পারে। থাকুন আপনি বাড়ীতে। পারেন ত, আপনার 'সপ্তিতিক্ত-কষায়' সকলকে একটু একটু খাইয়ে পরিপুষ্ট করবেন। আচ্ছা বদারেশন্ (botheration) যা হোক !

মিনিট-পনের পরে রজতবাবু সদর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, দুইটি ভদ্রলোক দরজার ধারে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন কহিলেন—রজত রায়ের বাড়ী কি এটা ? তিনি বাড়ী—

—নেই ; এই এঁনার সঙ্গে কথা বলুন—বলিয়া, পিছনের কবিরাজ মশায়কে দেখাইয়া দিয়াই দ্রুতপদে রজতবাবুর অন্তর্ধান।

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় বাড়ী ফিরিলে, চিত্রা কহিল, —আচ্ছা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে যা হোক ! কত লোকই যে এসেছিল ! আবার তারা সব বিকেলে আসবে বলে শাসিয়ে গেছে।

চম্‌কাইয়া উঠিয়া রজতবাবু কহিলেন—বিকেলে আবার আসবে বলে গেছে ? কবিরাজ মশায় ! কবিরাজ মশায় !—কি ব্যাপার বলুন ত ! অনেক লোক না কি এসেছিল ?

—আজ্ঞে, তা হবে বৈ কি ; বিশ-পঁচিশ জন ত হবেই।

—আবার না কি সব আসবে বলে গেছে ? কি সর্বনাশ !

—না না ; আমি সব বুঝিয়ে বলে দিয়েছি ; আর তারা আসবে কেন ?

তারা যদিও আর আসিল না বটে, কিন্তু বিকালের দিকে অফিস আদালত বন্ধ হইবার পর—অর্থাৎ সন্ধ্যার আগে, দলে-দলে লোক আসিয়া রজতবাবুর বাড়ীর সম্মুখে ভীড় জমাইয়া ফেলিল। আষাঢ় মাসও নয়, রথতলাও নয়, তথাপি যেন রথের ভীড় জমিয়া গেল।

রজতবাবু প্রমাদ গণিলেন! তাড়াতাড়ি কবিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন,—শীগ্গীর থানায় যান; পুলিসের হেল্প (help) না নিলে এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

কবিরাজ মশায় অগত্যা থানায় ছুটিলেন। থানার ইন-চার্জ (In-charge) কহিলেন—দেখুন, এর আমরা কি করতে পারি! চুরি নয়, ডাকাতি নয়, খুন-খারাপিও নয়···বুঝছেন না? ঠিকানার ভুলে একটা—যাকে বলে 'কমেডি অফ এরারস', সুতরাং এ অবস্থায়···

সুতরাং কবিরাজ মশায় ফিরিয়া আসিলেন এবং অতি কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া বাড়ী ঢুকিলেন।

তারপর কবিরাজ মশায় এবং রজতবাবু উভয়ে মিলিয়া বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় এবং বহু পরিশ্রমে, সমাগত ভদ্রলোকগণকে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন এবং কাণা মেয়ের কন্যা-কর্তার নাম-ধাম দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া ভিতরে আসিলেন।

উদ্বেগ ও পরিশ্রমে রজতবাবু ঘামিয়া গিয়াছিলেন; হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন—কালই এ বাড়ী ত্যাগ করতে হবে; নইলে ক্রমেই ভয়ানক ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে! শেষে হয় ত হার্টফেল হয়ে মরতে হবে! Horrible! দিনকতকের জন্যে এ-বাড়ী না ছাড়লে আর উপায় নেই। ছাড়তেই হবে।

তখনই বজতবাবু ছড়িগাছটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ঘণ্টা-তুই পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—ও-পাড়ায় পাকড়াশীদের বাড়ীখানা ঠিক করে এলুম। কাল ভোরেই বাড়ীতে তালা বন্ধ করে ওইখানে গিয়ে দিন-কতক আশ্রয় নিতে হবে।

চিত্রা কহিল—বাড়ী ছেড়ে যাবে? কি যে বল!

—তা'ছাড়া আর অন্য রেমিডি (remedy) নেই। এ বদারেশন (botheration) থেকে উদ্ধার পেতে হলে দিন-কতকের জন্যে এ-বাড়ী ছাড়তেই হবে। উঃ! কাগজ-ওলাদের নামে আমি নালিশ করবো,—ঠিকই নালিশ করবো!

—বাড়ী ফেলে পালাতে হবে ?

—Surely। জিনিষ-পত্তর যা আছে সব এমনই থাকবে। রান্নার সরঞ্জাম আর কাপড়-চোপড় নিয়ে শুধু আমরা চলে যাব। কবিরাজ আর রূপনারায়ণ বাড়ী চৌকি দেবে।

—কদ্দিন থাকবে ?

—একটা মাস ত বটেই !

—এই এক মাসের ভাড়া টান্‌তে হবে ত ?

—এক মাসের হলে ত বাঁচতুম ! পাকড়াশীটা ঝোপ বুঝে কোপ মারলে ! বলে, তিন মাসের ভাড়া advance না করলে দেবো না। Can't help ! কি করা যায় ? তাই দিয়ে এলুম ; অর্থাৎ তিন ষাট—যার মানে একশো আশীটি টাকা !

পরদিন প্রত্যুষেই রজতবাবু সপরিবারে পাকড়াশীর বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

কথায় আছে—বরাত মন্দ হ'লে ভাজা মাছটাও পাত থেকে পালিয়ে যায় ! রজতবাবুর তাহাই হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দিন-কতক ও-বাড়ীটায় থাকিয়া, কাণা মেয়ের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া এ-বাড়ীতে আসিবেন এবং ও-বাড়ীটা 'সাব্‌-লেট্‌' করিয়া তাহার টাকাটা তুলিয়া লইবেন ; কিন্তু বিধি বাম ! দিন চার-পাঁচ মধ্যেই সারা দেশে হঠাৎ একটা আতঙ্কের বাতাস বহিল। জাপানীরা সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া রেঙ্গুণে বোমা ফেলিতেই কলিকাতায় ভীষণ আতঙ্কের সঙ্গে বিষম হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। লোক যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল। হপ্তা-খানেকের মধ্যে কলিকাতা প্রায় অর্ধেক খালি হইয়া গেল। চিত্রা বলিল—শীগ্‌গীর ভাল জায়গার সন্ধান কর, আমি কিছুতেই আর কোলকাতায় থাকবো না।

দু'-এক দিনের মধ্যেই ও-পাড়াটাও খালি হইয়া গেল। তখন চিত্রার অনবরত তাগাদায় অগত্যা রজতবাবু তাঁহার এক বন্ধুর পরামর্শ মত, বারুইপুরের কাছে সোনামুড়ি গ্রামে তাঁরই বাড়ীর

একাংশে গিয়া উঠিলেন। কলিকাতার বাড়ীতে চৌকি দিবার জন্য রহিল শুধু—রূপনারায়ণ দরোয়ান।

পল্লীগ্রাম। চারিদিকেই মুক্ত প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর শোভার বিকাশ। প্রথম দুই-এক মাস রজতবাবুর মনের প্রফুল্লতায় দিন কাটিতে লাগিল। তারপর ক্রমেই একঘেয়ে ভাব বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কলিকাতায় ফিরিবার উপায় নাই। কাগজে কাগজে ঘোষণা পাঠ করিলেন, যাহাদের থাকিবার আবশ্যক নাই, তাহারা যেন কলিকাতায় না থাকে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও রজতবাবুকে সোনামুড়ি থাকিতে হইল। চিত্রাকে কহিলেন,—Village life মন্দ নয় কিন্তু বেশী দিন থাকা টিডিয়াস (tedious)। আচ্ছা, তোমার মনোটোনাস্ (monotonous) লাগছে না ?

চিত্রা কহিল—কি ছাই তুমি বল, ভাল করে বুঝতে পারি নে। জান যে, আমি মোটেই ইংরিজি-টিংরিজি জানি নে, তবু বাংলা বলতে বলতে তার সঙ্গে লম্বা লম্বা ইংরিজি বুক্‌নি ঝাড়বে! বাংলা মায়ের ছেলে ত ? বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পার না ?

—মাঝে মাঝে তুমি বল বটে, কিন্তু আমার ঐ কথাটা মনেই থাকে না। কথার সঙ্গে ইংরিজি বলাটা আমার নেচার (nature) হয়ে গেছে।

আবার—'নেচার' !—তাহলে আমি নাচার! তাহলে দেখছি, আমাকেই এই বয়সে এ, বি, সি, ডি সুরু করতে হয়। তাই না হয় করবো। যাক, তুমি কেরোসিন আর চিনির যোগাড় কর, নইলে মহা মুস্কিল হবে।

—চিনিটা কিছু কিছু পাওয়া গেলেও যেতে পারে; কিন্তু কেরোসিন সম্বন্ধে আমার ডাউট (doubt)। আচ্ছা, মাসে কতটা কোয়ান্‌টিটি (quantity) আমাদের···

সহসা চিত্রা উঠিয়া ওদিক্‌কার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। রজত বাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। সামনের

নারিকেল গাছের গুঁড়িতে একটা কাঠ্-ঠোক্রা চঞ্চু দ্বারা অনবরত আঘাত করিয়া ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতেছিল। পাশের পোড়ো-বাড়ীটার ভাঙ্গা পাঁচিলটার উপর দু'টো কাঠবিড়ালী ছুটা-ছুটি করিতে লাগিল। দূরের কোন বৃক্ষশাখা বা ঝোপ-ঝাড় হইতে একটা ঘুঘুর ডাক মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। ভট্‌চাযি্যদের পেয়ারা গাছে দু'টো ছেলে উঠিয়াছে আর নীচে একদল ছেলে উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে গাছের পানে চাহিয়া থাকিয়া কলরব জুড়িয়া দিয়াছে। সকলে মিলিয়া কাঁচা পেয়ারাগুলা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিতে লাগিল।

রজতবাবু উঠিয়া এক-পা এক-পা করিয়া ওদিককার ঘরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, চিত্রা মেঝেয়-পাতা মাদুরখানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া Ba—বে, Be—বি, Bi—বাই, Bo—বো পড়িতেছে। রজত বাবুজিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি ব্যাপার ?

—ইংরিজিটা আমার শিখতেই হবে; নইলে তোমার সব কথা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে···

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রজতবাবু কহিলেন—ওঃ! বুঝেছি। আচ্ছা আর ইংরেজী কথা···

বেহারী আসিয়া বাহির হইতে কহিল—ঘটক মশায় এসেছেন।

ঘটক মশায়—অর্থাৎ গোবিন্দ মুখুজ্যে। এই গ্রামের দক্ষিণ-পাড়ায় বাড়ী। পেশা যজমানি। যজমানির ফাঁকে পৈতৃক পেশা ঘটকালিও করিয়া থাকেন। ছায়ার জন্য একটি পাত্রের কথা রজত বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; যেহেতু আর বিজ্ঞাপন দিতে তিনি ভীত, সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত। মুখুজ্যে মশায় কয়েকটি পাত্রের সন্ধান ইতিপূর্ব্বে আনিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটিই রজতবাবুর পছন্দসই হয় নাই।

আজ মুখুজ্যেমশায় একটি নূতন সম্বন্ধ আনিয়াছেন; কহিলেন —এ ছেলেটি হল 'ফুলপোতা'র রামলাল বোসের নাতি।

রজতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—রামলাল বোসটি হলেন কে ?

—মস্ত গেরস্ত। জমি-জমা, বাগান, পুকুর,—সুখের সংসার। সাত শ' বিঘে জমার জমি। বুঝে দেখুন একবার, কত বড় গেরস্ত! দেশ-জোড়া নাম এঁদের মশায়!

—ছেলেটির পড়াশুনা?

—ওদের পড়াশুনোর দরকার কি? চাকরী-বাকরী ত আর করতে হবে না। তা, শ্যামলাল আপনার গিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বিষয়-আশয়, চাষ-বাস সব নিজে দেখা-শুনা করে। এমন বুদ্ধিমান, চৌখস্ ছেলে এ তল্লাটে নেই।

রজতবাবু কহিলেন—চলবে না মুখুজ্যেমশায়, ও চলবে না। এ ধরণের ছেলে কিছুতেই চলবে না। বলিয়া অনবরত ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। তাতে আবার ম্যাট্রিক পাশ! বি-এ, —এম-এ, হলেও না হয়······ধেনো গেরস্ত-ঘর আর কি। নামের বাহারেই বোঝা গেছে! রামলালের নাতি শ্যামলাল! বাবার নাম বোধ হয় যদুলাল? বলিয়া রজতবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মুখুজ্যে মশায় আর উচ্চ-বাচ্য করিলেন না; নীরবে বসিয়া রহিলেন এবং কিছু পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া সরিয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পর চিত্রা কহিল—কোথায় যে তোমার পছন্দ হবে জানি না।

—তা বলে 'রামলালে'র নাতি 'শ্যামলাল'কে কিছুতেই পছন্দ করতে পারা যায় না। সেকেলে প্যাটার্ণ আর কি! কি ভাগ্যিস, ছিষ্টিধরের নাতি হলধর নয়।

—দেখ, নাম নিয়ে তুমি এ-রকম কর কেন বল ত? উঃ! আমার নাম নিয়ে কি কাণ্ডটাই না করেছিলে! বাপ-মায়ের দেওয়া চিরকালের নাম ছিল 'মহামায়া'। তাকে কি না করলে 'চিত্রা'! কিন্তু আমি যা ছিলুম, তাই আছি। গোলাপের 'গোলাপ' নাম না হয়ে যদি 'ভেরেঙ্গা' নাম হ'ত, তাহলে কি তার আদর কমতো? আর তা ছাড়া, জমি-জমা আছে, পুকুর-বাগান আছে, নাম-করা গেরস্ত,—এ ত ভাল পাত্র।

তুমি ত সবই বোঝ ; চুপ কর।

সুতরাং চিত্রা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিল না ; চুপ করিয়াই রহিল।

ফুলপোতা সোনামুড়ি হইতে দুই-তিন ক্রোশ দক্ষিণে; জয়নগরের সন্নিকটে। ফুলপোতার বসুবংশ এ অঞ্চলে বিশেষ বিখ্যাত। তালুক-মুলুক না থাকিলেও, জমি-জমা, বাগান, পুকুর, জলকর ইহাদের যা আছে, তাহাতে হিসাবমত চলিলে চিরকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহ হইবার পক্ষে যথেষ্ট। বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছাড়া অতিথি-সেবা ও গৃহদেবতার নিত্য-পূজা ত আছেই। বর্ত্তমানে শ্যামলাল ও মিহিরলাল এ বংশের বংশধর। শ্যামলাল বড়, মিহিরলাল ছোট। শ্যামলালের বয়স এখন ছাব্বিশ, মিহিরের সতের। মিহির কলিকাতায় মাতুলের বাড়ীতে থাকিয়া পড়ে ; এইবার ম্যাট্রিক দিয়াছে। শ্যামলাল বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই জননীকে লইয়া দেশে থাকে ; মধ্যে মধ্যে মামার বাড়ী গিয়া মিহিরকে দেখিয়া-শুনিয়া আসে। মামা সত্যবাবু আলিপুর জজকোর্টের একজন পশার-ওলা উকিল। কিন্তু বয়স তাঁহার বত্রিশ অর্থাৎ শ্যামলালের অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় মাত্র। শ্যামলাল সত্যবাবুকে পিতার মত ভক্তি করে, অথচ তাঁহার সহিত লঘু হাস্য-পরিহাস করিতেও অভ্যস্ত। কিন্তু সে রহস্য-পরিহাসের মধ্যে কোন অভদ্রতা বা আবিলতা থাকে না। সত্যবাবুও খুব পরিহাস-রসিক। ভাগিনার সহিত এক দিকে তিনি পুত্রের মত, অপর দিকে বয়স্যের মত ব্যবহার করেন।

মুখুজ্যে মশাই রজতবাবুর কাছে শ্যামলালের পরিচয় দিতে গিয়া যে বলিয়াছিলেন, 'অমন বুদ্ধিমান ও চৌখস ছেলে এ-তল্লাটে নেই'—কথাটা খুবই সত্য। শ্যামলাল ম্যাট্রিক পাশ। পিতা জীবিত থাকিলে এবং সংসার-তদারকের ভার তাহার উপর না পড়িলে, হয় ত সে গ্রাজুয়েট হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইলেও গ্রাজুয়েটের মতই তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি। বাড়ীতে সে অনেক

পড়িয়াছে, সংসার-বুদ্ধি তাহার যথেষ্ট। অথচ সে অত্যন্ত চালাক-চতুর। এক হিসাবে লোকে যাকে 'ডানপিটে' বলে, শ্যামলালকে সে আখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

কিছু দিন হইতে শ্যামলালের জননী তাহার জন্য একটি সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন। ছায়া বাস্তবিকই সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মুখুজ্যে মশায় আসিয়া যখন রজতবাবুর অপছন্দের কথা জানাইলেন, তখন তিনি এ মেয়ের আশা ত্যাগ করিলেন।

মুখুজ্যে মশায় শুধু যে রজতবাবুর অপছন্দের কথাই জানাইলেন তাহা নয়, এই অপছন্দ-সূত্রে তিনি পাত্র সম্বন্ধে যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাও হুবহু জানাইলেন। শ্যামলাল শুনিয়া বলিল—লোকটি বোঝা যাচ্ছে একটু সাহেবী ষ্টাইলের!—আচ্ছা!

জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা মানে?

—মানে, মেয়েটি যদি সুন্দরী হয়, এখানেই ঠিক্‌ঠাক্ করলেই হ'বে।

—তারা করলে অপছন্দ; তুই ঠিক্‌ঠাক্ করবি কি করে?—কিন্তু কথাগুলো শ্যামলালের কাণে প্রবেশ করিল না, তৎপূর্বেই সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহারই দিন চার-পাঁচ পরে এক দিন রজতবাবুর সোনামুড়ির বাসার সম্মুখবর্তী পল্লীপথ দিয়া এক জন 'লেস-ফিতা'-ওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছিল—লেস্ লেবে, জরি লেবে, ফিতা লেবে-এ-এ-এ।

বাড়ীর ভিতরকার একখানি ঘরের মধ্যে মেঝেয়-পাতা সতরঞ্চের উপর শুইয়া চিত্রা কি-একখানা বাংলা মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে গল্প পড়িতেছিল, আর ছায়া পথের দিকের জানালার ধারে বসিয়া একটা ব্লাউজ সেলাই করিতেছিল। ফেরিওয়ালা জানালার ধার দিয়া হাঁকিয়া গেল—ভাল ভাল লেস্-ফিতা—সেফটি-পি-ই-ই-ইন্!

চিত্রা জানালার ধারে আসিয়া লেস্-ওয়ালাকে ডাকিল। লেস্-ওয়ালা জানালার নীচে আসিয়া কহিল—কি চাই মা-ঠাক্‌রোণ?

—তোমার কাছে খুব ছোট সেফটি-পিন আছে ?

—একেবারে সব ছোট পাবেন না মা ! একটা পাতায় ছোট, বড়, মাঝারি মিলিয়ে এক ডজন পাবেন।

ছায়া কহিল—কই, দেখাও ত।

ফেরিওয়ালা তাহার বোঁচকা খুলিল এবং একপাতা পিন বাহির করিয়া ছায়ার হাতে দিল।

চিত্রা দামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ফেরিওয়ালা কহিল—ছ'পয়সা।

ছায়া চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—ছ'প-য়-সা !

—যুদ্ধের বাজারে, দিদিমণি, জানেন ত, এ-সব জিনিষ আর আসে না। আমার আগেকার কেনা ছিল, তাই ছ'পয়সায় দিতে পারব। এ-দামে এখন আর কেউ দিতে পারবে না।

চিত্রা কহিল—আচ্ছা, শোন বাছা ! পাঁচ পয়সায় দাও।

—আচ্ছা, নিন মা। পাঁচ পয়সাই আমার কেনা। সারা দুপুর এই রোদে ঘুরে এক পয়সাও আজ আর বিক্রী করতে পারিনি।

হাত বাড়াইয়া ছায়া সেফটি-পিনের পাতাখানা লইয়া ফেরিওয়ালাকে পয়সা-পাঁচটা দিয়া দিল।

ফেরিওয়ালা পয়সা লইয়া বরাবর দক্ষিণপাড়া অভিমুখে চলিল এবং নতুন পুকুরের ধারে বড় কেয়া-ঝোপটার আড়ালে গিয়া বেশভূষা পরিবর্তন করিয়া মুখুজ্যে মশায়ের বাড়ী প্রবেশ করিল। মুখুজ্যে মশায় কহিলেন—কি হলো ?

শ্যামলাল কহিল—দেখলুম, সুন্দরী বটে।

কয় মাস পূর্বে যাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, কয় মাস পরে একে একে প্রায় সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও কেবল প্রাণের দায়ে এতদিন সকলে ছিলেন ; কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। যেহেতু এই সময়টা বাংলার প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই আমাশয়,

টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির মরশুম পড়িয়া যায়। সুতরাং রজতবাবুও সোনামুড়ি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

চিত্রা কহিল—এইবার উঠে-পড়ে ছায়ার বিয়ের যোগাড় কর। ফের ভাল করে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও।

চোখ দু'টো কপালে তুলিয়া রজতবাবু কহিলেন—বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপনের দিকে আর যাচ্ছি না; কিছুতেই না।

—একবার একটা ঠিকানার ভুল হ'য়েছে বলে আবার—

—না—না—না; বিজ্ঞাপন আমি আর কোন মতেই দোব না। আমি তিন-চারজন ভাল ঘটক লাগিয়ে দিচ্ছি।

তাহাই হইল। রজতবাবু ভাল ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন, এবং ভাল রকম বকশিসের আশা তাদের দিলেন। ঘটকেরা নানা স্থান হইতে নানা রকম পাত্রের সন্ধান আনিতে লাগিল।

একদিন একজন ঘটক একটি পাত্রের সন্ধান আনিয়া রজত-বাবুকে কহিল—আপনার কন্যার উপযুক্ত সৎপাত্র। এ রকম ছেলে হাজারে একটা মেলে কি না সন্দেহ।

পাত্র সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রজতবাবু মনের মধ্যে সন্তোষলাভ করিলেন। ছেলেটি কন্‌ট্রাক্টরী ব্যবসা করে। বিলাতী ডিগ্রী। নিজের বাড়ী, গাড়ী। মাসিক আন্দাজ হাজার টাকা উপায়। কবিরাজ মশায়কে ডাকিয়া রজতবাবু বলিলেন,—কাল সকালে চুপি চুপি গিয়ে একবার দেখে আসুন দিকি—বাড়ীখানা কি রকম। আর আশ-পাশ থেকে যদি একটু সুড়ুক-সন্ধান নিতে পারেন, ত···

দক্ষিণ কলিকাতার 'সাউদার্ণ এভেনিউ'-এর সংলগ্ন নূতন পল্লীতে পাত্রের বাড়ী। পরদিন সকালের দিকে কবিরাজ মশায় ওই পল্লীতে গিয়া ঘুরিয়া আসিলেন; কহিলেন—নতুন দোতলা বাড়ী, ঝক্-ঝক্ করছে। ফটকের দু'পাশে দু'খানা পাথরের 'ট্যাবলেট' লাগানো। একখানাতে বাড়ীর নাম লেখা রয়েছে—'ছায়া-বীথি',

অপরখানায় পাত্রের নাম ইংরেজীতে লেখা—শ্যামল বাসু—A. K. O. S.

প্রসন্ন চিত্তে রজতবাবু চিত্রার কাছে আসিয়া কহিলেন,—এই আমার ছায়ার সত্যিকারের বর। বাড়ীখানার নাম কি জান?

—কি?

—ছায়া-বীথি।

বোঝ একবার! ছায়ার নামেই, আগে থেকেই কি সুন্দর দৈব যোগাযোগের ব্যবস্থা একবার দেখ! ছেলেটির টাইটেল্ হচ্ছে—A. K. O. S.—কোন বিলিতী-টাইটেল্ আর কি। ওঃ! এত দিন পরে···যাক্,—শুভ কাজ সম্পন্ন হ'লে ঘটককে ভাল করে বকশিস্ করতে হবে। আমার পছন্দসই ছেলে এইবার পেয়েছি।

সত্য-সত্যই ছেলেটি যে খুব ভাল, তার আর কোন সন্দেহ নাই। রজতবাবু যেমনটি চাহেন, ঠিক সেইরূপ। আদব-কায়দা দোরস্ত, চট্‌পটে; পাড়াগেঁয়ে-ভূত নয়—খুব অপ-টু-ডেট। লেখাপড়া জানে। কাজ-কর্মে, চাল-চলনে খুবই হুঁসিয়ার; অত্যন্ত সভ্য—অত্যন্ত ভদ্র। এই অল্প বয়সেই দু'হাতে উপায় করিতেছে। কাজ-কর্মের তদারকের জন্য নিজের এক মাতুলকে কাছে রাখিতে হইয়াছে। তিনিও শিক্ষিত। বিবাহের ব্যাপারে, ধরিতে গেলে, তিনিই পাত্রের অভিভাবক।

ঘটকের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। মামা মেয়ে দেখিতে আসিলেন। মেয়ে দেখিয়া তাঁহার এত পছন্দ হইল যে, তাহা আর বলিবার নয়। তিনি রজতবাবুকে ইংরেজীতে বলিলেন—মিষ্টার রায়, আমি স্বপ্নে একটি মেয়ে দেখেছিলাম,—সেই মেয়ে এখন দেখছি—আপনারই এই কন্যা।

রজতবাবুও পরের রবিবার পাত্র দেখিতে গেলেন। বৈঠকখানা ঘরে সাহেবী কায়দায় চেয়ার—টেবিল—সোফা—কোচ ইত্যাদি এসাজানো। রজতবাবু কখানি সোফায় বসিতেই শ্রীমান্ শ্যামল

তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্যামলের দু'-এক জন কর্মচারী ঘরের বাহিরে তাহার অপেক্ষায় ছিল। শ্যামল ধীর ও বিনীত ভাবে রজতবাবুকে কহিল,—আপনি অনুমতি করলে, আমি দু'মিনিট সময় নিয়ে ওদের বিদেয় করে দি। অতঃপর তাহাদের একজনকে ডাকিয়া কহিল—রোববার হলেও আজ যেন কাজ বন্ধ না যায়। ফিনওয়ার্থ কোম্পানী'র বিল আজ তৈরী করাই চাই। ঘুস্‌টিছানী চা-বাগানের ঐ দু'-হাজার 'সকেট' (socket) আজ যেন প্যাক হ'য়ে থাকে। যান, আপনি আর দেরী করবেন না ; চলে যান। —উপেনবাবু !

বাহির হইতে উপেনবাবু ঘরের ভিতরে আসিলে, শ্যামল তাহাকে কহিল—মহারাজার চেকখানা আজ ত আব জমা হবে না ; কালকে ওটা জমা করে দেবেন। বারাকপুরে আপনি যেতে সময় পাবেন কি ? আচ্ছা, খেয়ে-দেয়ে আমিই যাব এখন। 'সোফারে'র ত জ্বর, আমি না হয় ভাড়াটে ট্যাক্‌সি করেই যাব এখন।

উপেনবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্যামল উঠিয়া গিয়া 'ফোন্'টা ধরিল—পার্ক টু ওয়ান ফাইভ ওয়ান্, প্লিজ।...হ্যালো !...আমি শ্যামল।...না না, মোটেই তা নয়।...সবই আমি জানি। সত্যিই বলছি...মহারাজার কাজটার জন্য খুব ব্যস্ত আছি।...আচ্ছা আচ্ছা।...হাজার পনর টাকা না হয় আমিই দোব এখন।...আচ্ছা নমস্কার।

অতঃপর পাত্র দেখিয়া এবং পাত্রেব সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া, প্রসন্ন মনে রজতবাবু গৃহে ফিরিলেন। চিত্রাকে কহিলেন—পাকা-দেখার বন্দোবস্ত করে এলুম। বেশী আর দেরী করা নয়। ২৬শে ভাল দিন আছে ; ঐ দিনেই——কি বল ?

বেহারী আসিয়া খবব দিল—একটি ভদ্রলোক এসেছেন। রজতবাবু নীচে নামিয়া আসিযা ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

—আইজ্ঞা, বারী আমার ফরিদপুর। অনেক দিন্যার একডা পুরাতোন বিজ্ঞাপন দেইখ্যা আপনার লগে সাইক্ষাৎ করবার্ আসছি। আপনাগোর গোটা কাণা মাইয়ার···

—ওঃ! এত দিন পরে! সে ত হ'ল গিয়ে···

—হঃ, অনেক দিনই অইয়া গেল। দোকান থাহি আরাই পোয়া লবণ আন্‌ছিলাম টোঙ্গার মইধ্যা। সেই টোঙ্গাটার গায়ে ছিল ঐ বিজ্ঞাপন। তাই পাঠ কইরা জান্‌তি পারি। তা, আপনাগোর সে মাইয়ার যত্তপি এখনো বিয়া না হইয়া থাহে, ত ··

রজতবাবু হাসিবেন কি কাঁদিবেন, কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না; কহিলেন—আপনি এখানে থাকেন কোথা···

—থাহি আমি উল্টাডিঙ্গি; নবীন সোমদ্দারের আরত জানেন ত? পোলাটিও আমার সাথে থাহে। কি আর কইবো? পোলা মোর এক্কেবাইর্যা যেন কার্তিক; ম্যাট্রিক পাশ কইর্যা···

মনে মনে হাসিয়া রজতবাবু কহিলেন—তাহলে ছেলে ত আপনার উপযুক্ত পাত্র। তা, আপনি এক কাজ করুন। ৩০নং বনমালী ষ্ট্রীটে যান; সেইখানে ওঁরা থাকেন—বলিয়া ব্যাপারটা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং তাঁহার সহিত আর বেশী বকা-বকি না করিয়া, একটা ছোট নমস্কার জানাইয়া ভিতরে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে সব ঠিক-ঠাক হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের দেনা-পাওনার কথা, পাকা-দেখা ইত্যাদি কিছুই আর বাকী নাই। আগামী ২৬শে তারিখে বিবাহ। উভয় বাড়ীতেই ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে। বর-পক্ষ নগদ সম্বন্ধে কিছুই পীড়া-পীড়ি করেন নাই; কন্যাপক্ষের অভিরুচির উপর নির্ভর করিয়াছেন। কন্যা-পক্ষ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট-চিত্তে দুই হাজার টাকা নগদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

একটা আনন্দময় আবহাওয়ার মধ্য দিয়া পরের কয়টা দিন কাটিয়া গেল।

২৬শের প্রভাত।

মামা কহিলেন,—হ্যাঁ রে শ্যামা, নতুন বাড়ীখানা আমার ভেঙ্গে-চুরে ত তচ্-নচ্ করলি। তা ঐ দু' হাজার টাকা যা পাবি, আমায় দিবি ; বুঝলি ?

—কি তচ্-নচ্টা করলুম, মামা ?

সত্যবাবু কহিলেন—আমার নামের 'ট্যাবলেট' দু'খানা ফেললি খুলে ; খুলতে গিয়ে ত একখানা গেল ভেঙ্গে। ও আবার নতুন করে করাতে হবে। তারপর আবার ট্যাবলেট দু'খানা লাগাতে হবে। তারপর ফটকের পাশে কেমন সব ফুলগাছগুলো ছিল, দিলি সব সাবাড় করে ; দিয়ে, তুললি সেখানে এক গ্যারেজ !

—সে ত ভালই করেছি। মোটরখানা তোমার থাকতো অন্য জায়গায়, এখন বেশ···

—না ; অন্য জায়গাতেই আমার ভাল ছিল। তা যাক্, দু' হাজারের ভেতর হাজার-খানেক আমায় দিয়ে দিস্ ; কি বলিস্ ?

হাসিতে হাসিতে শ্যামলাল কহিল—ভাগ্নের টাকা, যদি নিতে পার—নিও, আমার কোন আপত্তি নেই।

—আপত্তি আমারও নেই। 'জন জামাই ভাগনা—তিন নয় আপনা'—সুতরাং পরের টাকা নেওয়ায় কোন দোষ নেই। তারপর···

এমন সময় মিহির আসিয়া সত্যবাবুকে কহিল—মা তোমাকে ডাকছেন, মামা !

সুতরাং সত্যবাবুর কথা তারপর আর শেষ হইতে পাইল না ; উঠিয়া ভিতরে গেলেন। তাঁর তারপর-এর জের টানিয়া এ ঘটনারও বিশেষ আর কিছু বলিবার নাই। শুধু একটুমাত্র বলা যায় যে—তারপর—শুভলগ্নে, শুভক্ষণে, আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শুভকাজ নির্বাহ হইয়া গেল। বিবাহ হইয়া গেলে বর-কন্যা বাসর-ঘরে আসিল। বাসর-ঘরে অনেকেই জমিয়াছিলেন ; কিন্তু রাত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যখন সকলে একে-একে উঠিয়া গেল, তখন শ্যামলাল তাহার সিল্কের সার্টের পকেট হইতে একটা প্যাকেট বাহির করিয়া

ছায়ার কোলের উপর রাখিয়া কহিল—ছোট সেফটি-পিন চেয়েছিলে, —এই নাও; কিন্তু পাঁচ পয়সা ডজন-এ এ-জিনিষ দিতে পারা যাবে না। জান ত যুদ্ধের বাজার।

ছায়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া ঘোমটা-টা আরো খানিক টানিয়া দিয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

*　　*　　*　　*　　*

পাঁচ-সাত দিন পরে।

শ্বশুর জামাই মুখো-মুখি বসিয়া।

—হ্যাঁ বাবা, নামটা তোমার গোপন করেছিলে কেন?

—আজ্ঞে, গোপন করিনি। একজন জ্যোতিষী বলেছিলেন, দু'টো ল পর-পর থাকা ভাল নয়। তাই মাঝের ল'টা তুলে দিয়েছিলুম।

—ঠাকুরদাদার?

—ঠাকুর্দার রাশ-নামটাই তখন মনে পড়লো, তাই বলেছিলাম—ভবানী বোস।

—দেশের নাম যখন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, ফুলপোতা না বলে জয়নগর বলেছিলে কেন?

—ফুলপোতা ছোট গ্রাম। ফুলপোতা বললে ত কেউ বুঝবে না। আমাদের ও-অঞ্চলের সব গাঁয়েরই ডাক হল জয়নগর; তাই—

—আর A. K. O. S. 'টা?

—ওটা হোল—অল্ কাইণ্ডস্ অফ অর্ডার সাপ্লায়ার (All Kinds of Order Supplier).

প্রসন্ন হাস্যের সহিত রজতবাবু কহিলেন—যাই হোক বাবাজি, জিত কিন্তু আমারই। ছায়া পূর্বজন্মের সুকৃতিবলে উপযুক্ত হাতেই পড়েছে। তুমি বাবা রত্ন ছেলে! ৭০০ বিঘে ধান-জমির মালিক তুমি, তা'ছাড়া ২২টা মাছভরা পুকুর, বাগান-বাগিচে। অন্ন-লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা। তা'ছাড়া কত বড় বংশের বংশধর

তুমি, তা এইবার জানতে পেরেছি। গোড়াতে আমি বিষম ভুল বুঝেছিলুম। আমার পরম ভাগ্য যে তোমার মত সব-দিক্-দিয়ে ভাল ছেলের হাতে আমি মেয়ে দিতে পারলুম। আশীর্বাদ করি বাবা, দু'জনে তোমরা চিরসুখী হও।

হেঁট্ হইয়া শ্যামলাল রজতবাবুর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

———

সত্যযুগ

গত শ্রাবণ মাসের মাঝা-মাঝি হইতে সত্যযুগ পড়িয়াছে। মাঠে-ঘাটে-হাটে সর্বত্রই সত্যযুগ পড়ার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। মাঠের খবরটা সকালেই কানে আসিল—হারাধন নন্দীর দোকানে। দু'-চার পয়সার সওদা আনিতে গিয়া দেখি, দোকানের সম্মুখে বেজায় ভীড় জমিয়াছে, আর সেই ভীড়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ও-পাড়ার দীনু চক্কোত্তি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া হা-হুতাশ করিতেছেন। তাঁহার পশ্চিম-মাঠের দেড়-বিঘা আউস-ক্ষেতের সমস্ত ধান গত রাত্রে কে বা কাহারা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। সে-দিনের পর হইতে প্রায় প্রত্যহই মাঠে-মাঠে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে মাঠের ভূত গ্রামের গৃহস্থদের ফল-পাকড়ের গাছে-গাছেও হানা দিতে সুরু করিল। আমার খিড়কীতে দুই কাঁদি মর্তমান কলা ও মাচায় সাতটা চাল-কুমড়া ফলিয়াছিল। সত্যযুগের ভয়ে সেগুলি অপরিপক্ক অবস্থাতেই গাছ হইতে গৃহজাত করিলাম।

সে-দিন মোড়ল-পুকুরে স্নান করিতে গিয়া ঘাটেও সত্যযুগের আভাস পাইয়া আসিলাম। হরি মুখুয্যে মশায় স্নান করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঘাটে উঠিতেছিলেন আর রাজা বাগ্দীর ছেলে নেড়া বাগ্দী স্নানের উদ্দেশে ঘাটে নামিতেছিল। অসতর্কতা বশতঃ মুখুয্যে মশায়ের পা নেড়া বাগ্দীর গায়ে লাগে। সঙ্গে-সঙ্গেই নেড়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মুখুয্যে মশায়ের দিকে চাহিয়া কহিল,—একটু ভদ্রতা-জ্ঞান আপনাদের নেই! গায়ে যে পা-টা লাগলো, তার জন্য একটু লজ্জিত হওয়া নেই, একটু দুঃখ প্রকাশ করাও নেই! আস্পদ্দাটা আপনাদের যত দূর বাড়বার তত দূর বেড়েচে!

মুখুয্যে মশায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—সে কি রে নেড়া! তোর গায়ে আমার পা লেগেছে, তার জন্যে লজ্জাই বা কিসের, আর দুঃখ প্রকাশই বা কিসের! তোব বাবা যে দিনে দশ বার করে পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিত!

—বাবার মাথা খারাপ ছিল বলে আমাদের ত মাথা খারাপ নয়! আর তা ছাড়া 'নেড়া' 'নেড়া' বলে সম্বোধন করছেন, সেটাও খুব দোষের কথা; আমার আসল নাম ত আর 'নেড়া' নয়; আমার নাম নরেন—নরেন্দ্রনাথ মারিক।

রাজা বাগ্দী মারা যাইবার সময় নেড়ার বয়স ছিল বারো বছর। সেই সময় সে এক বাবুর ভৃত্যরূপে কলিকাতায় গিয়া বাস করে। এখানে সে পাঠশালায় পড়িত; সুতরাং কিছু কিছু বাঙলা লিখিতে ও পড়িতে পারিত। তারপর বারো-তেরো বৎসর কলিকাতায় থাকিবার ফলে সে দুই-দশটা ইংরাজী বুক্‌নিও বলিতে শিখিয়াছে এবং সম্প্রতি কিছু দিন হইতে ত্রিশ টাকা মাহিনায় 'এ, আর, পি'র কি-একটা কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে শুধু রাজা বাগ্দীরই যে মাথা খারাপ ছিল তাহা নয়, হরি মুখুয্যে মশায়েরও মাথা খারাপ বলা যাইতে পারে। কলিযুগে যাহা চলিত, এখন সত্যযুগে যে তাহাই চলিবে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং হরি মুখুয্যের দিকে চাহিয়া আমি একটু হাসিতে হাসিতে কহিলাম—আপনারই দোষ হয়েছে, মুখুয্যে মশাই। পরে নেড়া বাগ্দীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম—বাড়ী এলেন কবে নরেনবাবু? নমস্কার!

নেড়া কি উত্তর দিল, সে-দিকে আমার খেয়াল ছিল না, তবে আমার প্রশ্নে তাহার মুখের প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া মনে-মনে সত্যযুগের আভাস পাইলাম।

স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া কৌপীন-বাস পরিলাম। সত্যযুগের এমনি মহিমা যে, ধীরে ধীরে সকলেরই অজ্ঞাতসারে সকলকে সাধু-সন্ন্যাসীর পর্যায়ে আনিয়া ফেলিতেছে। গত বৎসর কলির শেষ মাস-কয়টায় দশ হাত কাপড় পরিয়াছি; তার পর মধ্যে নয় হাত, আট হাত; এক্ষণে কৌপীনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। গৃহিণী অভয়া দালানের এক প্রান্তে ঠাঁই করিয়া ভাত দিয়া গেল; উপকরণ—কাঁচকলা ভাতে আর চাল-কুমড়ার ঘণ্ট। হবিষ্যান্নেরই একটু ঊর্ধ্বতন এডিশন। খাইতে খাইতে ঠিক করিলাম, ও-বেলা হাটে

গিয়া আনা-চারেকের মাছ লইয়া আসিব, যে-হেতু দীর্ঘ দিনের একঘেয়ে নিরামিষ মুখটা বদলানো দরকার। সুতরাং আহারান্তে একটু গড়াইয়া গাত্রোত্থান করিলাম এবং 'সবে ধন নীলমণি'—দুইটি টাকার একটিকে পকেটে ফেলিয়া হাটের পথে যাত্রা করিলাম।

নদীর পোলের বটতলায় আসিয়া দেখি, দু'জন লোক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামের চৌকীদার নীলু সর্দার তাহার নীল রংয়ের জামা আর পাগড়ী পরিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলাম, সত্যযুগ পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই বহু পুণ্যাত্মা প্রত্যহ স্বর্গে গমন করিতেছে। আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পথিপার্শ্বে একটা গাব-গাছের তলায় পাঁচ-সাত জন কঙ্কালসার স্ত্রী-পুরুষ সজিনা-পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্তূপাকার করিয়াছে, সম্মুখে একটা হাঁড়ীতে ভাতের ফ্যান্ থাকায় তদুপরি মাছি ভ্যান্-ভ্যান্ করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক শুষ্ক ডাল-পালা দিয়া আগুন তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বুঝিলাম সজিনাপাতাগুলি সিদ্ধ করিয়া, ফ্যান্ সংযোগে সকলে আহার বা অর্ধাহার দ্বারা সত্যযুগের প্রাণটাকে রাখিবার চেষ্টা করিবে। সত্যযুগ পড়িয়া অবধি এ দৃশ্য নিত্যই যথা-তথা দেখিতেছি ; সুতরাং ইহাতে নূতনত্ব কিছু না থাকায় মন ততটা আকৃষ্ট করিতে পারিল না। হাটের পথেই অগ্রসর হইলাম।

হাটে গিয়া দেখিলাম, মাছ যদিও এখন পর্যন্ত ভরি-দরে বিক্রয় হয় নাই, সের-দরেই হইতেছে, তথাপি মাছ কিনিতে অনেকটাই ঘোরা-ঘুরি করিতে হইল। কিন্তু মাছ লইবার পর দাম দিতে গিয়া একেবারে তিন পাক চরকী ঘুরিয়া গেলাম। এক হাজার তিন শো ঊনপঞ্চাশ বছরের মধ্যে পীরপুরের এই হাটে যা কখনো হয় নাই, তাহাই হইয়াছে। পকেট হইতে টাকাটি বেমালুম অন্তর্ধ্যান হইয়াছে। কলিকাতার বড়বাজার নয়, হ্যারিসন রোড নয়, কালীঘাটের কালীবাড়ী নয়, এসপ্লানেডের মোড় নয়, হাওড়া-শিয়ালদার ষ্টেশন নয়, জেলা নদীয়ার অজ পাড়া-গাঁ পীরপুরের

হাট। উঃ, সত্যযুগের পুণ্য-প্রকোপ হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিলাম এবং গোড়াতেই তাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, মাঠে-ঘাটে-হাটে সর্বত্রই সত্যযুগ পড়ার লক্ষণ সুপরিস্ফুট!

রিক্তহস্ত এবং অতিরিক্ত মনোভাব লইয়া হাট হইতে বাটী ফিরিলাম। তিন ঘটী জলের তেষ্টা পাইয়াছিল, এক ঘটী জল খাইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া-শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি করা যায়। এ দুর্দিনে দু'টো প্রাণকে কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায়। পাঁচ বিঘে 'ভাগরা' জমির অর্ধেক ধান ত ভবিষ্যতের সম্বল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাঠের সে-ধান যে ঘরে এসে পৌঁছাবে তার কোন আশা নেই। হারাধন নন্দী দোকানের 'উঠনো'ও বন্ধ করেচে। ঘরে এক রতি সোনা-দানাও নেই যে এ-সময় তা বিক্রী করে দু'চার মাস চালাবো। সুতরাং…। যত দিক দিয়ে যত রকম চিন্তা করি, সকল চিন্তায় শেষে ঐ 'সুতরাং'-ই আসিয়া পড়ে এবং সবগুলি 'সুতরাং' এক জোট হইয়া অঙ্গুলি নির্দেশে শুধু দেখাইয়া দিতে থাকে—কলিকাতার পথ।

পরদিন অভয়া বিমর্ষ মুখে কহিল—এ রকম করে কত দিন আর চলবে?

হর্ষোৎফুল্ল মুখে আমি কহিলাম—বেশী দিন নয়।

—তা হলে উপায়?

—উপায়—কোলকাতা।

—তার মানে?

—তার মানে, এই ভাবে পীরপুরে আমার বসে থাকলে আর চলবে না; কোলকাতায় গিয়ে কিছু উপায়-সুপায়ের চেষ্টা করতে হবে। যা হোক ম্যাট্রিকটা ত পাশ করেচি, একটা কাজ-কর্ম লেগে যেতেও পারে। শুনচি, অনেক আকাট-মুখ্যুও এ বাজারে না কি তরে যাচ্চে।

—কিন্তু আমি একলা কি করে এখানে থাকবো?—স্বরটা একটু ভীতি-জড়িত।

কহিলাম—তুমি হলে অভয়া, তোমার আবার ভয় কিসের।

কথাটা মুখে বলিলাম বটে, কিন্তু মনে-মনে আমারও ওই চিন্তা। অভয়ার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর। এই বয়সে একাকী তাহাকে এখানে রাখিয়া যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। মহা চিন্তার মধ্যে পড়িলাম। এ অবস্থায় সদুপায় কি? একমাত্র সদুপায় আছে, কিন্তু···কিন্তু···। এখান থেকে শ্বশুর-বাটী তিন ক্রোশ দূরে। শ্বশুরের কাছে অভয়াকে রাখিয়া আসিলে হয়, কিন্তু···কিন্তু···। শ্বশুরের অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁর ঘাড়ে অভয়াকে চাপানো উচিত হবে না। এই দুর্মূল্যের বাজারে একটা লোকের খাই-খরচও ত বড় কম নয়। গভর্ণমেণ্টের হিসাবে, একটা মেয়েছেলের রোজ সাড়ে সাত ছটাক করেও যদি চা'ল ধরা যায়, তার সঙ্গে আরো জিনিস আছে, সুতরাং কুড়িটা টাকার কমে তার একটা পেট চলে না। অতএব······

কিন্তু গতকল্যকার 'সুতরাং'-এর যিনি উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, আজিকার 'অতএব' সমস্যারও তিনিই সমাধান করিয়া দিলেন। দিন তিন-চার পরে শ্বশুর মশায় হঠাৎ এ বাটীতে আসিলেন এবং কহিলেন—বাবাজি, তোমার শাশুড়ীর শরীরটা ক'মাস থেকে বড় ভাল যাচ্চে না। এ সময় অভয়া যদি কিছুদিন গিয়ে আমার ওখানে থাকে, তা হলে তার একটু কষ্টের আসান হয়। অবশ্য, তোমার একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু···। তা তোমার মত্ কি বাবা?

অত্যন্ত বাধ্য সন্তানের ন্যায় বলিলাম—নিয়ে যান আপনি। আমার একটু কষ্ট হবে, তা তার জন্যে কিছু আট্‌কাবে না।

সুতরাং মহা সন্তুষ্ট হইয়া পরদিনই শ্বশুর মহাশয় অভয়াকে লইয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন এবং আমিও প্রয়োজনমত বাড়ী চৌকী দিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম। তাহার পর সাতকড়ি পালের নিকট তিন বিঘা ধান জমি বন্ধক রাখিয়া দেড় শত টাকা লইলাম এবং তাহাই সম্বল করিয়া এক দিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতার ট্রেণে চাপিয়া বসিলাম।

*   *   *   *   *

কলিকাতায় আসিয়াছি।

আসিয়া উঠিয়াছিলাম প্রথমে বৌবাজারের এক 'মেস্'-এ। মেস্-খরচা রোজ এক টাকারও বেশী! আতঙ্ক হইল। এরূপ খরচের মধ্যে থাকিয়া কত দিন চালাইতে পারিব? কলসীর জল গড়াইয়া ত খরচ করা। কলসীতে সম্বল ত মোটে একশো পঞ্চাশ ফোঁটা জল। তাহাতে কত দিনই বা চলিবে। মহা চিন্তায় পড়িলাম। কিন্তু—'যে খায় চিনি—যোগান চিন্তামণি।' চিন্তামণিই চিন্তার হাত হইতে বাঁচাইলেন। দিন-পনেরো পরে তাঁর কৃপায় খাই-খরচ ইত্যাদির হাত হইতে এড়াইলাম। বেলেঘাটার এক বাঁশ-খুঁটির গোলায় আমার স্থানলাভ হইল। সেখানে দু'টি ছোট ছেলেকে ঘণ্টা-দুই করিয়া রোজ পড়াইতে হয়; পরিবর্তে আহার এবং থাকিবার জায়গা। আজ একুশ দিন হইল এই বাঁশ-খুঁটির গোলাতেই আছি।

সকালে নেড়া আর ভেড়া—অর্থাৎ ঐ ছেলে দুটিকে পড়াই। দুপুর বেলা আহারাদির পর চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া আসি। বৈকালের দিকটায় কোনদিন কাছের কোনও পার্কে গিয়া বসি, কোনদিন বা গোলার বাইরে বাঁধানো চাতালটায় বসিয়া রাস্তার লোক-চলাচল দেখি। সন্ধ্যায় ব্ল্যাক-আউট-এর কল্যাণে কোথাও বাহির হই না, আপন আস্তানায় বসিয়া, হয় খবরের কাগজ পড়ি, নয় ত বা অভয়ার কথা, পীরপুরের কথা ভাবি।

এক দিন সকালে গোলার মালিক-মশায় একখানা বিল আদায়ের জন্য আমাকে নেবুতলার এক ভদ্রলোকের কাছে পাঠাইলেন। ভদ্রলোকের নাম গুণময় ঘোষ। মস্ত বড় লোক। প্রকাণ্ড বাড়ী। লোকটির নাম গুণময় সার্থক হইয়াছে। এত ধনী লোক, তবু অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। আমি যাইতেই খুব প্রীতিভরে আমাকে সম্বর্ধনা করিলেন; একে ত আমি 'গোলা' লোক এবং গোলার লোক, তায় আবার বাঁশ-খুঁটির গোলা! তবুও

তিনি তাঁর সামনের চেয়ারে আমায় বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার দেশ কোথায় ?

বলিতে যাইতেছিলাম—পীরপুর ; কিন্তু সত্যযুগের ছোট গোছের একটা ঢেউয়ের ধাক্কা আসিয়া মুখে লাগিল। পীরকে একেবারে না ছাড়িয়া একটু হাতে রাখিলাম। বলিলাম—ক্ষীরপুর।

—ক্ষীরপুর ? ২৪ পরগণা জেলা না ?

—আজ্ঞে, না। 'ইতি গজ'র মত না-টা মুখের ভিতরেই উচ্চারিত হইল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপর নির্ভর করিয়াই কাজটা করিয়া ফেলিলাম।

অতঃপর আরও দুই-চারিটা কথার পর তিনি আমার হাতে গণিয়া একখানা দশ টাকার নোট, তেরখানা এক টাকার নোট, দুটা সিকি, তিনটা আনি ও একটা আধ-আনি দিলেন। বিল ছিল তেইশ টাকা এগার আনা তিন পয়সার ; কিন্তু বর্তমান উন্নত যুগ এক তাম্রকূট ছাড়া তাম্র সম্বন্ধীয় সকল জিনিসেরই হতাদর। তাম্রলিপ্ত তাম্রশাসন প্রভৃতি যেমন আজকাল শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়, তাম্রমুদ্রাও তেমনি আজকাল শুধু পাটীগণিতে অঙ্কের খাতায় এবং বিল-এর পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ জন্য বিল তেইশ টাকা এগার আনা তিন পয়সার থাকিলেও ঘোষমহাশয় আমায় দিলেন—তেইশ টাকা এগার আনা দু'পয়সা। কিন্তু পথে আসিয়া গণিয়া দেখি—চব্বিশ টাকা এগার আনা দু'পয়সা। তের খানা এক টাকা নোটের স্থলে চৌদ্দখানা হইতেছে। তিন বার গণনার পরও চৌদ্দ কিছুতেই তের হইতে চাহিল না। অগত্যা ফিরিয়া গিয়া কহিলাম—একটা টাকা আমাকে বেশী দিয়েচেন—বলিয়া নোট কয়খানি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি ভাল করিয়া গণিয়া দেখিলেন যে, একখানা এক টাকার নোট বেশীই দিয়াছেন বটে। আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। কহিলেন—একটু চা খেয়ে যাও। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পুনরায় চেয়ারখানা টানিয়া বসিলাম।

কিছু পরেই একটি রেকাবীতে দুইটি সন্দেশ ও এক কাপ চা আসিল। সন্দেশ যদিও একটু গন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আজকালকার দিনে আমাদের মত লোকের কাছে অমূল্য দ্রব্য! বহুদিন উদরস্থ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। সুতরাং বিকারশূন্য হইয়া সেদু'টি গলাধঃকরণ করতঃ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণের আলাপে, গুণময়বাবুর সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথা-বার্তা হইল। কথায় কথায় জানিতে পারিলাম কলিকাতা কর্পোরেশনের অনেক বড় বড় কর্মচারী ও কাউন্সিলারের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব এবং তাঁহাদের উপর প্রভাব—দুই-ই আছে। কহিলাম—আমি চাকরীর জন্যেই পীর—ক্ষীরপুর থেকে এসেচি। যদি দয়া করে···

—চাকরী? আচ্ছা, লাগিয়ে দেবো তোমাকে। তুমি দিন-দুই বাদে একবার এসো।

আশায় এবং আনন্দে মনটা ভরিয়া উঠিল। দুই দফা নমস্কার জানাইবার পর সে-দিন বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

দুই দিন পরে গিয়া দেখা করিতেই কহিলেন—খুব ভাল জায়গায় তোমার চাকরীর জন্য চেষ্টা করচি। যদি তোমার ভাগ্য ভাল হয় ত লেগে যাবে।

খুব খুশী ও বিনয়ের সঙ্গে কহিলাম—আপনার দয়া হলে আমার ভাগ্য নিশ্চয় ভাল হবে।

আজও চা আসিল। তবে সন্দেশ নয়; তার বদলে দু'খানা বিস্কুট। চা খাইয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, গুণময়বাবু কহিলেন—বড় ভাল ছেলে তুমি বাবা। তোমায় একটা ভাল চাকরীতে লাগিয়ে দিতেই হবে। তুমি রোজই একবার ক'রে আসবে।—সুতরাং নেড়া-ভেড়াকে পড়াবার 'টাইম্'টা সন্ধ্যার পর করিয়া লইয়া রোজ সকালে গুণময়বাবুর কাছে আসিতে লাগিলাম।

একদিন গুণময়বাবু কহিলেন—দেখ নন্দ, তুমি দিন-কতক চাকরটাকে সঙ্গে ক'রে আমার বাজারটা ক'রে দাও দেখি;

চুপ-চাপ বসে থাকা কিছু নয়। একটু খাটলে-খুটলে শরীর ভাল থাকবে। সুতরাং সেই দিন হইতে সমস্ত সকালটা গুণময়বাবুর সংসারে বাজার করা, দোকান করা ইত্যাদি কার্যে কাটিতে লাগিল। কোন কোন দিন এই সব কাজ করিতে অনেক বেলা হইয়া যাইত। একদিন গুণময়বাবু বলিলেন,—তোমার চাকরীর জন্য আবার কাল গিয়েছিলুম। বোধ হয় এইখানেই হয়ে যাবে। এক কাজ কর, দুপুরবেলা চুপ-চাপ গোলায় বসে থেকে ফল কি? খাওয়া-দাওয়ার পর এখানে আসার পক্ষে তোমার অসুবিধা হবে কি?

—আজ্ঞে না, অসুবিধা আর কি!

—তবে আজ থেকে তাই এসো। তোমায় ভাবচি, অন্য আফিসে না দিয়ে কর্পোরেশনেই দিয়ে দি। ও-মাসেই একটা কাজ খালি হবে। সত্তর টাকা মাইনে। এক'শ কুড়ি পর্যন্ত হবে। তোমার কি ইচ্ছে?

—এ চাকরী হ'লে ত খুব ভালই হয়। আর আপনার একটু চেষ্টা থাকলে হবেই।

—আচ্ছা, এইখানেই দেবো এখন লাগিয়ে। তা হলে রোজ দুপুর বেলায় এখানে চলে আসবে, বুঝলে? তোমার উন্নতি হবে বাবা। যারা কাজকে ভয় করে, তাদের কিছু হয় না।

অতএব সেই দিন হইতেই সকালে ত বটেই, অধিকন্তু দুপুর বেলা আহারাদির পরও গুণময়বাবুর গৃহে নিত্য হাজিরা দিতে লাগিলাম।

* * * * *

এক মাস পরের কথা।

আমার বেশ ভাল কাজই হইয়াছে। যাহাকে চাকুরী বলে, ঠিক যদিও তাহা হয় নাই, তবে কাজ হইয়াছে। কাজের আর বিরাম নাই। গুণময়বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া চব্বিশ ঘণ্টাই কাজের পিছনে আমাকে ছুটা-ছুটি করিতে হয়। এই ছুটা-ছুটির পরিবর্তে গুণময়বাবুর বাটিতেই থাকি আর খাই। সুতরাং চাকরী—

অবৈতনিক ; আর ফ্রী কোয়ার্টার—গুণময়বাবুর বৈঠকখানার এক পাশে একখানি তক্তাপোষ। কিছু উপরি পাওনাও আছে। তাহা হইতেছে—গুণময়বাবুর মিষ্ট কথা আর আশার বাণী। এই দুইটি উপরি পাওনার আকর্ষণই আমাকে বেলেঘাটার বাঁশ-খুঁটির গোলা পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিতে বাধ্য করিয়াছে।

সে-দিন দুপুর বেলা বসিয়া বসিয়া একগাদা দলিল-পত্রের নকল করিতেছি, গুণময়বাবু আসিয়া সামনের চেয়ারখানা টানিয়া বসিলেন ; কহিলেন—আর কত বাকী ? করে ফেল বাবা, করে ফেল। এইগুলো কপি করা হয়ে গেলে একবার তোমায় চিৎপুরে সরকার কোম্পানীর দোকানে যেতে হবে।

—কোন দরকার আছে ?

—দরকার বলেই ত একবার যেতে হবে, বাবা। দশটা টাকা ওদের কাছে আমার পাওনা ছিল। সকালে আমি তাই গিয়েছিলুম, টাকাটা ওরা দিয়ে দিলে। কিন্তু কথা কইতে কইতে টাকাটা আমি ওদের বাক্সর ওপর থেকে নিতে ভুলে গেছি। বাড়ী এসে মনে পড়লো যে, টাকাটা ওরা যেমন দিয়েছিল, তেমনি ওদের সেই বাক্সর ওপরেই ফেলে এসেচি।—হ্যাঁ বাবা, বানান ভুল-টুল বেশী হচ্চে না ত ?

—আজ্ঞে, খুব সাবধান হয়েই ত কপি······

—না, না, তুমি খুবই সাবধান, সে আর আমাকে বলতে হবে না। তোমার জন্যে যে আমি কত ভাবি, তা ত তুমি জান না, বাবা! এতদিনে কি আর তোমায় কোনও চাকরীতে ঢুকিয়ে দিতে পারতুম না? তোমায় ত আর আমি পর বলে মনে ভাবি না, ঘরের ছেলে বলেই তোমাকে ভাবি। যে-সে জায়গায় তোমাকে ঢোকাবো না। এমন জায়গায় ঢোকাবো, যেখানে আখেরে খুব উন্নতি আছে। তাই ত কর্পোরেশনের ও-চাকরীটায় তোমাকে আর ঢোকালুম না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় গুণময়বাবু কহিতে লাগিলেন—মিষ্টার টোম্যানের কাছে কাল গিয়েছিলুম। টোম্যান

হল 'বার্টান্ টৌম্যান্ এণ্ড কোম্পানি'র বড় সাহেব। একশ পোঁইষট্টি টাকার একটা পোষ্ট শীগ্‌গিরই খালি হবে। এ কাজটায় লেখাপড়া জানা বেশী চাই না, চাই বিশ্বাস। তোমার জন্যে খুব সুপারিশ ধরলুম, টৌম্যান খুব আশা ত দিলে। সম্ভবতঃ এইখানেই ঠিক লেগে যাবে।

আশার বাণীতে আর মন নাচে না। গোড়া হইতে গুণময়বাবুর মারফৎ বহু আশাই পাইয়াছি; কিন্তু কোনটাই কার্যকরী হয় নাই। কেবল তাঁহার কাজে আমার দিবারাত্র অবৈতনিক পরিশ্রমটাই খুব কার্যকরী হইয়া আসিতেছে। লিখিতে লিখিতে অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। গুণময়বাবু কহিলেন—তা হলে বাবা, বেড়াতে বেড়াতে টাকা দশটা এনে রেখো, আমি একটু ভবানীপুরের দিকে বেরুচ্চি।

—তা হলে একটু শ্লিপ লিখে দিন, নইলে আবার হয় ত···

—ঠিক বলেচ। বিজনেস্ ইজ বিজনেস্। এই সব গুণের জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি। তাড়াতাড়ি গুণময়বাবু একটা শ্লিপ লিখিয়া দিলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরে কপির কাজ শেষ করিয়া আমি চিৎপুরে যাত্রা করিলাম।

সরকার কোম্পানীর দোকানে ইহার আগে গুণময়বাবুর সঙ্গে দু'-একবার গিয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহাদের সহিত আমার আলাপ ছিল। শ্লিপটা দিতেই তাহারা পড়িয়া দেখিয়া আমাকে টাকা দশটা দিয়া দিলেন। নবীন সরকার মশাই দোকানের মালিক। আমার সহিত এ-কথা ও-কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—অনেকদিন ত আপনার কাটলো গুণময়বাবুর কাছে, চাকরী মিললো নন্দবাবু? কথাটার ভিতর একটু রহস্যের সুর ছিল। আমি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলাম—এবার ঠিকই হবে। টৌম্যান কোম্পানির অফিসে। মাইনে একশ পোঁইষট্টি টাকা।—আমার বলিবার ভঙ্গীর ভিতরেও একটা রহস্যের ছাপ ছিল।

নবীন সরকার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; কহিল—গুণময় বাবুর অশেষ গুণের মধ্যে গিয়ে পড়েচেন, চাকরী-সমুদ্রে হাবু-ডুবু খেতে হবে নন্দবাবু! উঃ! একটা 'লোক' বটে! কি করে আপনি ওর খপ্পরে এসে পড়লেন, আমি তাই ভাবি!

—আমিও ভাবি, ধর্ম নেই, কর্ম নেই··· ··

বাধা দিয়া নবীনবাবু বলিলেন—কর্ম খুবই আছে। তবে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান বা বিচার-বিবেচনা—সে সবের ধার ধারেন না। জগতে এসে চিনেছেন কেবল টাকা।

—আর চিনেছেন সাধু-সন্ন্যাসী। তাদের পিছনে ত খুবই ঘোরেন দেখি।

আবার নবীনবাবুর প্রাণ-খোলা হাসির হো-হো-ধ্বনি দোকানের বাতাসকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। কহিলেন—সেটা কিন্তু ভক্তির কাঙ্গাল হিসেবে। কি করে কিছু টাকা মারবেন তাঁদের আশীর্বাদে, ফন্দিটা হচ্চে তাই। বুঝলেন না নন্দবাবু?

আরও দু'-একটা কথা-বার্তার পর উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় নবীনবাবু আমায় বলিলেন,—দেখুন নন্দবাবু, ৬৫নং এজরা পার্কে কতকগুলো লোক নেবে। মাইনেও ভাল। লাগিয়ে দিন ত একখানা দরখাস্ত। ভগবানের দয়ায় যদি······

একটু আশান্বিত হইয়া আফিসের ঠিকানাটা একখণ্ড কাগজের কোণায় টুকিয়া লইলাম এবং আরও দু'-একটা কথার পর উঠিয়া পড়িলাম। নবীনবাবু মৃদু হাসির সহিত কহিলেন—ট্রাম-ভাড়ার পয়সাটাও বোধ হয়···নিশ্চয়ই চরণ-ট্রামে এতটা পথ যাতায়াত···

উত্তরের পরিবর্তে একটু হাসিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম। মনে মনে কহিলাম,—সত্যযুগ! সত্যযুগ!!

* * * * *

আসল সত্যকার সাধু-সন্ন্যাসীরা লোক-কোলাহলের মধ্যে বড়-একটা আসেন না ; কিন্তু উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কখনো কখনো তাঁদের আসিতেও হয়।

এইরূপ একজন সাধু মহাত্মা সম্প্রতি বাগবাজারে আসিয়া আসন পাতিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা যেমন অসীম, শিষ্য এবং ভক্তের সংখ্যাও তেমনি অসংখ্য। তিনি টপ্ করিয়া কাহাকেও ধরা দেন না। সে কারণ লোকের সঙ্গে বেশী কথাও কহেন না। গঙ্গার ধারে ছোট একটি দ্বিতল বাটীতে তিনি থাকেন, বৈকালে ঘণ্টা-দুই সময় ছাড়া তিনি নীচে দর্শনার্থীদের সম্মুখে আসেন না। আমাদের কাণে এ-খবর আসিবার বহু আগেই গুণময়বাবু তাঁহার কথা জানিতে পারেন এবং তাঁহার কাছে আজ কয়দিন ধরিয়া খুবই যাতায়াত করিতেছেন।

সে-দিন দ্বিপ্রহরে গুণময়বাবুর ফরমাসী অনেকগুলি কাজ সারিয়া, বৈঠকখানার একধারে আমার সেই ফ্রী-কোয়ার্টার চৌকিখানিতে ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া শ্রান্ত মনে অনেক কথাই ভাবিতেছিলাম।—অনেকদিন হ'য়ে গেল পীরপুর থেকে এসেছি, কিন্তু কাজকর্মের কোন সুবিধাই ত হ'ল না। মধ্যে অনেকদিন হ'ল অভয়ার একখানা চিঠি পেয়েছিলুম, তারপর অনেকদিন হ'য়ে গেল আর কোন খবর পাইনি। সকলে কেমন আছে, কে জানে। কাল আর একখানা চিঠি দিতে হবে। লিখেছি, এখানে কোন কাজের সুবিধা হচ্চে না, বাড়ী চলে যাব। তোমার হয়ত ওখানে অন্য কোন কষ্ট না হ'তে পারে, কিন্তু······

—কি ভাবচো শুয়ে শুয়ে? ওঠো, চলো।—দেখি, সামনে দাঁড়াইয়া গুণময়বাবু। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিলাম—কোথায়?

—চল, বাগবাজারে 'প্রভু'র ওখানে তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

অগত্যা জামাটা গায়ে চড়াইয়া গুণময়বাবুর সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

বেলা চারিটা নাগাদ 'প্রভু'র ওখানে পৌঁছিলাম। তিনি তখন দুই-চারি জন ভক্ত-পরিবৃত হইয়া নীচের ঘরে বসিয়াছিলেন। দীর্ঘ দেহ, মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়ার বদলে নীল চেলী পরিহিত, তদুপরি

নীল কৌষেয় বস্ত্রের উত্তরীয়, চোখে স্বুবর্ণ ফ্রেমে আঁটা চশমা। আমরা উভয়েই ভক্তিভরে তাঁর পায়ের একটু তফাতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলাম। 'প্রভু' মুখে কোন আশীর্বচন উচ্চারণ করিলেন না; হয়ত মনে মনে করিলেন। তারপরই গুণময়বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সামনের প্রাঙ্গণে যেখানে একটা জলের ট্যাপ্ ছিল, সেইখানে গেলেন। আমাকে ইসারা করাতে আমিও গেলাম এবং তাঁহার দেখাদেখি কর-পুটে খানিকটা কলের জল লইয়া উভয়ে হাঁটু গাড়িয়া 'প্রভু'র সামনে আসিয়া বসিলাম। 'প্রভু' তখন দক্ষিণ-পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই জল স্পর্শ করিয়া দিলেন এবং আমরা উভয়ে তাঁর সেই চরণামৃত পান করিলাম। আশ্চর্যের বিষয়—অদ্ভুত এই চরণামৃত! ইহা যে স্বর্গীয় বস্তু, সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার পরিচয় পাইলাম। কর-পুটের সেই অতি সাধারণ কলের জল স্বুমিষ্ট আস্বাদযুক্ত এবং সদ্য-প্রস্ফুটিত যূথিকা-গন্ধে আমোদিত হইয়া গিয়াছে। মুগ্ধ প্রাণের সমস্ত আকর্ষণে পুনরায় অশেষ শ্রদ্ধাভরে প্রভুর পদতলে উভয়ে প্রণাম করিলাম।

ডুই-ডুই বার প্রণামের ফলে কিন্তু কোনও আশীর্বাদ-বাণী আমাদের ভাগ্যে শুনিতে পাইলাম না। প্রভু কাহারও সহিত কোন-রূপ বাক্যালাপ না করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। শুনিয়াছিলাম, এইরূপই তাঁহার স্বভাব। যখন ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন, খুবই বলেন; আবার যখন বলেন না, তখন কিছুই বলেন না। হয়ত তখন একঘেয়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাত্র ডু'-একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া আবার নীরবে বসিয়া থাকেন। আজও হঠাৎ মুক্ত ডুয়ারের ফাঁকে পশ্চিমাকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন—অস্ত-রবির কিরণে মেঘের রং-খেলা। এই সোনালী, পরমুহূর্তে রক্তবর্ণ, সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিকে পীত। একদম ক্ষণস্থায়ী! খেলা—মায়া—অনিত্য!

বুঝিলাম—প্রভু সত্যকার একজন দার্শনিক ভাবুক এবং সেই ভাবেতেই বিভোর। আরও খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার

পর গুণময়বাবু ও আমি প্রভুকে বিদায়-প্রণাম জানাইয়া চলিয়া আসিলাম।

পথে আসিতে আসিতে গুণময়বাবু কহিলেন—সাক্ষাৎ দেবতা। এ-যুগে এই ধরণের খাঁটি সাধু বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। অদ্ভুত শক্তি!

—চরণামৃতে ত তার পরিচয় পেলুম।

উৎসাহ-গদ্‌গদ্ স্বরে গুণময়বাবু কহিলেন—পেলে ত? আরও ব্যাপার আছে। চরণামৃতে আজ কোন্ ফুলের গন্ধ পেলে?

—যূঁইয়ের।

—কাল আবার পাবে হয়ত বকুলের। আর একদিন হয়ত পাবে গোলাপের।—একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যে, তা'তে আর কোন ভুল নেই! নইলে আমি তোমার গিয়ে······বেহালা থেকে একটি ভক্ত আসতো, তার ওপর প্রসন্ন হ'য়ে তাকে বোধ হয় লাখ-খানেক টাকা পাইয়ে দিয়েছেন।

আমি কি একটা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, তৎপূর্বেই গুণময়বাবু বলিলেন—আবার কাল আসতে হবে। আসবে তুমি, নন্দ?

আমি আনন্দের সহিত বলিলাম—আপনি যদি দয়া করে আনেন, নিশ্চয়ই আসবো।

অতঃপর নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যার সময় উভয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

পরদিন গুণময়বাবুর কতকগুলা কাজে আমাকে বাহির হইতে হইয়াছিল। বাড়ী ফিরিলাম বেলা প্রায় দুইটার সময়। তারপর স্নানাহার সারিয়া একটু শুইয়াছি, গুণময়বাবু আসিয়া কহিলেন—নন্দ, ওঠ; চল—যাওয়া যাক।—সুতরাং আর বিশ্রাম করা হইল না। জামা জুতা পরিয়া তাঁহার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

এ-দিনও প্রভু ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন। আজিকার চরণামৃতে সত্যই প্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ পাইলাম।

তাঁকে প্রণাম ও তাঁর চরণামৃত পানের পরই আজ তিনি হঠাৎ গুণময়বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—তুই ত অনেক টাকা বাইরে থেকে ঘরে আনবি। ঠিকই আনবি। যা, কিছু টাকা নিয়ে ধানের কারবার চালা গে যা। মাঝে মাঝে আসিস্ এখানে। বিস্তর টাকা পাবি। যা।

বড়ই ইচ্ছা হইল, আমার চাকরীর কথাটা একটু নিবেদন করি! কিন্তু সাহসে কুলাইল না। চুপ করিয়া গুণময়বাবুর পাশে বসিয়া রহিলাম।

* * * * *

শ্যাওড়াফুলী।

ও-দিকে গঙ্গা, সে-দিকে রেল-ষ্টেশন, ও-দিকে গঞ্জ। তারি মধ্যে ছোট-একটা বাসা-বাড়ী ; আর কাছেই করোগেটের স্বতন্ত্র একটা গুদাম-ঘর।

আজ কয়দিন হইল, গুণময়বাবু ও আমি এখানে আছি। ধানের কারবার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে একজন পাচক, আর এখানকার একজন চাকর। শ্যাওড়াফুলী ধান কেনা-বেচার একটা প্রধান কেন্দ্র। উঠিয়া-পড়িয়া ধান কেনার কাজ চলিতেছে ও তাহা গোলা-জাত করা হইতেছে। খাটা-খাটুনী সব আমাকেই করিতে হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। গুণময়বাবু শুধু টাকা লেন-দেনের কাজটা নিজের হাতে রাখিয়াছেন। তিনি তাহাই করেন, আর আমায় আশার উপর আশা, উৎসাহের উপর উৎসাহ দেন। আমায় বলেন—কিসের চাকরী করতে যাবে তুমি! ভেবেছিলুম বটে তোমায় একটা ভাল পোষ্টে লাগিয়ে দেবো। টোম্যান্ কোম্পানীর আফিসে তোমার কাজের একেবারে পাকা-পাকি ব্যবস্থাই করে ফেলেছিলুম। কিন্তু ও-সবে আর হবে কি? এর পর না হয় মাসে তিনশো, কি, বড়-জোর চারশো! ধান-চালের কারবারে তোমাকে আমি আলাদা করে এমন লাগিয়ে দেবো যে, বছরে তোমার অন্ততঃ বারো-চোদ্দ হাজার লাভ হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। একটু সবুর

করে আমার কাছে তুমি থাকো, আর বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে খেটে যাও। খাটুনি নিষ্ফল হয় না কখনো।

সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে বেশ স্ফূর্তির সঙ্গেই গুণময়বাবুর কাজে দিন-রাত খাটিয়া যাইতেছি।

ধান কিনিবার জন্য কোন-কোন দিন আমাকে শ্যাওড়াফুলীর বাহিরেও যাতায়াত করিতে হয়। দক্ষিণে ময়নাপোল, তেঘরা, গুরুদাসপুর, চক্‌মারী; পশ্চিমে হরিরামপুর, নাড়াবোনা, কোড়গাঁ প্রভৃতি কোন-না-কোন গ্রামে আমাকে প্রায়ই যাইতে হয় ও চাষাদের দাদন দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতে হয়। মোটের উপর জোর কাজ চালাইতেছি। এক-একদিন স্নানাহারের সময় পর্যন্ত পাই না। গুণময়বাবু আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। কিন্তু—কিন্তু···

কিন্তু কাজের ফাঁকে এক-একদিন বসিয়া বসিয়া ভাবি। ভাবি, কি উদ্দেশ্য নিয়ে কোলকাতায় এসেছিলুম, আর কি-ই বা করচি। কোথায়-বা অভয়া, আর কোথায়-বা আমি। এতদিন বেলেঘাটার বাঁশ-খুঁটীর গোলায় থাকতুম আর যেমন কাজের চেষ্টা করছিলুম, সেই রকম করতুম, তাহলে হয়ত যা-হোক কোন কাজ এত দিন লেগে যেত। কি কুক্ষণেই যে বিলের টাকা আদায় করতে গুণময় বাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম, আর কি কুক্ষণেই যে চব্বিশ টাকা এগার আনা ছ'পয়সার মধ্যে একটা টাকা তাঁকে ফেরত দিতে গেলাম! এখন আমার অবস্থা সাপের ব্যাং-গেলার মত। গুণময়বাবুকে ছাড়তেও পারি না, রাখতেও পারি না।···বাড়ীর খবরও পাইনি অনেক দিন। শ্বশুর-শাশুড়ীই বা কেমন আছেন; অভয়াই বা কেমন আছে? পীরপুরের বাড়ীরই বা কি অবস্থা—কিছুই জানি না। নিজের অজ্ঞাতে বুক-ফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসের সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়া যায়।

এই সময়টায় হঠাৎ এ-দিকে ধ্বংসের হাওয়া বহিতে সুরু করিল। ঐ সমস্ত গ্রামে মহামারীরূপে কলেরা দেখা দিল। শ্যাওড়াফুলীর

চারি দিককার গ্রামগুলি হইতে প্রত্যহ মৃত্যু-সংবাদ কাণে আসিতে লাগিল। আমাকে প্রায় প্রত্যহই ঐ সমস্ত অঞ্চলে যাইতে হয়। আমার একটা আতঙ্ক হইল। গুণময়বাবু বোধ হয় সেটা বুঝিতে পারিয়া আমায় কহিলেন—প্রভুর কৃপায় আমাদের কোন বিপদ হবে না, নন্দ। কিছু ভয়-টয় করো না। স্ফূর্তির সঙ্গে কাজ করে যাও। মনে মনে কহিলাম—প্রভুর কৃপা—সে ত আপনার ওপর, আমার ওপর ত নয়। যাই হোক্—জোর করিয়া মনে বল আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং নিয়তই নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, লেবু-নুণ-জল খাইতে লাগিলাম আর রুমালে কর্পূর বাঁধিয়া মাঝে-মাঝে শুঁকিতে লাগিলাম।

দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই আশ-পাশের গ্রামগুলির অবস্থা ভীষণতর হইয়া উঠিল। সে দিন ভোরে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমাকে পাঁচপুকুর গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষকের বাটী যাইতে হয়। কিন্তু গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে অন্তরাত্মা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ আগে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূটিকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আমি যখন গিয়া পৌঁছিলাম, তখন তাহার মৃত ভগিনীটিকে বাঁশের সহিত বাঁধা হইতেছে। ওদিকে একটি ঘরের বারান্দায় মেজ ছেলেটি এই কাল-রোগের সঙ্গে শেষ লড়াই করিতেছে। আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। ভয়-কাতর অন্তরে তাহার বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। পাশের গ্রামে গিয়া দেখিলাম, সেখানেও সমান অবস্থা। এমন গৃহ নাই যেখানে এই কাল-ব্যাধি তাহার ধ্বংসের হাত প্রসারিত করে নাই। চক্‌মারী গ্রামে একটি সধবা স্ত্রীলোক কাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছে; তাহাকে আজ এত বেলা পর্যন্ত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় নাই। কারণ, এ বিপদের সময় গৃহে তাহার দ্বিতীয় লোক নাই। আজ কিছু দিন হইল, অভাবের তাড়নায় স্বামী তাহাকে একাকী রাখিয়া কলিকাতায় কাজের চেষ্টায় চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর এই নিদারুণ সংবাদ সে কিছুই জানে না। অভাগিনী আজ এই অবস্থায়……

মনটা আমার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সমস্ত দেহ-মন অবসন্ন হইয়া পড়িল; মাথার ভিতরটা সহসা যেন খালি হইয়া গেল। পথের ধারের একটা তেঁতুল গাছের তলায় আমি বসিয়া পড়িলাম।

প্রায় মিনিট-পনেরো এই ভাবে নির্জীবের মত বসিয়া থাকিবার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম। চারি দিকের আঁধার কাটিয়া গিয়া আবার চোখের সামনে সূর্যালোক ফুটিয়া উঠিল। তখন আমার মনে কেবলই অভয়ার কথা, পীরপুরের কথা জাগিতে লাগিল। পাখীর মত যদি আমার পাখা থাকিত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই আমি পীরপুরে চলিয়া যাইতাম। ওঃ! অভয়াকে রাখিয়া কেন আমি চলিয়া আসিলাম! আর নয়; খুব ভুল করিয়াছি। আর এখানে কিছুতেই থাকিব না।—অবসাদগ্রস্ত মনের মধ্যে একটা জোর আনিয়া তেঁতুল-তলা হইতে উঠিয়া পড়িলাম ও শ্যাওড়াফুলীর গঞ্জের দিকে যাত্রা করিলাম।

বাসায় যখন ফিরিলাম, বেলা তখন প্রায় দুইটা। দেখিলাম গুণময়বাবু বাসায় বা গুদামে নাই। ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, আটটার ট্রেনে তিনি কলিকাতা গিয়াছেন, সন্ধ্যার পরই ফিরিবেন।

সন্ধ্যার কিছু পরেই তিনি ফিরিলেন। কহিলেন—আরো হাজার-দুই টাকার দরকার, তাই আজ আনবো বলে গেলুম। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুললুমও বটে, কিন্তু আসবার সময় তাড়া-তাড়িতে আনতে ভুলে গেছি। তোমার মা-ও মনে করে দিলে না, আমিও একেবারে ভুলে······যা'ক্, শুক্রবার আবার ত আমায় যেতে হবে, সেই দিনই আনবো। দেখ বাবা, তোমাকে কাল ফার্ষ্ট ট্রেনে একবার মগরার গঞ্জে যেতেই হবে। কালকের ধানের দরটা ওখানকার জেনে আসবে।

দেহ মন দুই-ই খুব খারাপ ছিল; সুতরাং সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

* * * * *

বেলা অনুমান সাতটা সাড়ে-সাতটা হইবে।

শ্যাওড়াফুলী ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারী করিতেছি, মগরার গঞ্জে যাইতে হইবে। টিকিট কেনা হইয়া গিয়াছে। টিকিট করিয়াছি কিন্তু মগরার নয়, করিয়াছি —কলিকাতার। রাত্রে শুইয়া অনেক ভাবিয়াছি। ভাবিয়া ঠিক করিয়াছি—আর নয়, আজই কলিকাতা এবং তথা হইতে দেশে চলিয়া যাইব। একটু পরে ট্রেন আসিলে তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। বাসা হইতে চা খাইয়া আসিবার সুবিধা হয় নাই; সুতরাং হাওড়ায় নামিয়া চায়ের চেষ্টায় একটা দোকানে ঢুকিলাম। ঢুকিয়া দেখি, 'সরকার কোম্পানি'র সেই নবীন সরকার একখানি চেয়ারে বসিয়া চায়ের অপেক্ষায় আছেন। তিনি বর্ধমান যাইবেন। গাড়ীর এখনো দেরী আছে।

চা খাইতে খাইতে গুণময়বাবুর ও তাঁহার ধানের ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কথার মধ্যে তিনি বলিলেন—বাগবাজারের সেই 'প্রভুবর' চম্পট দিয়েচেন যে! গুণময়বাবুকে বলবেন।

আমি বলিলাম—কে প্রভুবর? যাঁর কাছে উনি···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওঁর কাছ থেকেও তিনি বেশ-কিছু বাগিয়ে নিয়েছেন। লোকটা আচ্ছা ভোল্ নিয়ে বসেছিলো। বহু লোককে চরণামৃত খাইয়ে বোকা বানিয়ে তল্পী গুছিয়ে দে চম্পট।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিলাম—বলেন কি!

—বলছি ঠিকই। আমাদের দু'একটি বন্ধুও তাঁর কাছে জমে গেছলেন কি না। খবর আমার কাছে এড়াবার জো নেই। লোকটা মহা ধড়িবাজ! অনেকের অনেক-কিছু নিয়ে সট্‌কেচে। পড়ে আছে তাঁর ঘরে শুধু একরাশ 'স্যাকারিন্' আর 'সেণ্ট'-এর খালি শিশি।

মনের এই অবস্থাতেও খুব বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। উঃ! সত্যযুগ যে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ঠিকই সত্যযুগ!

কিছু পরে ট্রেনের সময় হইয়াছে বলিয়া নবীন সরকার উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—এজরা পার্কে সেই দরখাস্ত করবার কথা বলেছিলুম, করেছিলেন?

দরখাস্ত যে করা হয় নাই, সে কথাটা আর না বলিয়া শুধু ঘাড় নাড়িলাম। নবীনবাবু সে দিকে আর লক্ষ্য না করিয়া দ্রুতপদে প্লাটফর্মের দিকে চলিয়া গেলেন।

এজরা ষ্ট্রীটের ঠিকানা ও অফিসের নাম একটা কাগজে আমার লেখা ছিল। পকেট-বুক হইতে সেখানা বাহির করিলাম। এ কাগজখানা গুণময়বাবুর লিখিত সেই শ্লিপ, যাহাতে তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন—'টাকাটা ফেলে এসেচি; নন্দকে পাঠালাম, উহার হাতে দিয়া দিবে। ইতি শ্রীগুণময় ঘোষ।' শ্লিপটায় সরকার বাবুদের কাহারো নাম অথবা কাহাকেও সম্বোধন ছিল না। তাড়া-তাড়িতে সংক্ষেপ লেখা। কাগজের টানা-টানির জন্য সে-দিন এই শ্লিপখানার পিছনের পিঠে এক কোণাতেই এজরা ষ্ট্রীটের ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

সত্যযুগের প্রভাব বলিয়া হঠাৎ মাথায় একটা সৎ-মতলব আসিল। সুতরাং আর দেরী না করিয়া বরাবর গুণময়বাবুর গৃহে গেলাম। গিন্নী-মা আমাকে দেখিয়া কহিলেন—টাকা ফেলে গেছেন, সেই জন্যেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন!

আমি অতিমাত্র নিরীহের মত কহিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলা বাহুল্য, তৎপূর্বে খুব ভক্তিভরে তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়াছিলাম।

গিন্নীমা কহিলেন—কিছু লিখে দিয়েচেন?

—হ্যাঁ মা।—বলিয়া সেই শ্লিপটা তাঁহার হাতে দিলাম। কহিলাম —পরের ট্রেনেই ফিরে যেতে বলেচেন। ফিরে গিয়ে সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবো। টাকার জন্যে সব কাজ আটকে আছে।

সুতরাং······খুব সুন্দর 'সুতরাং'! সত্যযুগের সামান্য একখানি শ্লিপ আমাকে নগদ দু'টি হাজার টাকা জোগাইয়া দিয়া, সুস্থ তবিয়তে এবং খোশ মেজাজে সেই দিনই পীরপুরে পৌঁছাইয়া দিলেন। দেশের ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে আমি সত্যযুগের মহিমা কীর্তন করিলাম

মামা-ভাগনে

হাওড়া-আমতলা রেলপথে শীতলপুর গ্রাম। এই গ্রামের হাট-তলায় অক্ষয় ঘোষের মুদীখানায় এক দিন সকালে গ্রামের পাঁচ জন বসিয়া অন্যান্য দিনের মত তামাক পোড়াইতে পোড়াইতে গল্প-গাছা করিতেছিল।

নীলু গোঁসাই কহিল—'চেতাবনী'র কথা সবই যখন প্রায় খেটে আসচে, তখন কলিযুগের যে শেষ এবং সত্যযুগ আসন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইহাদের সকলের মধ্যে সুরেশ হালদার ছিল বয়সে নবীন। সে এবার আই. এ. পরীক্ষা দিয়া, তুই বৎসর পরে গ্রামে আসিয়াছে এবং তাহার দ্বারা জগতের কি-একটা অসাধারণ এবং শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পন্ন হইবে, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া, যেন তাহারই অপেক্ষায় তাস, ফুটবল, দিবানিদ্রা, নভেল, খোস-গল্প, পাঁঠা মারিয়া 'পিক্‌নিক্' প্রভৃতি কার্যে দিনাতিপাত করিতেছে। নীলু গোঁসাইএর কথায় সুরেশ কহিল—যত সব নন্‌সেন্স্! কতকগুলো বাজে কথা নিয়ে বেশ-কিছু বই বিক্রী করে নিলে। যেমন বোকা দেশ।

নীলু গোঁসাই ফোঁশ্ করিয়া উঠিল—তু'পাতা ইংরেজী পড়ে এমন ভাবে গোল্লায় যেয়ো না। তবে কিনা এটাও ঠিক যে, তু'পাতা পড়েই ত গোল্লায় যাবার কথা! একটু বেশী করে—অর্থাৎ পড়ার মত পড়লে আর······

গোঁসাইয়ের কথাটা কাড়িয়া লইয়া ননী বিশ্বাস সুরেশের দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া কহিল—কিন্তু লেখাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্চে!

সুরেশ হাসিতে হাসিতে কহিল—কি ফলে যাচ্চে?

—এক নম্বর থেকে ধর। প্রথমে এই যুদ্ধেই ত লক্ষ লক্ষ জীবক্ষয়! তারপর ধর, মেদিনীপুরের বন্যা, তা'তে আপাততঃ ঐ

এগার হাজারই ধর। কোথায় ইন্দোচীন, সেখানকার ঝড়েও এগার হাজার। তারপর হালসীবাগানের আগুন……

রমানাথ কহিল—আমেরিকার বোষ্টনে অগ্নিলীলা; সেটা ধর!

—হাঁ। তারপর, টার্কীতে উপরি-উপরি দু' দফা ভূমিকম্প। হাজার হাজার লোক তাতে মরেচে! তারপর বাঙলাদেশের মন্বন্তর! এ আর বিস্তারিত বুঝিয়ে বলবার বোধ হয় আবশ্যক হবে না।

শিবকালী বাঁড়ুয্যের হাতে ছিল হুঁকা। একটা 'সুখটান্' দিয়া শিবকালী কহিল—অপরঞ্চন কিং ভোবিষ্যতিম্! আরো না-জানি কি অঘটন ঘটে!

ননী বিশ্বাস শিবকালীর হুঁকা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া নিজের হুঁকার মাথায় বসাইল এবং একটা জোর দম দিয়া সুরেশের উদ্দেশে কহিল—নাতি, একেবারে শেষ কলির ছেলে তোমরা, এগুলো শাস্ত্রীয় কথা, একটু বিশ্বাস করো। চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো ভাবতে পেরেছিল কি, যে চাল হবে চল্লিশ টাকা মণ?

বৃন্দাবনের আফিং সেবনের অভ্যাস ছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আফিংয়েরও যে এই রকম দুষ্প্রাপ্যতা ঘটবে, এও কি কেউ কখনো কল্পনা করতে পেরেছিল!

নীলু গোঁসাই কহিল—কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা এই যে, চল্লিশ টাকা মণ চাল হওয়া সত্ত্বেও এখনো কাতারে-কাতারে লোক মরচে না কেন?

অক্ষয় ঘোষ এতক্ষণ খরিদ্দার বিদায়ের দিকে ব্যস্ত ছিল; এক্ষণে কহিল—এর মধ্যেও দেবতার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে জানবে খুড়ো-গোঁসাই।

শিবকালী কহিল—ভেতরে-ভেতরে লোক খুবই মরচে, কে কার খবর রাখে বল? এই সেদিন মুন্সীর হাট ষ্টেশনে একটা লোক মর-মর অবস্থায় পড়েছিল। লোকটা না কি ভদ্দর লোক। চৌদ্দ দিন পেটে অন্নজল পড়েনি। তাকে খাওয়াবার জন্যে ভাত-তরকারী

আনা হল। সে কিছুতেই খেলে না। বললে—আমার স্ত্রী-পুত্র না খেতে পেয়ে আমার চোখের সামনে মরেচে, সুতরাং আমি আর নিজেকে বাঁচাবার জন্যে খাব না। তারপর, সেই রাত্রেই লোকটা মারা যায়।

এমন সময় কার্তিক হন্ত-দন্ত হইয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কহিল—ভুঁইপাড়ায় গিয়েছিলুম—এক বীভৎস ব্যাপার দেখে এলুম। তিনজনে একসঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে!

শিবকালী একটু গা-নাড়া দিয়া বসিয়া কহিল—নীলু, শোন—শোন। কি ব্যাপারটা বল ত বাবাজি।

কার্তিক তখন বলিতে আরম্ভ করিল; কেমন করিয়া ভুঁইপাড়ার একজন লোক, তার স্ত্রী আর তার ভাই অন্নাভাবে নদীর ধারের আমবাগানে তিনটা গাছে তিন জনে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে লাগিল। বর্ণনা শেষ করিয়া কহিল—পথে আসতে শুনে এলুম, মাকালপুরের বাবুদের বাড়ী কাল না কি তিনশো প্রজা এসে ধন্না দিয়ে পড়েছিল—খেতে দাও—খেতে দাও!—কিন্তু একটা সুখের বিষয়, ধান আর পাট এবারে যা হয়েচে, এ রকম বহুকাল হয়নি। দু'ধারের সব ক্ষেত দেখতে দেখতে এলুম, মা-লক্ষ্মী যেন সবুজ সাড়ী পরে প্রাণভরা আনন্দেতে হাসচেন! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!

সুরেশ এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; এইবার বলিল—কলিযুগের শেষ যদি, তবে এ রকম সু-ফসল হ'বার ত কথা নয়। আপনাদের 'চেতাবনী' এ বিষয়ে কিছু বলেচেন না কি?

নীলু গোঁসাই কথার শ্লেষটা লক্ষ্য করিল; কহিল,—বলেচেন বই কি। একটু মাথা খাটিয়ে বুঝে নিতে হয়। সত্যযুগ যে আসচে, এ সব তারই লক্ষণ। সূর্য ওঠবার আগে এক দিকে অন্ধকার আস্তে আস্তে সরে যায়, আর এক দিকে একটু একটু করে আলো দেখা দেয়, এ-ও তাই।

অক্ষয় ঘোষ দেখিল, আলোচনা বন্ধ হওয়াই ভাল। সে কার্তিকের দিকে চাহিয়া কহিল—মামার খবর কি গো কার্তিকবাবু? মামীর সঙ্গে ভাবের পালা, না আড়ির পালা?

কার্তিক হাসিতে হাসিতে কহিল—সকালের খবরটা অবশ্য জানি না, তবে কাল রাত্তির পর্যন্ত ত ভাবের পালাই ছিল দেখেছি—বলিয়া কার্তিক সুরেশের হাত ধরিয়া টানিয়া গয়লা-পাড়ার দিকে চলিয়া গেল।

যদি এ কথা সত্য হয় যে, যাহার নাম করা যায়, সে লোক তখনি সেই স্থানে আসিয়া পড়িলে তাহার দীর্ঘজীবন প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কার্তিকের মাতুল শশধর ঘোষাল বহু কাল বাঁচিবে। কেন না, মিনিট-পাঁচেক পরেই ধীরে ধীরে এবং বিমর্ষচিত্তে শশধর দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অপর কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া দোকান হইতে বার আনা দিয়া অর্ধ সের চিঁড়া লইয়া চলিয়া গেল।

কিছু আগে কার্তিককে অক্ষয় যে-প্রশ্ন করিয়াছিল, এই ব্যাপারে সে-প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে, গত রাত্রে ভাবের পালা থাকিলেও, সকাল হইতে শশধর-গৃহিণীর মধ্যে ঝগড়ার পালাই চলিতেছে, নচেৎ দোকান হইতে চিঁড়া যাইত না।

* * * * *

বিয়ের সময় বর-ক'নের নামে এক থালা জলের উপর 'মোনা-মুনি' ভাসানো হয়। 'মোনা-মুনি' বেণের দোকানে বিক্রী হয়; দেখিতে অনেকটা কলার বীচির মত। ভাসিতে ভাসিতে যদি 'মোনা-মুনি' পরস্পর একত্র হইয়া গায়ে-গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দাম্পত্য-জীবনে কখনো গরমিলের সম্ভাবনা নাই। আর যদি 'মোনা-মুনি' পরস্পর না মিলে, তাহা হইলে বর-কন্যার জীবনেও মিল হইবার আশা থাকে না। আর যদি এমনই হয় যে, 'মোনা-মুনি' একবার মিশিতেছে, আবার

পরক্ষণেই দু'টাতে দু'পাশে সরিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, দাম্পত্য-জীবনেও সেইরূপ যাইবে। অর্থাৎ—একবার আলো, একবার অন্ধকার। একবার মিল, একবার অমিল।

পাড়ার বৃদ্ধার দল, যাহারা জানিত, তাহারা বলে—শশধর আর প্রমীলার বিয়ের সময় 'মোনা-মুণী'র অবস্থা শেষোক্ত রূপ ঘটিয়াছিল, তাই এবেলা-ওবেলা উভয়ের মধ্যে ঝগড়া এবং ভাব, ভাব এবং ঝগড়া। আবার অনেকে বলে যে, শুভদৃষ্টির সময়ে কোন দুষ্ট লোক 'মন্দ' করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, শশধর এবং তদীয় পত্নী প্রমীলাবালার মধ্যে মিনিটে-মিনিটে ঝগড়া এবং মিনিটে-মিনিটে ভাব হয়। যেন শরতের আকাশ—এই বৃষ্টি, এই রৌদ্র।

আজিকার সকালের আকাশ ছিল—শুভ্র কাশের আন্দোলনে আন্দোলিত, কুসুম-সুরভিত, রৌদ্র-দীপ্ত, হঠাৎ প্রমীলার একটা কথায় নির্মেঘ আকাশে মেঘ সঞ্চার এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ।

শশধর দালানে বসিয়া আরামের সহিত চুমুকে-চুমুকে চা পান করিতেছিল, আর প্রমীলা সুমুখে বসিয়া পান সাজিতেছিল। পানের উপর সুপারী দিতে দিতে প্রমীলা কহিল—বাবা! সুপুরীর কী দাম হলো!

শশধর কহিল,—সুপুরীর দাম মানে? আর কোন জিনিসের বুঝি দাম বাড়েনি, খালি সুপুরীরই দাম বেড়েচে?

—তাই ত বলচি যে……

—না, তাতো বললে না! বললে, সুপুরীর কী দাম বাড়লো!

—আরে কী মুস্কিল!—তা, বলিচি ত বলিচি, বেশ করেচি।—মেঘ আকাশ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

—বেশ করেছি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

—হ্যাঁ, তত বড় কথা! ইস্! ভারি 'ইয়ে' হয়েচে!

ইহার পরই মেঘ-গর্জন এবং বর্ষণ! প্রমীলা পানের বাটা দেয়ালের গায়ে ছুঁড়িয়া দিল; সাজা পানগুলো ছত্রাকারে ছড়াইয়া ফেলিল; তার পর সারা দালান কাঁপাইয়া শয়ন-ঘরের দিকে

চলিয়া গেল। আর শশধর নিষ্ফল আক্রোশে বসিয়া বসিয়া গর্জাইতে লাগিল।

অনেক বেলায় কার্তিক বাড়ী আসিয়া দেখিল, বাড়ী নিস্তব্ধ। মামী তখন রান্নাঘরের মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। আর মামাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, ভাঁড়ার, গোয়াল, ঢেঁকি-শাল, কাঠের-চালা—কোথাও না। ভুঁইপাড়ার আম-বাগানের কথা ভাবিয়া হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে উদয় হইল। সে তখন তাড়াতাড়ি আর একবার সব ঘরের কড়ি ও আড়াগুলি এবং খিড়কীর বড় বকুল গাছটার ডালগুলা ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া কার্তিক ভাবিতে লাগিল—মামা গেল কোথায়? ঝগড়া-ঝাঁটি ত প্রায় নিত্যই হয়, কিন্তু মামা ত কখনো ঘর-ছাড়া হয় না। কালী ঝি-টাই বা কই?—একটা সুখের কথা, শশধরের পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগিনী নাই; অর্থাৎ তাহার জন্য ভাবিবার কেহ নাই; কিন্তু তবু এমন-এক জন আছে যে, তাহার জন্য ভাবিয়া থাকে এবং সে-একজন হইতেছে—ভাগিনেয় কার্তিক। কিন্তু দুঃখের কথা, লোকে তবু প্রবাদ রটনা করে—'জন, জামাই, ভাগ্না, তিন নয় আপ্না।

কিন্তু যাহাই হউক, কার্তিকের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় নাই। সুরেশ প্রভৃতি মিলিয়া আজ তাহারা একটা বড় রকমের 'পিক্‌নিক্' করিতেছে। পাঁঠা মারা হইয়াছে। কার্তিকের উপর ঘি-এর ভার। সেই দ্রব্যের সন্ধানেই সে গৃহে আসিয়াছিল। কিন্তু মামাকে কোথাও না পাইয়া যখন সে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল, তখন উপরে চিলের ঘরের মধ্য হইতে প্রবল একটা নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাইল। এ নাসিকাধ্বনি মাতুলের না হইয়া যায় না। কারণ, মাতুলের হ্রস্ব এবং স্থূল দেহের মতই এ ধ্বনির সামঞ্জস্য বর্তমান। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া কার্তিক টিপি-টিপি ছাদে আসিয়া দেখিল, তাই বটে। মাতুল চিৎ হইয়া শয়ান। প্রভূত রোমাবলী-সমন্বিত বিশাল বক্ষের উপর ভিজা গামছাখানি পাট করিয়া

রক্ষিত। এক পাশে চিঁড়ার ফলারের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি পড়িয়া আছে।

তেমনি সতর্ক পদক্ষেপে কার্তিক নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল, মামী তেমনই ঘুমাইতেছে। তখন নিশ্চিন্ত চিত্তে কার্তিক ভাঁড়ারের ভিতর প্রবেশ করিল এবং ঘি-এর ভাঁড়ে যে আধ-সেরটাক আন্দাজ ঘি ছিল, সঙ্গে আনীত একটি এলুমিনিয়ম পাত্রে তাহা ঢালিয়া লইল এবং মাটির ঘি-এর ভাঁড়টি তিন টুকরায় ভাঙ্গিয়া তাহা মেঝের উপর রাখিয়া দিল। আশ-পাশের আরো দুই চারিটা মাটীর পাত্র—কোনটা ভাঙ্গিয়া, কোনটা না-ভাঙ্গিয়া—মেঝের উপর ছড়াইয়া রাখিল। তার পর পকেট হইতে কাগজে জড়ানো একটা পাঁঠার ঠ্যাং-এর খানিকটা অংশ বাহির করিল। আজ তাহাদের পিক্‌নিকে যে পাঁঠাটাকে মারা হইয়াছে, মৃত্যুর পূর্বে সে-ই এই ঠ্যাং-এর অধিকারী ছিল। হাড়খানা কার্তিক মেঝের একধারে ফেলিয়া রাখিল, তৎপরে ঘৃতপাত্র হস্তে সন্তর্পণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে শীতলা-তলার কাছে কালী ঝি-এর সঙ্গে দেখা হইল। কালী জিজ্ঞাসা করিল—দাদাবাবু, কি ওতে? কার্তিক কহিল—গঙ্গাজল।

সে-রাত্রে কার্তিক বাড়ী ফিরিবার আর অবসর পাইল না।

পরদিন বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় যখন সে গৃহে ফিরিল, দেখিল—মামা দালানে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে চা খাইতেছে আর কিছু দূরে মামী বসিয়া কুট্‌না কুটিতেছে।

চায়ের খালি কাপটা পাশে রাখিয়া দিয়া মামা সহাস্য বদনে মামীর উদ্দেশে কহিল—তার পর?

মামী কহিল—তার পর গাছের সেই শুকনো পাতাটা মাটিতে পড়েই হয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড সাপ। কাছেই একটা গরু ঘাস খাচ্ছিল, সাপটা গিয়ে তাকে ছোবল দিলে। গরুটা সেইখানেই পড়লো ঢলে। তারপর সাপ এঁকে-বেঁকে গিয়ে হঠাৎ হলো এক ভীষণ বাঘ। বাঘ হ'য়েই মারলে এক হরিণ। কিন্তু খেলেনাকো,

কার্তিক বুঝিল—'পিস্' (peace)—ভয়ানক 'পিস্'! নচেৎ রূপকথার গল্প চলিত না।

কার্তিককে দেখিতে পাইয়া প্রমীলা তাহাকে কহিল—তোর ব্যাপার কি বল্ ত? কাল সারা রাত আর তুই বাড়ী···

মামীকে কথা শেষ করিতে অবসর না দিয়া কার্তিক কহিল—কাল সারা দিন-রাত মস্ত এক হাঙ্গামায় পড়েছিলুম, মামী-মা। ও-পাড়ার সুরেশের পেটের মধ্যে অশথ গাছ জন্মেছিল; তাই দিন-দিন ও শুকিয়ে যাচ্ছিল।

—বলিস্ কি রে! পেটের ভেতর অশথ গাছ! ধরা পড়ল কি করে?

—মুন্সীরহাটের বিপিন রোজা ধরে ফেল্লে। এত বড় 'গুণীন্' ত এ-তল্লাটে আর নেই। সে-ই কাল এসে মন্তর-তন্তর ঝাড়-ফুঁক্, তুক্-তাক্ কত-কি কাণ্ড-কারখানা করে সেই অশথ গাছ মারলে।—এই সূত্রে কার্তিক কহিল কাল তাহাকে কি রকম খাটিতে হইয়াছে। এক-হাজার-এক অশথ পাতা, বেল-কাঠ, ভেড়ার দুধ, হোমের ঘি—কত-কি সব যোগাড় করিয়া আনিতে হইয়াছে তাহাকে।

প্রমীলা তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—ঘি-এর কথায় মনে পড়ে গেল, কাল কি হয়েচে জানিস্? কোত্থেকে একটা কুকুর একটা পাঁঠার ঠ্যাং মুখে করে এনে আমাদের ভাঁড়ারে ঢুকেচে। ঢুকে, বেঞ্চির ওপর থেকে ঘি-এর ভাঁড় ফেলে ভেঙ্গেচে, আধ সেরটাক আন্দাজ ঘি ছিল, সব খেয়েচে। সে আর কি বলবো তোকে, একেবারে নৈ-নেত্য করে গিয়েচে!

—আচ্ছা করে ধরে ঠ্যাঙ্গাতে পারলে না তাকে?

—আমি তখন ঘুমুচ্ছিলুম। তুই বাড়ী ছিলি না, কালীও ছিল না। কালী এসে বললে—'দাদাবাবু গঙ্গাজল নিয়ে ঐ দিকে যাচ্চে।'

—তা সুরেশের পেটে আর অশথ গাছ নেই ত?

—না, মামী-মা। পেটে আগে গাছের হাওয়া বইতো; ঐ সব করবার পর কাল থেকে আর হাওয়া বয় না।

প্রমীলার মুখের দিকে চাহিয়া শশধর কহিল—দেখ, আমার পেটের মধ্যেও বোধ হয় গাছ জন্মেচে। হাওয়া বয়। তবে সম্ভব—তেঁতুল গাছ। কেন না, খালি-খালি টক ঢেঁকুর ওঠে।

—তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! খেয়ে-দেয়ে ত আর অন্য কাজ নেই!

—তার মানে, আমি একটা নিষ্কর্মা—এই বলতে চাও?

—নিষ্কর্মাই ত।

শশধরের মুখ-ভাব চকিতে পরিবর্তিত হইল; চোখের দৃষ্টিতে একটা তীব্রতা ফুটিয়া উঠিল। কপাল কুঞ্চিত হইল। এমন যখন অবস্থা, তখন উঠান হইতে শম্ভু বাগ্দীর বৌয়ের ডাকে প্রমীলা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ঝড় উঠিতে-উঠিতে উঠিল না।

* * * *

আগে হইতেই বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর হাওয়া বহিতেছিল। হঠাৎ এই সময়টায় তাহার সহিত মিতালি করিতে আর একটা চাঞ্চল্যকর হাওয়া প্রবাহিত হইল। সরকার হইতে প্রচারিত করা হইল যে, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে কি-পরিমাণ ধান-চাউল মজুত আছে তাহার অনুসন্ধান চলিবে। সাধারণ লোকে এ কার্যের আদ্যোপান্ত না জানিয়া এবং সদুদ্দেশ্য না বুঝিয়া একটু যেন আতঙ্ক-চঞ্চল হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, সরকার বুঝি তাহাদের সঞ্চিত ধান-চাউল বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে। এইরূপ যাহারা ভাবিল, তাহাদের মধ্যে শশধর একজন। শশধরের প্রায় পঞ্চাশ মণ চাউল মজুত ছিল, যাহার মূল্য বর্তমানে প্রায় দুই হাজার টাকা।

শশধর কার্তিকের শরণাপন্ন হইল, কহিল—কি হবে কার্তিক?

ধান-চাউলের প্রকৃত ব্যাপারটা কার্তিক জানিত; কিন্তু সেই-ই শশধরকে উল্টা বুঝাইয়া দিয়া ভয় খাওয়াইয়া দিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাহার একটা মতলব ছিল। মতলব এই যে, তাহার আর পাড়া-গাঁয়ে পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছে না। সে চায়—

কলিকাতায় গিয়া থাকে। পাড়া-গাঁর মাঠ-ঘাট. জল-কাদা, ঝোপ-জঙ্গল, আর অক্ষয় ঘোষের দোকান—তাহার একান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্বে সে অনেকবার মামাকে কলিকাতায় গিয়া থাকিবার জন্য অনেক প্রকার সংপরামর্শ দিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার আপনা হইতেই সুযোগ আসিয়া পড়িল। কার্তিক কহিল—কোলকাতা এ-আইনে পড়েনি, সুতরাং চালগুলো নিয়ে কোলকাতায় গিয়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত। দু' হাজার টাকা ত আর কম নয়।

শশধরও নিজের মনে বার বার বলিতে লাগিল—দু' হাজার কম নয়!

সর্বদাই এক দুশ্চিন্তা শশধরকে পাইয়া রহিল। কর্মহীন অবস্থায় চিন্তা যেন আরো বেশী করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। কোন একটা কাজ লইয়া থাকিলে চিন্তাটা তত জোর করিতে পারে না। এজন্য শশধর কাজ খুঁজিয়া বেড়ায়। সে দিন বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় শশধর একটা কোদাল লইয়া উঠানের এক ধারে মস্ত বড় গর্ত খুঁড়িতে সুরু করিল। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল—উঠোনের মাঝে গর্ত খুঁড়চ কেন?

খুঁড়িতে খুঁড়িতে শশধর বলিল—আবার বুজিয়ে দেবো এখন। এর মধ্যে সীমের বীচি পুঁতে দেব।

—যাচ্চ ত কোলকাতায় চলে, সীম তোমার খাবে কে? বলে—

'কাজের কাজি নইকো আমি, অকাজের ধাড়ী!
ভাল করতে সাধ্যি নেই—মন্দ করতে পারি।'—

তা তোমার তাই হয়েচে!

কট্-মট্ করিয়া প্রমীলার দিকে চাহিয়া শশধর কহিল—তার মানে?

—তার মানে বুঝে নাও।

রাগে শশধরের শ্বাস জোরে-জোরে বহিতে সুরু করিল, চোখের চাহনির মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল।

হাতের কোদালটা পাঁচিলের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রমীলার অনুসরণে রান্নাঘরের দিকে ধাবিত হইল। তারপর কথার তুবড়ী, চীৎকার, হুঙ্কার, লম্ফ-ঝম্ফ এবং যবনিকা-পতন। অর্থাৎ প্রমীলা চলিয়া গেল—পাশের ভট্‌চায্যি বাড়ী, আর শশধর শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া লাগাইল খিল।

অনেক বেলায় কার্তিক বাড়ী ফিরিয়া বুঝিল—বাড়ীর আকাশ মেঘাবৃত; মামী বাড়ী নাই; মামার ঘরে খিল দেওয়া। আর রান্না-ঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া কালী ঝি অঘোরে ঘুমাইতেছে। রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া দেখিল, রান্না-বান্না সবই প্রস্তুত, শুধু খাইবার লোকের অভাব। সুতরাং কার্তিক স্নান করিয়া আসিল এবং হাঁড়ী হইতে ভাত-তরকারী বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল।

সন্ধ্যার পরই কার্তিক বাড়ী ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার জ্বর হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর। শশধর ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কাল সকালেই ডাক্তারখানা থেকে কুইনাইন এনে খাবি; বুঝলি ?

—খাবো, মামা।

প্রমীলা আসিয়া কহিল,—খবরদার, কুইনাইন খাবি না, জ্বর তা হলে আটকে যাবে। আমি বেলপাতা আর গোলঞ্চর রস করে দেব, খাস্।

—তাই খাবো।

খানিক পরেই শশধর পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া কহিল—আজ রাত্রে শুধু একটু জল-সাবু খেয়ে থাকবি।

দালান হইতে প্রমীলা হাঁক দিয়া কহিল—রাত্রে জল-সাবু খেলে বুকে সর্দ্দি লাগবে, কেতো। কিছুতেই জল-সাবু খাবি না। দুধ-খই দেব, তাই খাবি।

দিন পাঁচ-সাত পরে কার্তিক আরোগ্য হইলে, শশধর কহিল—কোলকাতায় যদি যেতে হয়, তাহ'লে আর দেরী করে ফল নেই।

কার্তিক কহিল—শীগ্‌গীর না গেলে ওই দু' হাজার টাকার চাল চলে যাবে মামা। সুতরাং আর দেরী……

—না, না, তাহলে আর দেরী করা নয়। তুই কাল গিয়ে অল্প ভাড়ায় ছোট-খাটো একটা বাড়ী ঠিক করে আয়।

পরদিন মামার কাছ হইতে ট্রেন-ভাড়া আদি লইয়া কার্তিক কলিকাতা চলিয়া গেল; কিন্তু দুই দিন ধরিয়া বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও ছোট খালি বাড়ী বাহির করিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকে লোকারণ্য। এমন কি, ফুটপাথগুলা এক শ্রেণীর লোক দ্বারা অধিকৃত। যে-কলিকাতায় 'টু-লেট্'-এর ছড়াছড়ি ছিল, সেখানে এখন আর একখানিও 'টু-লেট্' খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একজন ভদ্রলোক কার্তিককে কহিল—এখন Too late! বাড়ী এখন আর পাবেন না।

ঘুরিতে-ঘুরিতে কার্তিক দেখিল, কালীঘাট সদানন্দ রোডে বেশ একটি ছোট বাড়ী খালি রহিয়াছে। তিনখানা শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, কল, পাইখানা; তবে পাকা দেয়ালের উপর টিনের আচ্ছাদন। তা হউক, বাড়ীখানা পছন্দসই। কিন্তু পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোকের নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উহা ভাড়া হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ভাড়া লইয়াছেন, আজই তাঁহারা আসিবেন। বাড়ীটার ভাড়াও অন্যান্য বাড়ীর তুলনায় সুবিধাজনক ছিল—পঁচিশ টাকা। বাড়ীর মালিক এক বিধবা স্ত্রীলোক—থাকেন বালীগঞ্জে। একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়া কার্তিক পুনরায় সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিল, তিনখানা ঠেলাগাড়ী-বোঝাই মাল-পত্র লইয়া একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছে। গাড়োয়ানরা মাল-পত্রগুলি নামাইবার আয়োজন করিতেছে। কার্তিক ভদ্রলোককে কহিল—এ বাড়ী কি আপনিই ভাড়া নিলেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—আপনার নিবাস?

—নিবাস ময়মনসিং। এসেছিলাম চেতলায় 'ভায়রা'র বাসায়।

একটু চিন্তিত ভাব দেখাইয়া কার্তিক কহিল—এই বাড়ীতেই থাকবেন ?—তা থাকুন। কালীর পীঠস্থান, মা-কালীর নাম নিয়ে থেকে যান।

অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত ভদ্রলোকটি কহিল—কেন ? কেন ? ব্যাপার কি ?

—পাড়ার লোকে আপনাকে কিছু বলেনি ?

—না, কিছুই ত কহে নাই।

—একটু ঢোঁক গিলিয়া কার্তিক কহিল—এসে যখন পড়েছেন, তখন কালী-মার নাম করে থেকে যান।

অত্যন্ত অধীর উদ্বিগ্নতার সহিত ভদ্রলোক কহিল—না—না, নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে, আপনাকে বলতেই হবে।

—আপনি আমাকে মহা ফ্যাঁসাদে ফেল্লেন। তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে মিছে কথাই বা কি করে বলি।

—না—না, আপনি সত্যই বলুন। আমি বিদেশী লোক, আপনি একজন ভদ্দর ব্যক্তি·········

—এ বাড়ীতে থেকে আর কাজ নেই। এটা 'থাইসিস্'য়ের বাড়ী। এর আগে যতগুলি ভাড়াটে এ বাড়ীতে থেকে গেছে, সকলেরই একটি-না-একটি ওই রোগে·········

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ময়মনসিংয়ের ভদ্রলোক কহিল—বলেন কি ! টি-বি ! ওঃ, আপনি বড়ই উপকারটা করলেন, মশাই ! এই গাড়ীওলা, চিজ্-উজ্ মৎ নামাও ; যাঁহাসে লে আয়া, ফিন হুঁয়া লে যানে হোগা।

ভদ্রলোক কার্তিককে অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া ধূলাপায়ে আবার 'ভায়রা'র বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

* * * * *

শশধর স-পরিবার এবং স-চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে। সদানন্দ রোডের সেই বাড়ী। বাড়ীখানা শশধর ও প্রমীলার বেশ পছন্দ হইয়াছে। এই বাড়ীর সূত্রেই সেদিন কার্তিক ময়মনসিংহের

সেই ভদ্রলোকটির নিকট হইতে অশেষ ধন্যবাদ পাইয়াছিল, এখন মাতুল-মাতুলানীর নিকট হইতেও আর এক দফা ধন্যবাদ পাইল।

শশধর প্রমীলাকে কহিল—কোলকাতার খরচ-পত্র যদিও একটু বেশী পড়বে বটে, কিন্তু থাকা যাবে বেশ সুখে। কি বল?

—নিশ্চয়। বাবা! এতদিন পরে দু'বেলা রান্নার হাত থেকে বাঁচলুম।

কলিকাতায় আসিয়া শশধর দেখিল, শুধু কালী ঝিয়ের দ্বারা এখানে সব কাজ চলিবে না। বাজার করা, দোকান করা, তা ছাড়া কন্‌ট্রোলের দোকান হইতে এ-ও-তা আনা, এ সমস্ত একা কালীর দ্বারা হইবে না। সে জন্য জগু নামক একজন বেহারীকে রাখা হইয়াছে। তাহার দ্বারা দুই বেলা রান্নার কাজও চলিতেছে।

কলিকাতা আসিবার পর হইতে কার্তিক বড় একটা বাড়ীতেই থাকে না। নানা কাজে-কর্মে-মতলবে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুধু দুই বেলা খাবার সময় তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সে দিন সারা-বেলার পর বিকালের দিকে বাড়ী ফিরিয়া কার্তিক অনুমান করিল—মামা-মামীর মধ্যে যেন গণ্ডগোল বাধিয়াছে। এ বিষয়ে কালীকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করাতে, ইঙ্গিতে সে যাহা জানাইল, তাহাতে কার্তিক বুঝিয়া লইল যে তাহার অনুমান ঠিকই।

কার্তিকের গলার সাড়া পাইয়া শশধর কহিল—কেতো, ঠাকুরকে বলে দে, এ বেলা খিচুড়ী আর ইলিস্ মাছ ভাজা হবে।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রমীলা কার্তিকের উদ্দেশে বলিল—কেতো, ঠাকুরকে বল্, এ বেলা চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা হবে।

কিছু পরে শশধর ও-ঘরে কার্তিককে ডাকাইয়া বলিল—ঠাকুরকে বলেচিস্—খিচুড়ী আর ইলিস মাছ ভাজার কথা?

—বলেচি মামা।

কার্তিক এ-ঘরে আসিলে প্রমীলা বলিল—ফলারের কথা বলে দিয়েছিস্ ত?

—হ্যাঁ, মামী-মা।

ঠাকুরকে কার্তিক উভয় রকমেই ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল এবং রাত্রে ফিরিয়া মামার সঙ্গে খিচুড়ী ইলিশ মাছ ভাজা এবং মামীর সঙ্গে চিঁড়ে-দইয়ের ফলার খাইয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিন দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে ও-ঘরে শুইয়া শশধর স্থির করিল যে, এ-জীবন আর সে রাখিবে না। আত্মহত্যা করিবে! আফিং খাইয়া মরিবে। সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরকে ডাকিয়া তাহার হাতে দুইটা টাকা দিয়া বলিল—দু-টাকার আফিং আনবে।

এ-ঘরে প্রমীলাও শুইয়া শুইয়া ঠিক করিয়া ফেলিল, গায়ে কেরোসিন্ ঢালিয়া পুড়িয়া মরিবে; এবং কালিকে ডাকিয়া দু' টাকার কেরোসিন্ আনিতে বলিল।

ঘণ্টা-দুই পরে দু'জনেই ফিরিয়া আসিল। ও-ঘরে গিয়া ঠাকুর শশধরকে জানাইল—আফিং নেহি মিল্‌তা বাবু। দিনভোর লাইনমে খাড়া হোনে সে দো পয়সাকা মিল্‌নে সক্‌তা।

এ-ঘরে আসিয়া কালী প্রমীলাকে কহিল—কেরাছিন পাওয়া যাবে না মা। ওরে বাবু রে! কী ভীড়! গোটা দিন দাঁড়িয়ে থাকলে সিকি-বোতলটাক হয় ত পাওয়া যেতে পারে।

অগত্যা ভাগ্য-বিড়ম্বনায় কাহারও আর মরা হইল না।

সন্ধ্যার পর কার্তিক বাড়ী আসিলে প্রমীলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—এ রকম স্বামীর ঘর করবার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। তাহলে আমিও বাঁচি, উনিও বাঁচেন।

খুব আস্তে আস্তে কার্তিক কহিল,—মামাও তাই বলে। বলে—ওটা মরে গেলে গায়ে বাতাস লাগে। সোনার প্রায় একশো টাকা করে ভরি। মলে পরে ওর গয়না ক'খানা বিক্রী করে, ঐ টাকায় মজাসে কিছু দিন তোয়াজ করে খাওয়া-দাওয়া করি।......

বারুদে অগ্নি সংযোগ হইলে তুবড়ী যেমন ফোঁস করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, প্রমীলাও সেইরূপ আগুনের ফোয়ারার মত হইয়া কহিল—গয়নাগুলো বিক্রী করে মজা করে খাবেন! মরি যদি, তাহলে কি

আর গয়নাগুলো রেখে যাব! ও-সব, কতক তোকে আমি দিয়ে যাব। তারপর কিছুক্ষণ মনে-মনে গজরাইবার পর কহিল—তোকে আমার সব গয়না এখনি দিয়ে দিচ্চি। বাক্সটা—তোর কাছে—তোর ঘরে রেখে দে—আজই রেখে দে।

গহনা যদিও বেশী নয়, তবুও আজ-কালকার বাজারে তাহার দাম প্রায় হাজার-খানেক টাকা হইবে।

বাক্সটা হাতে লইয়া কার্তিক কহিল—না—না মামী-মা, তা কি কখনো হয়! এ তুমি তোমার কাছেই রেখে দাও মামী-মা। মামার কথা ছেড়ে দাও।

—কিছুতেই না। ও গয়না আমি তোকে দিলুম, তুই তোর কাছে রেখে দে। দেখি, কি করে আমার।

অগত্যা বাধ্য হইয়া গহনার বাক্সটা কার্তিককে লইতে হইল এবং উহা নিজের ঘরে লইয়া গিয়া রাখিল।

একটু পরে শশধর কার্তিককে ডাকিয়া কহিল—সংসারটা ছারখারে দিলে। কত বড় দুষ্ট মেয়ে-মানুষ! আর আমার এক দণ্ড এ সংসারে থাকতে ইচ্ছে হয় না, কার্তিক। সবই ত দেখছিস্।

অনুচ্চ কণ্ঠে কার্তিক বিজ্ঞের ন্যায় কহিল—ভয়ানক স্বভাব খারাপ মামী-মার। কি আর বলব বলুন। একটু আগেই ত মামী-মাকে বল্ছিলুম যে, কেন তুমি এ-রকমটা কর? শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে কবে হয় ত মামা বিবাগী হয়েই বেরিয়ে যাবে।

—অ্যাঁ—অ্যাঁ! বলেছিস্ এ কথা?

—এই ত খানিক আগে বলে এলুম।

—কি বল্লে তা'তে?

—খুব রেগে উঠলো। বল্লে—বিবাগী হয়ে যায় যদি ত বয়েই গেল। আমার শ্বশুরের ভিটে আছে, বাগান-পুকুর আছে, একান্ন বিঘে ধান-জমি আছে, আমার থাকবার খাবার ভাবনা নেই। আমি······

তড়াক্ করিয়া শশধর সপ্তমে উঠিল। কহিল—ভিটে আছে! একান্ন বিঘে ধান-জমি আছে!—তার একচুল আমি ওর জন্যে রেখে যাচ্চি কি না। সব আমি তোর নামে দান-পত্তর লিখে দেবো, কেতো। ওকে আমি পথে বসিয়ে যাব।

ফিস্-ফিস্ করিয়া কার্তিক কহিল—চুপ করুন, চুপ করুন, মামা।

অধিকতর উত্তেজিত হইয়া শশধর কহিল—কিছুতেই না। সব আমি তোকে রেজেষ্টারী দান-পত্তর করে দিয়ে যাব। ওই সাতশো টাকার নোটের বাণ্ডিল আজ আট মাস বুকে করে রেখে দিয়ে এসেচি, মিত্তিরদের ঐ বিশ বিঘের জমাটা কিনবো বলে। ছাই কিনবো। ও সাতশো টাকা তোকে আমি দিয়ে দেবো।

হিতৈষী উপদেষ্টার মত কার্তিক কহিল—না মামা, না। টাকাটা দিয়ে মামী-মার নামে ঐ জমাটা·········

অদ্ভুত মুখভঙ্গীর সহিত চীৎকার করিয়া শশধর কহিল—মামী-মার নামে ছাই দেবো! এ টাকা আমি তোকে দেবো।

হাউইয়ের মত ঘর হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া প্রমীলাও সমভাবে চীৎকার করিয়া কহিল—তবে ত আমার সব বয়ে গেল! যাকে ইচ্ছে তাকে দাও।

—দেবোই ত। এক্ষুণি দেবো।—বলিয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া গিয়া শশধর ট্রাঙ্ক হইতে সেই সাতশো টাকার নোটের বাণ্ডিলটা বাহির করিয়া আনিয়া কার্তিকের হাতে দিল। কার্তিক কহিল—এ কি করচেন, মামা? কিন্তু তা সত্ত্বেও নোটের বাণ্ডিলটা লইতে হইল। না লওয়া ছাড়া অন্য উপায় রহিল না।

হায় মোনা-মুনি! কেন তোমরা ভাসিতে ভাসিতে পরস্পর গায়ে-গায়ে মিশিয়া যাও নাই!

* * * * *

পরদিন সকালে শশধরের ছোট সংসারে বড় রকমের একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কার্তিক নিরুদ্দেশ! হাজার টাকার গহনা

আর সাত-শো টাকার নোটের বাণ্ডিল—নিরুদ্দেশ হইবার পক্ষে এরূপ সুবর্ণ সুযোগ যে জীবনে আর দ্বিতীয় বার আসিবে না, কার্তিক তাহা বুঝিয়াছিল।

এক দিকে ক্রোধ ও ক্ষণেকের উত্তেজনার ফলে সতের-শো টাকা এই ভাবে পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল! অপর দিকে সেই পাখার ঝাপ্‌টায় স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে চিরকালের ঝগড়া-ঝাটি, রাগা-রাগি বহু দূরে বিতাড়িত হইল।

প্রমীলা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল—উঃ। কী সর্বনাশ হলো আমার! ওগো, কেন তুমি আমার সঙ্গে রাগা-রাগি ঝগড়া করতে গেলে গো!

শশধর নির্বাক্। তিন দিন পর্যন্ত তাহার বাক্যস্ফুরণই হইল না! শুধু মাঝে মাঝে একটা ঝাড়া নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল।

তিন দিন পরে তাহার মুখ হইতে প্রথম কথা বাহির হইল—উঃ! কল্কির চেহারাটা কী ভীষণ! ঘোড়াটা দেখেছ? একেবারে সাদা ধব্-ধবে।

কান্নার সহিত জড়িত হইয়া প্রমীলার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—এ সব তুমি কী বলছ গো!

—বলচি যে, এ ধাক্কা সামলানো দায়, প্রমীলা। তাই এইরকম একটা-কিছু কল্পনা করে নিয়ে মনকে না বোঝালে বাঁচবো না—উঃ! কলির শেষে কল্কি আবির্ভূত হয়ে সব একেবারে তচ্-নচ্ করে দিয়ে গেল! তলোয়ারখানার ধার কি! যাক্ বাবা, আমরা খুব বেঁচে গেছি। খালি সতের-শো টাকার ওপর দিয়ে এত বড় বিপদটা কেটে গেল।

সত্যই এ ধাক্কা সামলানো শশধরের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। কলি, কল্কি, সত্যযুগ—কোন কল্পনাই এ ধাক্কায় টিকিল না। অন্তরের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন আলোকের রেখাই আসিতে পারিল না। তত্রাচ শশধর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,

এই সতের-শো টাকা যেমন করিয়া হউক বাহির হইতে তাহাকে উপায় করিতে হইবে। আর কার্তিককে একবার সামনে পাইলে সে খুন করিবে !

অতঃপর শশধরের প্রধান চিন্তার বিষয় হইল, কি করিয়া কিছু টাকা উপায় করা যায়। দিন-রাত সে এই চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিল। কি করিবে সে ? চাকুরী ?—জীবনে কখনো চাকুরী করার অভ্যাস নাই, চাকুরী করা তাহার পোষাইবে না। ব্যবসায় ?—এ বাজারে কোন ব্যবসা ফাঁদা সুবিধার হইবে না। চাকুরী নয়, ব্যবসা নয়—তাহলে পয়সা উপায়ের আর কি উপায় ? ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইল। কালীঘাট একটা তীর্থস্থান। এখানে যাত্রী-ধরা দালালরা বেশ-কিছু উপায় করে। তাই করিলে হয় না ?—না, পোষাইবে না ; বড় হীন কাজ। আর তা ছাড়া, বড্ড ঘোরা-ঘুরি করিতে হয়। আর যাত্রীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতে হয়। তাহলে—তাহলে—তাহলে·········

দিন পাঁচ-সাত ধরিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ শশধরের মাথায় একটা ফন্দী ঢুকিল। সে দেখিল, দেশের এই মহা দুর্দিনে লোকের মামলা-মোকর্দমা ঠিকই বজায় আছে। সে একদিন আলিপুর জজ-কোর্টে গিয়া দেখিল, এমন দুর্ভিক্ষের দিনেও উকিল-মোক্তার, মক্কেল, মকদ্দমার সংখ্যা কিছু-মাত্র কমে নাই, বরং আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। শশধর ঠিক করিল, সে এক 'মামলা-কালী' প্রতিষ্ঠা করিবে। কেহ এই মামলা-কালীকে পূজা-প্রণামী দিলে মকদ্দমায় তাহার শুভ হইবেই। শশধর ভাবিয়া দেখিল, অন্যান্য কাজ-কারবারের দিকে ভীড় হইলেও, এ-জিনিষটায় এখনো কেহ হাত দেয় নাই। ফিরিঙ্গি-কালী আছে, পাগলা-কালী আছে, ডাকাতে-কালী আছে, শ্মশান-কালী আছে, চীনে-কালী আছে, রোটন্তী-কালী আছে—কিন্তু মামলা-কালী নাই।—নতুন জিনিষ ! শশধর আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। সে ইংরেজী-শিক্ষিত হইলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিত—'ইউরেকা ! ইউরেকা !'

কালীঘাটে 'পটুয়া পাড়া' নামে একটা পল্লী আছে, সেখানে পটুয়াদের বাস। সারা বছর ধরিয়া নানারূপ দেব-দেবীর প্রতিমা গড়াই তাহাদের পেশা। শশধর ফরমাস দিয়া সেইখান হইতে একটি কালীমূর্তি নির্মাণ করাইয়া আনিল। তৎপূর্বেই বাড়ীর মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া একখানা ঘরের রাস্তার দিকের তুইটা জানালা খুলিয়া সেই স্থানে বড় বড় তুইটা দরজা বসানো হইয়াছিল। শুভদিনে রাস্তার উপরকার সেই ঘরে 'মামলা-কালী' অধিষ্ঠিত হইয়া মক্কেলদের শুভাশীর্বাদ-দান ও পূজা-প্রণামী গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন।

আহ্বানের সাড়া আসিতে লাগিল—মন্দ নয়। লোকের মুখে-মুখে এবং সামান্য কিছু হ্যাণ্ডবিলের সাহায্যে বহু বাদী, প্রতিবাদী, আসামী, ফরিয়াদীর কানে 'মামলা-কালীর' সংবাদ গিয়া পৌঁছাইল এবং প্রত্যহই ভক্তগণের নিকট হইতে তু'-পাঁচ টাকা করিয়া 'ফী'—অর্থাৎ প্রণামী পড়িতে লাগিল।

শশধরের মনের ক্ষতস্থানে 'মামলা-কালী'-প্রদত্ত দৈব-মলমের প্রলেপ পড়িল। তাহার মনে আবার সুখ, শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

* * * * *

—বলিস্ কি কালী!

—হ্যাঁ দাদাবাবু। কাল সাড়ে তিন টাকা পেন্নামী পড়েচে। পরশু পড়েছিল তু'টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা। শনি-মঙ্গলবার সব চেয়ে বেশী পড়ে।

কার্তিক আর কালী-ঝিয়ের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। কার্তিক মাতুলের বাসা হইতে সে দিন অতি প্রত্যূষে অদৃশ্য হইবার পর হইতে ভবানীপুরের এক 'মেস্'-এ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাজারের সময় সে বাজারে আসিয়া গোপনে কালীর সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে মাঝে-মাঝে তু-একটা টাকা দিয়া বশ করিয়া ফেলে। কালী সুযোগ পাইলেই কার্তিকের 'মেস্'-এ

আসিয়া তাহাকে শশধর-সম্পর্কীয় সকল সংবাদ সরবরাহ করিয়া যায়।

কার্তিক কহিল—খুব ফন্দী বার করেচে ত। মামীর সঙ্গে আর ঝগড়া-ঝাটি হয় না?

—না। এখন খুবই আনন্দে আছে। তবে তোমার ওপর যা রাগ, তা আর বলবার নয়।

মিনিট-ছু'চ্চার একান্ত মনে কি ভাবিয়া কার্তিক বলিল—দ্যাখ্ কালী, তোকে আমি মামীর সব গয়নাগুলো দিয়ে দেবো, যদি এক কাজ করতে পারিস্। ছু'-জনে আমরা তা'হলে লাল হয়ে যাব, কালী।

কালী কহিল—কি কাজ, বল।

—ওরা মাটীর 'মামলা-কালী' করেচে, আমি 'মকর্দমা বাবা' বসাবো। তোকে করবো বাবার 'ভৈরবী'। তোকে মানাবেও বেশ। দ্যাখ, পারবি? ছু'-হাত দিয়ে তা'হলে টাকা কুড়ুবো কালী। আদ্ধেক তোর, আদ্ধেক আমার।

কালী চুপ।

কার্তিক কহিল—কি বলিস্ কালী? রাজী আছিস্? বহু টাকা রোজগার হবে। আদ্ধেক আমার, আদ্ধেক তোর।

—আদ্ধেক আমায় দেবে ঠিক?

—নিশ্চয়। তুই হবি পার্টনার। না দিলে তুই 'ভৈরবী' থাকবি কেন?

কালী রাজী হইল।

অতঃপর এক সপ্তাহের মধ্যেই আলিপুর গোপালনগর রোডের মোড়ের উপর—যেখান হইতে একটি রাস্তা জজ্-কোর্টের দিকে আর একটি রাস্তা ফৌজদারী কোর্টের দিকে গিয়াছে, সেইখানে এক প্রশস্ত এবং প্রকাশ্য গৃহের মধ্যে বিশেষরূপ আয়োজন এবং আড়ম্বরের সহিত মকর্দমা-বাবার প্রতিষ্ঠা হইল। মাটীর চতুর্মুখ এক ব্রহ্মামূর্তি। সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র কলিকাতা ও চব্বিশ-পরগণা

জেলায় মকর্দমা-বাবার কথা প্রচারিত হইয়া গেল এবং প্রত্যহ দলে-দলে মকর্দমা-সংশ্লিষ্ট নর-নারীগণ, এমন কি—উকীল-মোক্তারের দলও আসিয়া মকর্দমা-বাবার পাদদেশ 'প্রণামী'র দ্বারা পূর্ণ করিতে লাগিল।

যথাসময়ে এই সংবাদ শেলের মত শশধরের কর্ণে নয়—বক্ষে আসিয়া বাজিল।

* * * * *

—ওঃ! আমি মরে গেলুম! প্রমীলা, আমি মরে গেলুম! কেতোকে আমি খুন করবো।—দুই হাতে বুক চাপিয়া শশধর মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। প্রমীলা তাহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—উঃ! কী শত্রুতাই শেষকালে কার্তিক করলে গো!

—আমি ওকে খুন না করে ছাড়বো না। সব দিক দিয়ে আমায় নষ্ট করলে! উঃ!—শশধর অন্তর-যন্ত্রণায় ছট্-ফট্ করিতে লাগিল।

—দেখ, ও-রকম কর না, স্থির হও। টাকা-গয়না গেছে, প্রাণ থাকলে আবার হবে।

—আর হবে না, আর হবে না। হবে কোত্থেকে? মামলা-কালী থাকলে হ'ত বটে। উঃ! কত ভেবে-চিন্তে, মাথা খাটিয়ে 'মামলা-কালী' বার করলুম, তার মাথাও শেষকালে খেলে! রোজ চার-পাঁচ টাকা করে প্রণামী পড়তে সুরু হয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই আমার······কেতোকে আমি খুন করবো। কেতোকে খুন করবো, আর ঐ ভৈরবী বেটিকেও খুন করবো। শশধর হাঁপাইতে লাগিল।

প্রমীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—জন-জামাই-ভাগ্না, তিন নয় আপনা।—ওরে একেবারে ঠিক কথা রে—একেবারে ঠিক কথা! চল, এখানে থেকে আর আমাদের দরকার নেই, আমরা শেতলপুর যাই।

শশধর যেন পাগলের মত হইয়া গেল। স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই। কখনো বসিয়া, কখনো দাঁড়াইয়া, কখনো শুইয়া শূন্যদৃষ্টিতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে আর মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—খুন করবো কেতোকে! কালীকে খুন করবো!

প্রমীলা আতঙ্ক-বিহ্বল হইয়া বলে—ওগো, তুমি স্থির হও, ও-রকম করো না। স্থির হয়ে আগেকার মত আমার সঙ্গে ঝগড়া কর।

পাশের বাড়ীর বোসেদের গিন্নীর সঙ্গে প্রমীলার ভাব-সাব হইয়াছিল। বোস-গিন্নী কহিল—কাল সকালে আমার মেজ মেয়েকে দেখতে ভবানীপুরের একজন ভাল ডাক্তার আসবে। তাকে দিয়ে দেখিয়ে একটা ভাল ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থা কর। এ-রকম হওয়া ত ভাল নয়।

পরদিন সকালে ভবানীপুরের সেই ভাল ডাক্তার শশধরকে দেখিতে আসিল। ডাক্তার শশধরকে পরীক্ষা করিয়া এবং প্রমীলার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল—ভয়ানক 'শক্' পেয়ে 'ব্রেণ য়্যাফেক্ট' করেচে। একটা প্রেসক্রপশন্ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, এইটে রোজ তিনবার করে……

প্রেসক্রপশন্ লিখিতে লিখিতে শশধরের মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, দাস্তটা রোজ পরিষ্কার হয় ত?

শশধর কোন উত্তর দিল না। সে তখন কল্পনা-নেত্রে দেখিতে লাগিল—দুই কোর্টের মধ্যবর্তী পথে মোড়ের উপর সুপ্রশস্ত ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে মকর্দমা-বাবার সামনে ভৈরবী-রূপিণী কালী-ঝি আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া আছে। তাহার সমস্ত কপালদেশ সিঁদূরে লেপা, হাতে সিঁদূর মাখানো ত্রিশূল—সারা ঘর ধূপ-ধুনার গন্ধ ও ধূমে আচ্ছন্ন। একপাশে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া সেবকরূপী কার্তিক কম্বলাসনে বসিয়া আছে; আর এক পাশে জবা ও বিল্ব-দলের মধ্যে সিঁদূর-চর্চিত পাঁচটি মড়ার মাথা। কালীর সম্মুখে অসংখ্য ভক্তের

দল ; আর সেই ভীড়ের মধ্য হইতে বৃষ্টির ধারার মত টাকা-পয়সা, সিকি-আধুলী, দোয়ানী প্রণামী-স্বরূপ আসিয়া মকর্দমা-বাবার পদতলে পড়িতেছে।

ডাক্তার কহিল—এইটে আনিয়ে নেবেন। রোজ তিন দাগ করে···

ক্ষিপ্তের মত শশধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া মালকোঁচা কষিল ; তার পর প্রেসক্রপশন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে একজনদের বেড়া হইতে একখানা বাঁশ খুলিয়া লইয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে গোপালনগর রোডের অভিমুখে ছুটিল। পথিকরা তাহাকে দেখিয়া কেহ বা বিস্মিত হইল, কেহ বা আতঙ্কিত হইল। যাহারা নিষ্কর্মা, তাহারা কৌতূহলী হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

গলদঘর্ম হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে শশধর মকর্দমা-বাবার ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উন্মাদের মত তত্রত্য অসংখ্য জনতা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। হঠাৎ সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া কার্তিক চকিতে আসন হইতে উঠিয়া পড়িল এবং চক্ষের নিমেষে গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি দীর্ঘ বংশযষ্টি হাতে লইয়া মাতুলের সম্মুখীন হইল। তারপর······

তারপর যে বীভৎস ব্যাপার ঘটিল, তার বর্ণনা না করাই ভাল।

মোহভঙ্গ

আত্মনাথ ঘোষালের আকস্মিক মৃত্যুতে সেদিন গ্রামের লোকে যত না বিস্মিত হইল, পরদিন তাহাপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইল এই সংবাদ শুনিয়া, যে তাহার শয়ন ঘরের পুরাতন এবং সাধারণ লোহার সিন্দুক হইতে তাহার একমাত্র পুত্র বৈদ্যনাথ নগদ একুশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথমটায় বৈদ্যনাথের পিতৃশোক তাহার বুক হইতে ফোয়ারার মত উর্ধ্বে উঠিতে সুরু করিয়াছিল। কিন্তু ছয় মণ সাড়ে-বাইশ-সের রৌপ্য মুদ্রার চাপে তাহার সেই উদ্গত শোক একেবারে নামিয়া পড়ে।

সংবাদটা আশ্চর্যেরই বটে। চিরকাল অষ্ট-হস্ত-পরিমিত বস্ত্র-পরিহিত, নগ্নপদ আত্মনাথের অতি সাধারণ জীবনে এমন কোনও সুবর্ণসুযোগ বা উপলক্ষ ঘটে নাই যাহার ফলে তাহার সিন্দুকটি একুশ হাজারে ভরিয়া উঠিতে পারে। পুঁজির মধ্যে ছিল—হাট-তলায় ছোট একখানি মুদিখানা দোকান আর বিঘা দশ-পনের ব্রহ্মোত্তর। তবে ক্ষুদ্র দোকানখানির উপর আত্মনাথের দৃষ্টি এবং মমতা ছিল অসীম। এখন তাহার মৃত্যুর পর, তাহার এই মমতার অর্থ বুঝিতে পারা গেল।

বৈদ্যনাথ কখনই এতটা আশা করে নাই; সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, দুশ্চিন্তায় না হউক—নানারূপ সুখ-স্বপ্নে দিনরাত হাবুডুবু খাইতে লাগিল। শ্রাদ্ধ চুকিয়া গেলে মাকে একদিন কহিল—মা, তুমি এখন কি করতে চাও, বল। তুমি যদি কাশীবাস করতে চাও, তা হলে আমি তার ব্যবস্থা করে দি। চিরচঞ্চল খরস্রোতা তটিনী—হঠাৎ যেন তুষার-জমাট হইয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সদ্য-বিধবা সংক্ষেপে পুত্রের প্রশ্নের উত্তর দিল—না।

—তা হলে বড় মামীমার কাছে বৃন্দাবনে গিয়ে না হয়……

—কোনও 'বন'ই আমার দরকার হবে না ; এই মাকালপুরের বনে-জঙ্গলেই আমি থাকবো, বাবা।

একটু ঢোঁক্ গিলিয়া বৈদ্যনাথ কহিল—দোকানখানা তা' হলে……

—যেমন আছে, তেমনি থাকবে।

একটু ব্যস্ত হইয়া বৈদ্যনাথ কহিল—কিন্তু আমার দ্বারা ত দোকান দেখা-শোনা চলবে না, মা। অন্নদা পাল দোকানটা কিনতে চায় ; তোমার মত হলে অন্নদাকে……

—দোকান কাকেও বিক্রী করা হবে না বাবা ; তুই না পেরে উঠিস্, আমি মাইনে দিয়ে লোক রাখবো—বলিয়া মুক্তকেশী উঠানের রৌদ্রে-দেওয়া ধানগুলি নাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া গেল।

কিন্তু সহসা একটা বিশাল সাম্রাজ্য পাওয়ার ন্যায়, বৈদ্যনাথ একুশ হাজারের মালিক হইয়া, একটা প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল। সে কি করিবে, না-করিবে, কোন্ পথে যাইবে, এই বন-জঙ্গলে ঘেরা পাড়াগাঁয় পড়িয়া থাকিবে, কিম্বা স্বর্গতুল্য কলিকাতায় বাস করিয়া সুখের জীবন যাপন করিবে,—এই সব চিন্তায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তাহার বন্ধু-বান্ধবের দল এবং গ্রামের অধিকাংশ মাতব্বর তাহাকে পরামর্শ দিল—জমি-জমা বাগান-পুকুর কিনে সম্পত্তি বাড়িয়ে ফেল, বাড়ীখানার সৌষ্ঠব বাড়াও, দোকানখানাকে উঁচু করে তোল ; চিরকাল তা' হলে লক্ষ্মী অচলা হয়ে ঘোষাল বংশে বাঁধা থাকবেন। অপরদিকে একুশ-হাজারী রৌপ্য-রেজিমেণ্ট তাহার বুকের মধ্যে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বলে—এতদিন নিঃসম্বল অবস্থায় পাড়াগাঁর ধান-জমির মধ্যে গেঁড়ি-গুগ্‌লীর মত পড়ে ছিলে ; আমরা বিনা আহ্বানে, বিনা আরাধনায় তোমার হাতে এলুম—তোমায় মানুষের-মত-মানুষ বানিয়ে সব রকম সুখে-সুখী করবার জন্যে। একদিকে বন-জঙ্গল, পুকুর, বাগান, ধান-ক্ষেত, জল, কাদা ; আর একদিকে পীচ-ফেলা পাকা রাস্তা, বিজলী-বাতি,

রেডিও, সিনেমা, ট্রাম-বাস, মোটর, পার্ক, স্কোয়ার, লেক, সভা, সমিতি—ইত্যাদি। একদিকে অমাবস্যার অন্ধকার; আর একদিকে শারদীয়া পূর্ণিমার পুলক জ্যোছনা। একদিকে নরক; একদিকে নন্দন। বেছে নাও—কোন্ পথে যাবে।

বৈদ্যনাথ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

মুক্তকেশী পুত্রের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; কহিলেন,—বাবা, তোর যদি ইচ্ছে হয়, তুই বৌমাকে নিয়ে কোলকাতায় বাসা করে থাক্‌গে যা।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বৈদ্যনাথ বলিল,—ও ত তুমি রাগ ক'রে বলচ, মা।

মুক্তকেশী মালা জপিতেছিলেন; কহিলেন,—না, বোহু, আমি রাগ করেও বলিনি; আর মালা-হাতে মিথ্যাও বলিনি।

—তা হলে, তুমিও যাবে ত?

—ভিটে ছেড়ে আমি কি যেতে পারি বাবা? তা' হলে যে বংশের অকল্যাণ হবে! তারপর দোকানখানা আছে। তুই তখন হস্‌নি, আমার হাতের বালা দু'গাছা বিক্রী করে ঐ দোকান হলো। —একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মুক্তকেশী কহিলেন,—উঃ! কতদিন হলো! ন' বছর বয়সে এ-ভিটেতে এসেছি। যেখানে নতুন ঘরখানা উঠেচে, ওখানে ছিল মস্ত একটা জামগাছ; খিড়কীর পুকুরটা তখন ছিল—সাঁতরাদের সম্পত্তি; আমার শ্বশুরের ওতে অংশ ছিল—শুধু ছ' পাই।—মুক্তকেশী নীরব হইলেন; বোধ হয় পুরাতন কথাগুলি স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব আস্তে আস্তে তাঁহার বুকের মধ্য হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া বহু বিষয়ের আলোচনা হইল। মাতার মনোদর্পণে সন্তানের নিগূঢ় মনের কথারও ছায়া পড়ে। বর্তমানে বৈদ্যনাথের মনে কলিকাতা-বাসের যে উদগ্র বাসনা জমিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে, মুক্তকেশী তাহা ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাছে একমাত্র পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ

করিলে, তাহার মনের অসন্তোষ ও অসুস্থতাকে ভিত্তি করিয়া কোনরূপ দৈহিক অসুস্থতা আসিয়া পড়ে, সে কারণ আলোচনায় ইহাই স্থির হইল যে, বৈদ্যনাথ সস্ত্রীক কলিকাতায় গিয়াই বাস করিবে। মুক্তকেশী কহিলেন,—দেশ-ভুঁই দিন দিন যে-রকম রোগের ডিপো হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে কোলকাতায় গিয়ে থাকাই ভাল বাবা। আমার যে যাবার উপায় নেই, নইলে আমিও……। —যাহাতে পুত্রের মনে তিলমাত্র কোনরূপ সন্দেহ না দাঁড়াইতে পারে, সেজন্য সতর্ক জননী ঐ কথা বলিয়া তাঁহার মালা-জপে মন দিলেন।

তবে ইহাই স্থির হইল যে, যখন গ্রামের মধ্যে জানা-জানি হইয়া পড়িয়াছে, তখন এতগুলি টাকা এখানে ফেলিয়া রাখা ঠিক হইবে না; কলিকাতায় গিয়া বৈদ্যনাথ উহা কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে এবং ও-টাকা কোনরূপেই ব্যয় করা হইবে না! কলিকাতায় ব্যয়-নির্বাহের জন্য বৈদ্যনাথ সেখানে কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হইবে।

যে উদ্বেগ ও চিন্তায় বৈদ্যনাথের অন্তর অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার অবসান হইল। অমাবস্যার অন্ধকারকে অতিক্রম করিয়া সে পৌর্ণমাসীর পুলক-জ্যোৎস্নাধারাতে অবগাহন করিবে; নরককে পশ্চাতে ফেলিয়া সে নন্দনে স্থান লাভ করিবে। গভীর আনন্দে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। মায়ের কাছ হইতে উঠিয়া, যেখানে রান্নাঘরে স্ত্রী যমুনাবালা রন্ধনকার্যে ব্যাপৃতা ছিল, আনন্দ-পদবিক্ষেপে সেইখানে আসিয়া এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে গাহিল—

'যমুনে! এই কি তুমি
সেই যমুনা প্রবাহিণী?'

* * * *

—অবাক জলপান! নকলদানা!

—চাই ভাল তালের পাটালী! জয়নগরের মোয়া-য়া-য়া-য়া!

—ও মশাই, ৩২-এর বি কোন্ বাড়ীটা হবে, বলতে পারেন ?

—কাপ ড়েওয়ালা-আ-আ-উ !

—এই পট্‌লা, মেরে চ্যাপ্‌টা করে দেবো বল্‌চি।

ঘরের সাম্‌নেকার পথে যখন উক্তরূপ ফেরিওয়ালার হাঁক-ডাক এবং জন-কোলাহল, তখন সেই ঘরের মধ্যে 'রেডিও'তে এইরূপ চলিতেছিল—তালের ফোঁপলের পায়েসের কথা আপনারা শুনলেন, এইবার তালের হালুয়ার কথা আপনাদের বলবো। জিনিসটি খুবই মুখরোচক, তবে লোভ সামলে অল্পমাত্রায় খাওয়া আবশ্যক ; বেশী পরিমাণে এ জিনিটা খেলে পেটের ভেতর গিয়ে বিদ্রোহ বাধাতে পারে। প্রথমতঃ কিছু……

তালের হালুয়া এবং তজ্জনিত উদরপ্রদেশে তাহার বিদ্রোহভাব —এ সবই ভবিষ্যতের ব্যাপার, কিন্তু সেই দণ্ডেই বিদ্রোহী মূর্তিতে বাড়ীওয়ালা উপর হইতে নীচের সেই ঘরের সামনে আসিয়া পরুষকণ্ঠে কহিল,—বদ্দিনাথবাবু, আপনাকে বার বার বলচি, হয় আপনি অন্য বাসা দেখুন, নয় ত 'রেডিও' বন্ধ করুন। সকাল থেকে আর সেই রাত দশটা পর্যন্ত এই কল্‌-কলানি সহ্য করা যায় না, মশাই। দুপুর বেলা একটু যে ঘুমুবো, তার জো নেই ; তা ছাড়া, সকাল-সন্ধ্যে ছেলে দুটোর পড়া-শুনার দফা-রফা ! বই খুলে হাঁ করে ঐ সব খালি শোনে !

বৈদ্যনাথ যে কলিকাতা আসিয়াছে, উপরোক্ত বাক্য হইতে তাহা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। অস্পষ্টতা এইজন্য যে, এ-বৈদ্যনাথ হয় ত অন্য বৈদ্যনাথ হইতে পারে। ইনি রামের ভাগিনা বৈদ্যনাথ বা শ্যামের ভাইপো বৈদ্যনাথও হইতে পারেন ; অথবা মোটেই বৈদ্যনাথ না হইতে পারেন। এঁর নাম হয়ত বৃন্দাবন বা তারকেশ্বর ; বৈদ্যনাথে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ডাক নাম—বৈদ্যনাথ। কিন্তু সুস্পষ্ট কথা হইতেছে যে আমাদেরই বৈদ্যনাথ, অর্থাৎ মাকালপুরের বৈদ্যনাথ অর্থাৎ ৺আদ্যনাথের পুত্র বৈদ্যনাথ আজ তিন মাস হইল সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছে।

দ্বিতলে বাড়ী-ওলা থাকেন, নীচের দুইখানি ঘর বাইশ টাকায় ভাড়া লইয়া বৈদ্যনাথ থাকে। ঘর দুইখানির একখানা শয়ন ঘর, অপর ঘরখানার রাস্তার দিকে দরজা থাকায় বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়। বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে তাহার দুই একটি বন্ধুরও সমাগম হয়।

পিতার সঞ্চিত একুশ হাজারের এক হাজার পিতারই পিছনে—অর্থাৎ তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্যয় করা হইয়াছিল। বাকী বিশ হাজার—মায়ের আদেশ ছিল ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার। বৈদ্যনাথ মায়ের আদেশ পালন করিয়াছে, কিন্তু কিছু 'পারসেন্টেজ' কাটিয়া লইয়াছে অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা হাতে রাখিয়া বাকী পনের হাজার ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে। ঐ পাঁচ হাজারের ভিতর হইতেই তাহার এই 'রেডিও-সেট' খরিদ।

বাড়ীওয়ালার উগ্র মূর্তি এবং তীব্র বাক্য শুনিয়া বৈদ্যনাথ তখনি উঠিয়া 'রেডিও' বন্ধ করিয়া দিল; তারপর বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার ভাবনাকে ধাক্কা দিয়া বাহির হইতে কে ডাকিল—বদ্দিনাথবাবু, আছেন না কি?

বৈদ্যনাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলে, শশীকান্ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল—এক কাপ চায়ের জন্যে 'ফটিক্-চা ফটিক্-চা' করতে করতে আপনার বাসায় এলুম; কারণ আপনার সেই চাকরীর খবরটা নেবার জন্যে অনেকটা ঘোরা-ঘুরি করতে হয়েছে।

—তাই না কি। ধন্যবাদ।

—কিন্তু ধন্যবাদটা যে ঠিক হজম করতে পারব না, যেহেতু ও কাজটার কোন আশা নেই, অন্য একজন 'য়্যাপয়েণ্ট' হয়ে গেছে। শুনলুম, তার খুব সুপারিশের জোর ছিল; কে-একজন 'রিটায়ার্ড' ডেপুটীর ভাইপোর মামাতো শালা।

হাসিতে হাসিতে বৈদ্যনাথ কহিল—ভালই হয়েচে। জানেন ত—'গহনার মধ্যে বালা, কুটুমের মধ্যে শালা'। দাঁড়ান, এক কাপ চায়ের কথা বলে আসি।

এক কাপের জায়গায় দয়া করে দু' কাপ হলেই ভাল হয়—বলিয়া রবীন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং শশীকান্তকে দেখিয়া কহিল—খাঁটি দিবালোকে শশীর উদয় যে !

বৈদ্যনাথ সহাস্যে কহিল—তাই ত ভয় হচ্চে, এক সঙ্গেই রবি-শশীর উদয়, কোন অঘটন না ঘটে ! বলিয়া বৈদ্যনাথ চায়ের জন্য ভিতরে গেল। বলা বাহুল্য যে ইহারা বৈদ্যনাথের এখানকার নূতন বন্ধু।

শশীকান্ত রবীন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল—যাওয়া হয়েছিল কোথায় তোমার ?

—যাওয়াটা আর হলো না, ফিরে এলুম। একটু বায়োস্কোপে যাবার ইচ্ছে ছিল। যাবে ?

—রামচন্দ্র ! ছায়ার পেছনে সময় আর পয়সা ব্যয় করার মত দুর্বুদ্ধি আমার নেই ; থিয়েটার হলেও না হয় কথা ছিল।

—আরে ছো ! থিয়েটার ত সেকেলে ; সেই বক্তিয়ার খিলিজির আমলের জিনিষ ! ওতে আর দেখবার কি আছে ?

অতঃপর থিয়েটার ভাল কি বায়োস্কোপ ভাল এই লইয়া উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কের সৃষ্টি হইল। তারপর চা আসিলে, উহা পানান্তে নূতন উত্তেজনা লইয়া উভয়ের তর্ক-যুদ্ধ চরমে উঠিল। ক্রমে হাতা-হাতি হইবার মত হইল এবং উভয়ের ভীষণ চীৎকার এবং হুঙ্কারে ঘরের ছাদ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে দরজার সামনে বাড়ীওয়ালার দ্বিতীয় সংস্করণ ভীমমূর্তি প্রকট হইল এবং বজ্র-গম্ভীর স্বরে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—আপনি আজই আমার বাড়ী ছেড়ে দিন, বদ্দিনাথবাবু ; অন্ততঃ কালকের দিনটা আপনাকে আমি সময় দিলুম।

এ-কথার কোন উত্তর দিবার ছিল না, সুতরাং তিন জনই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তবে নির্বাক হইয়া বৈদ্যনাথের বসিয়া থাকাটা উচিত হয় নাই, কৃতজ্ঞতার সহিত বাড়ীওয়ালাকে নানাবিধ মিষ্টান্নের সহিত এক কাপ চা খাওয়ান তার উচিত ছিল ; যে-হেতু এত বড়

লঙ্কা-কাণ্ড ব্যাপারটা তাঁহারি জন্য একেবারে থামিয়া গেল। এক সঙ্গে রবি-শশী-উদয়ের ফলে যে অঘটন ঘটিবার ভয় ছিল তাহা মধ্য-পথে আসিয়াই কাটিয়া গেল।

তবে বৈদ্যনাথ ভালরূপেই বুঝিল যে, এ-বাড়ীতে তাহার আর কিছুতেই থাকা চলিবে না, এ-বাসা তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে এবং অতি শীঘ্রই করিতে হইবে।

তখন এই লইয়া তিনজনের মধ্যে শলা-পরামর্শ চলিতে লাগিল।

* * * * *

নূতন একটা বাসার অনুসন্ধান চলিতেছিল। এমন সময় শশীকান্ত আসিয়া সংবাদ দিল—একটা খুব ভাল বাড়ী বিক্রী আছে বদ্দিনাথবাবু। কোথাও ভাড়া করে না থেকে এই বাড়ীখানা আপনি কিনে নিন্; পয়সা দিয়ে কারো তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে না, চোখ রাঙ্গিয়ে কেউ দু'টো কথা বলতে পারবে না।

বৈদ্যনাথ নীরব থাকিয়া কথাটা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

শশীকান্ত কহিল—বাড়ীখানা অল্পদিনের তৈরী, আর ভদ্র-পাড়ায়, ওপর-নীচে খান-আষ্টেক ঘর। আপনি এক ধারে দু'খানা ঘর রেখে বাকীটা ভাড়া দিলে সত্তর-আশী টাকা ভাড়া পাওয়া যাবে। ভেবে দেখুন ভাল করে। এ-বাড়ীটা কিনতে পারলে আপনার আহার ওষুধ দুই-ই হবে।

বেশ একটু ভাবিয়া বৈদ্যনাথ কহিল,—সত্তর-আশী টাকা ভাড়া আস্‌তে পারবে?

—বোধ হয় তার বেশীও আসতে পারে। তেতলাতেও যেন একখানা ঘর আছে বলে মনে হয়। কিনে ফেলুন, বদ্দিনাথবাবু। বাড়ীটা বাইরে থেকে একবার দেখে আসতেও পারেন এখনি; এই কাছেই।

বৈদ্যনাথ ভাবিল, কাজটা নেহাৎ মন্দ হবে না; সুতরাং তখনই জামা-জুতা পরিয়া শশীকান্তের সহিত বাড়ীখানি দেখিতে বাহির হইয়া পড়িল।

রাত্রে আহারান্তে একরাশ চিন্তা লইয়া বৈদ্যনাথ শয়ন করিল। —কি করা যায়? ভাড়াটে বাড়ীতে থাকাটা একটা দুর্ভোগ। বাড়ীটা কিনতে পারলেই ভাল হয়। ব্যাঙ্কে রাখার চেয়ে এ-কাজ ভাল। কোলকাতায় একটা বাড়ী থাকা সৌভাগ্যের কথা। ব্যাঙ্ক হয় ত' হঠাৎ ফেল হ'তে পারে; কিন্তু এতে আর সেই ভয় নেই। তা' ছাড়া, কোলকাতার সম্পত্তি—ওর দাম ক্রমেই বাড়বে ছাড়া কমবে না। মাকালপুরের ধানক্ষেত কেনার চেয়ে এ হাজারগুণে ভাল। আর—মাকালপুরে যাচ্ছেই বা কে! যদ্দিন বুড়ী আছে, ঐ মাসে একটিবার ক'রে যাব, তারপর—ব্যস্, আর ঐ যমের দক্ষিণ দোরে যাব না। পাড়াগাঁয় কখনো মানুষ থাকে! মার যেমন বুদ্ধি! হাটতলার দোকানটা অন্নদা পালকে বেচে দিলেই হ'ত, তা' না ক'রে, মাইনে দিয়ে লোক রেখে ঐ একরত্তি দোকান চালানো! মেয়েমানুষের বুদ্ধি কি না।

যাহা হউক, সেই সপ্তাহেই বৈদ্যনাথ বাড়ীখানা বায়না করিয়া ফেলিল এবং তাহার পরের মাসেই চৌদ্দ হাজার টাকায় বাড়ীখানা কিনিয়া ফেলিল। একপাশে যে দুইখানা ঘর ছিল, সেই দুইখানা বৈদ্যনাথ নিজের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ সত্তর টাকায় ভাড়া দিল।

কলিকাতায় 'আপ-টু-ডেট' ভাবে জীবন যাপন করাতে বৈদ্যনাথের প্রতি মাসে প্রায় ছয়শত টাকা করিয়া সংসার ব্যয় হইতে লাগিল; তবুও—মাঝারি গোছের, কিংবা সাঝারি গোছের 'আপ-টু-ডেট'। তাহার নগদ জমা-টাকাগুলির একটা জোর ছিল, সে জোর আর নাই। বাড়ীর ভাড়াও ঠিক মাসে মাসে পাওয়া যায় না। যে ভদ্রলোক ভাড়াটে আছেন, তিনি বলেন—আগে পোষাক-আসাক, তারপর চা-সিগারেট, তারপর খাওয়া-দাওয়া, তারপর আরও অন্যান্য খরচ আছে, তারপর সবশেষে বাড়ীভাড়া। আসল খরচ সব ফেলে রেখে, আগেই ত' আপনাকে বাড়ীভাড়া দিতে পারি না। সত্যই ত'। ইহার উপর আর কোন উত্তর নাই।

মাকালপুরের বৈদ্যনাথ ত' কোন্ ছার, দেওঘরের মন্দির হইতে স্বয়ং বৈদ্যনাথদেব আসিলেও এ-কথার উত্তর দিতে পারিতেন না। যাহা হউক, মোটের উপর বৈদ্যনাথের অর্থসঙ্কট দেখা দিল এবং একটা চাকুরীর জন্য উঠিয়া-পড়িয়া চেষ্টা করিতে লাগিল।

শ্রাবণ মাস। সমস্ত দিনই বৃষ্টির মধ্যে সারাদিন চাকুরীর জন্য বৃথা ঘুরিয়া অপরাহ্নবেলায় বৈদ্যনাথ গৃহে ফিরিল। ভিজা জামা-কাপড় ছাড়িয়া ও এক কাপ চা খাইয়া বাহিরের দিকের ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিতেই, শশীকান্ত ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল, কোন সন্ধান পেলেন ?

ক্লান্তভাবে তাকিয়াটায় ঢলিয়া পড়িয়া বৈদ্যনাথ কহিল—কিছু না।

—নাঃ, এ-বাজারে চাকরী-বাকরী মেলা দুর্ঘট।

—দুর্ঘট ত' বটেই বদ্দিনাথবাবু, কিন্তু চাকরীই বা কেন করতে যাবেন ?—বলিতে বলিতে রবীন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহার মুখের বাকী কথাগুলি শেষ করিল—চাকরী করতে নেই। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।

রবীন্দ্রের কথাগুলিতে বৈদ্যনাথ কিছুমাত্র মনোযোগ দিতে পারিল না; সে হাসিতে হাসিতে কহিল—আমার কিন্তু ভয় হ'চ্চে; সেদিনকার মত আবার রবি-শশীর একযোগে উদয়ে······

কথা শেষ করিতে না দিয়া রবি কহিল—সে আশঙ্কা আজকে নেই বদ্দিনাথবাবু। সারাদিনের বৃষ্টিতে রবি-শশীর তেজ আজ মেঘে ঢাকা। সম্ভবতঃ তারা দু'জনই আজ মিইয়ে গিয়েচে; একটু চা হ'লেই বরং আজ শরণাগতের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া দেখানো হয়।

সত্যই আজ আর কোন অঘটন ঘটিল না, বরং রবি এবং শশী দু'জনে একমত হইয়া বৈদ্যনাথকে চাকুরীর বদলে ব্যবসা করিবার জন্য নানাভাবে নানারূপ সৎপরামর্শ দান করিল।

সেদিনকার মতই বৈদ্যনাথ রাত্রের আহারান্তে একরাশ চিন্তা লইয়া শয়ন করিল—ঠিকই ওরা বলছে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

ব্যবসা না করলে কি পয়সার মুখ দেখা যায়? তা ছাড়া, স্বাধীন জীবন। ব্যবসা-ই করতে হবে, কিন্তু টাকা পাই কোত্থেকে? বাড়ীখানা না কিনে যদি।……বাড়ীটা কেনাই ভুল হয়েছে।

রান্নাঘরের কাজ শেষ করিয়া যমুনা এ ঘরে আসিল; বিছানার দিকে চাহিয়া কহিল—কি গো, ঘুমোও নি এখনো? কি ভাবচ?

—দেখ, বড্ড ভাবিয়ে তুলচে। খুব-একটা ভুল করে ফেলেছি।

—একটা নয়, দুটো।

—কি বল ত?

—মাকালপুর ছেড়ে এখানে আসা, আর বাবার টাকাগুলো দিয়ে ওখানে জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তি না করা।

—ও সম্বন্ধে যা' করেচি তা একেবারে নির্ভুল। ভুল হয়েচে সমস্ত পুঁজি নষ্ট করে এই বাড়ীখানা কেনা। যা মনে করে কিনেছিলুম, এখন দেখচি সেটা হিসেবে ভুল হয়েচে।

—এখানে বাড়ী কেনায় ততটা ভুল হয় নি, তবে দেশকে বজায় রেখে যদি এখানে বাড়ী কিনতে পারতে তা হলে……

একটু বিরক্তির সহিত বৈদ্যনাথ কহিল—আরে খালি দেশ—দেশ—দেশ! দেশ ত যমের দক্ষিণ দোর! কোন শিক্ষিত ভদ্র লোক কি পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে পারে না কি?—খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল—দেশে গিয়ে মরতে আমি পারব না। দেখো, এই কোলকাতাতেই আমি দু'চার লাখ টাকার মালিক হব। বাবা সারাজীবনে একুশ হাজার রোজগার করেচেন, আমি একুশ মাসেই একুশ হাজার জমিয়ে ফেলবো।

যমুনা আর কোন কথা না বলিয়া নীরব হইয়া রহিল।

বৈদ্যনাথের বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ক্রয় করিয়া দিয়াছিল—নিশানাথ শশী, বিক্রয় করিয়া দিল দিননাথ রবি। তবে খুব তাড়া-তাড়ি বিক্রয় করিতে হইল বলিয়া হাজার-খানেক টাকা লোকসান খাইতে হইল। রবি বলিল,—ধীরে-সুস্থে যদি বেচতেন, তা হ'লে ষোল হাজারে বেচিয়ে দিতে পারতুম। যাহা হউক, এক

হাজার টাকা প্রণামী দিয়া এত বড় একটা ভুলের যে সংশোধন হইল, তাহাতেই বৈদ্যনাথ মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিল।

অতঃপর তিন বন্ধুর মিলিত পরামর্শে কলিকাতার মধ্যে তিনখানা দোকান খোলা হইল। মধ্যস্থলে বৌবাজারে একখানা কাপড়ের এবং উত্তর দক্ষিণে অর্থাৎ শ্যামবাজার ও ভবানীপুরে দুইখানা মুদীখানা দোকান। পশ্চিমে যদি মা-গঙ্গা এবং পূর্বে যদি ধাপার মাঠ না থাকিত, তাহা হইলে ঐ দুইদিকেও দোকান খুলিয়া, বৈদ্যনাথ তাহার ব্যবসায়-রজ্জু দ্বারা সারা কলিকাতাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে চতুর্দিকেই বন্ধন করিয়া ফেলিত।

শশীকান্ত বলিল—তিনখানা দোকানে যেমন করে হোক মাসে পাঁচ-শোর হিসেবে দেড় হাজার লাভ আসবে।

রবি কহিল—দেড় হাজার না হোক, অন্ততঃ খরচ-খরচা বাদে হাজার ত বটেই।

বৈদ্যনাথ সোৎসাহে মনে মনে ভাবিল—যদি নেট্ পাঁচ শো করেও মাসে মাসে পাই, তা হ'লেও যথেষ্ট।

রবি ও শশীকে উত্তর-দক্ষিণের পরিচালনার ভার দিয়া বৈদ্যনাথ নিজে মধ্যস্থলে—অর্থাৎ বৌবাজারের দোকানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিল।

দোকানের কাজ হু-হু করিয়া চলিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ সগর্বে যমুনাকে কহিল—ছ'মাস পরে দেখবে, একদিন যা তোমাকে বলেছিলুম, তা সত্যই হলো কি না।

কিন্তু ছয় মাস নয়, তিন মাস পরেই দেখা গেল, মুদিখানা দোকান দুইটিতে মজুদ মাল এবং ক্যাশ্-এ মিলিয়া যে পরিমাণ টাকা আছে, বাজারে মহাজনদের কাছে ঋণ তাহা অপেক্ষাও বেশী, মূলধন ত পরের কথা। শুধু কাপড়ের দোকানের খাতা-পত্তরে কয়েক-শত টাকা লাভ দৃষ্ট হইল। কিন্তু সেই লাভের টাকার চতুর্গুণ টাকা এমন সব লোকের নিকট বিলাত-বাকী পড়িয়াছে যে সে-টাকা আদায় হইবার আশা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক হইলে হয়

ত করিতে পারিত,—বিংশ শতাব্দীর কেহ সেরূপ আশা করিলে বুঝিতে হইবে তাহার রাঁচি-গমনের প্রয়োজন হইয়াছে।

এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল। মহাজনরা কোর্টে নালিশ করিয়া শ্যামবাজার ও ভবানীপুরের দোকান দুইখানা নীলাম করিয়া লইল।

ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে-ভয়ে বৈদ্যনাথ বৌবাজারের দোকানখানি তাড়াতাড়ি একজনকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

যে বিশ-হাজারী রৌপ্য-রেজিমেণ্ট বুক ফুলাইয়া একদিন তাহাকে অমাবস্যার অন্ধকার হইতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ধারার মধ্যে টানিয়াছিল, নরক হইতে নন্দনে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে রেজিমেণ্ট আর নাই; বৈদ্যনাথ হিসাব করিয়া দেখিল, তন্মধ্যে মাত্র হাজার-দুই আহত সৈনিক তাহার পুঁজি। বৈদ্যনাথ মহা চিন্তায় পড়িল। সে এখন কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে? যে টাকা আছে, বসিয়া বসিয়া খাইলে এখানে তাহার দ্বারা আর কত দিনই বা চলিবে? এখন কি উপায়?—স্বর্গের নন্দনে আসিয়া যে সূচীভেদ্য অন্ধকারে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল, মাকালপুরের মত নরকেও কখনো তাহাকে এমন ঘোর অন্ধকারে ঢাকে নাই। বৈদ্যনাথের আহার নিদ্রা সুখ শান্তি সব যেন একজোট হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল। বহুদিন পরে মাকালপুরের ছবি তাহার মনের পটে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল; সেই সাত-পুরুষের ভিটা, সেই আবাল্য-পরিচিত গ্রাম, সেই চিরকালের সমবেদনাপূর্ণ পাড়া-প্রতিবাসীর দল, তাহাদের সেই ভালবাসা, অনাড়ম্বর সরল আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার একটি একটি করিয়া বৈদ্যনাথের মনে পড়িতে লাগিল। আজ তাহার ভুল সে বুঝিতে পারিল। ক্ষণিকের উত্তেজনায়, সাময়িক মোহের প্রভাবে, যে মাকালপুরে সে বন-জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই দেখে নাই, আজ দেখিল সে বন—উপবন, সে বন—তপোবন। তাহার একছটাক জমির পদতলে শত শত কলিকাতা আসিয়া গড়া-গড়ি খায়, তাহার একটি বৃক্ষমূলে হাজার

হাজার 'পার্ক' আসিয়া লুটাইয়া পড়ে। দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে বৈদ্যনাথ ঘুমাইয়া পড়িল।

মাকালপুরের নদী! কেমন সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। ও-পারের ছোট গ্রামখানার নাম—ভুরুলী, এ-পারে বুড়ো-শিবতলার গা ঘেঁসে মাকালপুরের পার-ঘাটা। ওই যে মাঠের ওপর দিয়া বরাবর পথটা পশ্চিমে গিয়াছে, ওটা গিয়াছে—ধূলো সিম্‌লে। সামনেকার পথটা চলিয়া গিয়াছে গাঁয়ের ভেতর—বারোয়ারী-তলায়। আর দু'পা এগুলেই—দখিন পাড়া। ওটা শিবু রায়ের চণ্ডীমণ্ডপ; এ-পাশে মান্নাদের আম-বাগান; উঃ—কী ফলটাই ফলিয়াছে! পাশেই খামার। পৌষ মাস; ধান ঝাড়া হইতেছে—ঝপা-ঝপ্ ধপা-ধপ্। ও-ধারটায় দিগ্-দৌড় গোয়াল-বাড়ী। বিম্‌লী-গাইটা কেমন লক্ষ্মী, আমতলায় চুপটি করিয়া শুইয়া আছে; রাঙ্গীটা কী দুষ্টু, বেড়া ভাঙ্গিয়া লাউয়ের কচি ডগাগুলো সব খাইয়া ফেলিল;—শীগ্‌গীর এসো—মা! মা!

বৈদ্যনাথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। রাত বোধ হয় দুইটা কি আড়াইটা; সে পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু বাকী রাত আর ঘুমাইতে পারিল না।

* * * *

নদীর পারে মাকালপুরের হাটতলা। প্রাতঃকাল।

সিদু জেলে জালগাছটা কাঁধে ফেলিয়া নদীতে মাছ ধরিতে যাইতেছিল। ঘোষালদের মুদীখানা দোকানটার ভিতর হঠাৎ নজর পড়াতে সেইদিকে আগাইয়া গেল। ভিতরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে গো, দাদাঠাকুর যে! কোলকাতা থেকে কবে এলে গা?

—কাল এসেচি, সিদু।

—এখন থাকা হবে ত কিছুদিন?

—হ্যাঁ, এখন থাকাই হবে, আর যাব না। দোকানখানা ত দেখতে হবে।—বলিয়া বৈদ্যনাথ খালি বস্তাগুলা ভাঁজ করিয়া দড়ির টানায় গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

সত্যেন ডাক্তার

বৈঠকখানা ঘর। তাহার দরজার পার্শ্বে ছোট একখানা কাষ্ঠ-ফলকে লেখা ছিল—'Dr. S. N Halder M B. (Gold Medalist)'। সত্যেন ডাক্তার প্রত্যহ সকালে ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত এই ঘরে বসিয়াই তাহার ডাক্তারী কার্য সম্পন্ন করে। 'গোল্ড মেডালিষ্ট এম-বি'র এই ঘরটির মধ্যে রোগীর সমাবেশ একরকম হয় না বলিলেই চলে। এখানে হয় না মানে—সত্যেন ডাক্তার হইতে দেয় না। সত্যেন বলে—তিনজন পর্যন্ত রোগীকে একজন ডাক্তার ঠিক মত চিকিৎসা করিতে পারে; রোগীর সংখ্যা তার বেশী হলে, সেখানে ডাক্তারী ঠিক হয় না, হয়—ওই নামের একটা চটকদার ব্যবসা। চিন্তাশীল চিকিৎসকের এই মন্তব্যের সত্যাসত্য অপর কাহারও পক্ষে নির্ধারণ করা সহজ নহে।

সেদিন সকালে সত্যেন ডাক্তারের সামনেকার চেয়ারখানায় যে ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন,—আজ ছ'মাস এই মাথা-ঘোরা রোগে বাবা ভুগছিলেন, আমরা মনে করেছিলুম, আপনার ওষুধটা খেয়ে যেন অনেকটা নরম পড়েচে। কিন্তু কাল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে একেবারে যে ঘুরে পড়লেন, ব্যস্! আর···। 'য়্যাপোপ্ল্যাক্সি' আর কি!

—অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন, না—পড়েই অজ্ঞান হলেন?

—আজ্ঞে সেটা ঠিক······

—আচ্ছা, অজ্ঞান হবার পর, আব কথা-টথা কিছু বলতে পারেন নি?

ভদ্রলোক কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে কহিলেন—আজ্ঞে, মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে অজ্ঞান, তা আর কথা কইবেন কি করে?

—তা নয়, কথা কইবার ইচ্ছায় ঠোঁট নড়ে উঠেছিল কি? অনেক সময় বাইরে অজ্ঞান হ'লেও ভেতরে পুরো-দস্তুর sense থাকে, তাই বলচি।

—আজ্ঞে, ঠোঁট নড়বে কি! একেবারেই যে অসাড়! 'য়্যাপোপ্ল্যাক্সি'!

—য়্যাপোপ্ল্যাক্সি নয়—য়্যাপোপ্ল্যাক্সি নয়!

—নয়! তবে?

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সত্যেন ডাক্তার বলিল—কলেরা।

—কলেরা?

—হ্যাঁ; Dry cholera। বাইরেকার লক্ষণ দেখে কি ভেতরের রোগের diagnosis হয়? যে-রকম সব লক্ষণ শুনলুন—pure কলেরা; এর আর কোন ভুল নেই। কলেরা হলেই যে ভেদ আর বমি হ'তে হবে, এমন কোন কথা নেই।···যাক্।

এমন সময় একটি মধ্যবয়স্ক লোক বাহিরের দেওয়াল-গাত্রে তাহার বাইক্‌টি ঠেসাইয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার হাঁটুর উপরের কাপড় রক্তাক্ত, সার্টে কাদার দাগ, কপালের দুই-চার জায়গায় তখনো রক্ত ঝরিতেছে। লোকটি বিশেষ কাতরভাবে কহিল—দেখুন ডাক্তার······

তাড়াতাড়ি তাহার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া সত্যেন ডাক্তার কহিল—শুধু শুধু দেখে আর কি করব বলুন। আর রুগী হাতে নেবার আমার সাধ্য নেই; কারণ তিনটি রুগী আমার হাতে···। বলিয়াই সত্যেন ঢোঁক গিলিয়া সঙ্গে সঙ্গে কহিল—বসুন, বসুন, আমি ভুলে গেছলুম। তিনটির একটি কাল কলেরাতে······যাক, কি হয়েছে আপনার বলুন ত? দেখচি ত সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে চারদিকে কেটে-কুটে গেছে।

—সাংঘাতিক পড়ে গেছি, ডাক্তারবাবু। একটা মলম-টলম কিছু, না হয়—টিঞ্চার আইডিন, কি বেনজুইন···

—কিছু হবে না। আপনার হিষ্টিরিয়া হয়েচে; সেই হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা করতে হবে।

—হি-ষ্টি-রি-য়া!

—হ্যাঁগো মশাই, হিষ্টিরিয়া। আজ-কাল এই যুদ্ধের হিড়িকে, বোমার আতঙ্কে, এই চাল-ডালের অসম্ভব মূল্য-বৃদ্ধিতে বহু লোকের মাথা আর মন অসুস্থ হয়ে উঠেছে। তারই ফলে যত সব অঘটন ঘটচে। কেউ সাইকেল থেকে পড়ে যাচ্চে, কেউ দক্ষিণে যেতে ভুল বশতঃ উত্তরে চলে যাচ্চে, কেউ বিনা দোষে ছেলে-মেয়েকে ধরে মারচে, কারো-বা পেট নাবাচ্চে, জ্বর, সর্দি-কাসি···মানে-কারো মনই 'নরম্যাল্' অবস্থায় নেই। সুতরাং···

—যাক্, আমার বাইক থেকে পড়ে জখম হওয়াটা আপনি বলচেন—হিষ্টিরিয়া ?

—নিশ্চয়ই। আপনাকে হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা করতে হবে।

হঠাৎ বাড়ীর সামনে একখানা রিক্সা আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক তাহা হইতে নামিয়া, ও-দিককার দরজা দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইনি সত্যেন ডাক্তারের মাসিমা। বরানগরে থাকেন। দুপুর বেলা মাসিমা কহিলেন—বাবা সতু, একটা বিয়ে-থা কর বাবা। এমন তোর ঘর-বাড়ী, কিন্তু একটা মেয়েছেলের অভাবে সবই যেন ছিরিভেষ্ট। দিদি বেঁচে থাকতে···।

—দেখ মাসিমা, বিয়ে-টিয়ে করবার কোন উপায় নেই। তাহলে ডাক্তারী ছাড়তে হয়। আর ডাক্তারী করতে গেলে বিয়ে করা কিছুতেই চলে না। ডাক্তারী কাজটাকে নেহাৎ সোজা মনে করো না, মাসিমা।

—বলিস কি রে বাবা! জগৎশুদ্ধ ডাক্তার······

রেখে দাও তোমার জগৎশুদ্ধু ডাক্তার! বিয়ে করে সকলের মত বেশ সংসার-ধর্ম পেতে বসা, ও আমার চলবে না। অসম্ভব।······ নাকের মধ্যে ঘা হয়েচে না কি মাসিমা? হ্যাঁ, তাই ত বটে!

—হ্যাঁ বাবা, মাঝে-মাঝেই হয়, আবার আপনা-আপনি সেরে যায়।

—না—না, কখনই সারে না। ও তোমার অম্বলের রোগ। bad liver। আচ্ছা, আমি ও-রোগ তোমার সারিয়ে দেব এখন। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই কহিল—না হবে না। তুমি থাকবে সেই বরানগরে আর আমি এখানে, এতে আমার দ্বারা তোমার চিকিৎসা করা চলবে না। এক কাজ কর। রোজ খালি পেটে এক গ্লাস নেবুর জল খেতে সুরু কর। বলিয়াই সত্যেন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং 'সু' পায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়া ট্রামে চাপিয়া বসিল। মিনিট দশ-বার পরে ভবানীপুরে নামিয়া একটা ছোট একতলা বাড়ীর দরজার কড়া নাড়িতেই একটি দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া কহিল—ওঃ! ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ। দেখুন, নেবুর জলটা ভাত খাবার পর চলবে না। ওটা খেতে হবে একবার সকালে খালি পেটে, আর একবার সন্ধ্যাবেলা। বুঝতে পেরেচেন ত? ব্যস্! এইটে বলতেই আমি এসেছিলুম। ওষুধ যেমন চলচে—চলবে।

পুনরায় হন্ হন্ করিয়া সত্যেন ডাক্তার তাহার গৃহের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

ইহার দিন চারি-পাঁচ পরে একদিন রাত প্রায় দুইটার সময় ভবানীপুরের ঐ বাড়ীর দরজার কড়া সেদিনকারই মত আবার নড়িয়া উঠিল। সেদিনকারই মত সেই দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং কহিল—ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ। সকালের ওষুধটা আজ খাওয়ানো হয়েচে ক'বার?

—যেমন বলে দিয়েছিলেন, তিনবার।

—চলুন ত, আমি এখন একবার দেখব আপনার মেয়েটিকে··· কি নাম ওর?···সু···সু···সুলতা না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা এই এত রাত্রে···

—রোগের চিকিৎসার কি আর কালা-কাল দিন-সময় আছে? চিকিৎসকের কর্তব্য—ভয়ানক কর্তব্য। এর ভেতর দুঃখও যেমন

পাওয়া যায়, আনন্দও তেমনি পাওয়া যায়; আপনার মেয়ের···কি নামটা হোল ওর?

—সুলতা।

—হ্যাঁ। সুলতার চিকিৎসার ভার যখন নিয়েছি, তখন···। আচ্ছা, ও চিৎ হয়ে ঘুমোয়, না কাত্ হয়ে ঘুমোয়।

—কখনো চিৎ হয়েও ঘুমোয়, কখনো কাত্ হয়েও ঘুমোয়?

—তা বললে হবে না। বেশীর ভাগ সময় কি ভাবে ঘুমোয়? আচ্ছা, ওর জন্মের আগে আপনার স্ত্রীর কখনো বাত বা হাঁপানীর মত কিছু হয়েছিল? আচ্ছা, চলুন—আমি এই সময়টা ওকে একবার দেখতে চাই।

সুলতা ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বয়স বছর কুড়ি। অর্থাভাবে গরীব বাপ-মা এখনো তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারে নাই। কয়েকদিন আগে তাহার জ্বর ও আমাশয় হইয়াছিল। কিন্তু সত্যেন ডাক্তারের চিকিৎসার আমলে আসিলে, সত্যেন অনেক-কিছু চিকিৎসা-তত্ত্ব আলোড়ন করিয়া তাহাকে ঔষধ-পত্র দিয়া চিকিৎসা চালাইতেছে।

সুলতাকে নৈশ পরীক্ষা করিয়া সত্যেন ডাক্তার কহিল—দেখুন, এক কাজ করতে পারেন। সুলতাকে মাস-খানেকের মত আমার বাড়ীতে রাখতে পারেন। দিন-কতক ওকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা চোখের ওপর পেতে চাই। পারেন রাখতে?

ভদ্রলোক সত্যেন ডাক্তারের পারিবারিক ইতিহাস সবই শুনিয়াছিল। জানিত যে একটা চাকর, একটা বামুন লইয়াই অবিবাহিত সত্যেন ডাক্তারের সংসার। সুতরাং একটু ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া ভদ্রলোক কহিল—তা—তা—তা, কোন বাধা নেই; তবে কি না, ও হ'ল গিয়ে সোমত্ত মেয়ে, তা······

—ওঃ! রাখতে নেই বুঝি? আচ্ছা, তবে থাক।—বলিয়াই ডাক্তার দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সকালে যে প্রেস্‌ক্রপশনটা

করিয়াছিল, সেইটা একবার মনোযোগের সহিত পড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

সত্যেন ডাক্তার চলিয়া গেলে পর ভদ্রলোকটি ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে বহু আলোচনা ও পরামর্শ হইল এবং তাহার ফলে ভদ্রলোক পরদিন সকালেই সত্যেন ডাক্তারের কাছে গিয়া বলিল—দেখুন, আমরা ত আপনার স্ব-ঘর। কাল একটা বিয়ের দিনও আছে। যদি স্থলতাকে আপনি গিয়ে···ওর নাম কি······

—কি বলুন ত?

—যদি ওকে বিয়ে করেন, তা হলে ওকে আপনার কাছে রাখতে আর কোনই বাধা থাকে না।

—বিয়ে! ওঃ।—বিয়ে করলে আর কোনই বাধা থাকে না? ওর দিন-কতক আমার কাছে থাকা চাই-ই। আচ্ছা, ওর 'রিউম্যাটিক্ টেন্‌ডেন্‌সি'······আচ্ছা, যাক। বিয়ে! আচ্ছা তাই হবে। প্রেস্‌ক্রুপশনটা এনেচেন? ডিজিটেলিস্‌টা আমি বদলে দেব।

অতঃপর সত্যেন ডাক্তার 'ডিজিটেলিস্'ও বদ্‌লাইয়া দিল এবং পরদিন অবিবাহিত জীবনের চিরকালের ধারাটাও বদ্‌লাইয়া দিয়া শুভক্ষণে রোগী এবং স্ত্রী দুই একাধারে গৃহে আনিয়া চিকিৎসা বিদ্যার চরম এবং পরম গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিল।

———

উন্নত পঞ্চানন

শালুকডাঙা গ্রামের হাটতলাতে কয়েকজন গ্রামবাসীর মধ্যে ছোটখাট একটা মারামারি হয়ে গেল।

কিন্তু কারণটা তেমন-কিছু নয়।

বর্ধমান জেলার এই গ্রামটিতে বহুকাল থেকে 'পঞ্চানন ঠাকুর' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির-টন্দির তেমন-কিছু নয়, একখানা খড়ের ছাউনি-বিশিষ্ট মাটির দেওয়ালী ঘর। তার মধ্যে 'পঞ্চানন' বিগ্রহের মূর্তি বিরাজিত ; তা-ও মাটির তৈরি। বিগ্রহ বহুকালের। বর্তমান সেবাইত নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর কোনও পূর্বপুরুষ কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং এ থেকে চক্রবর্তী পরিবারের বেশ-একটা আয় বরাবরই হয়ে আসছে।

পঞ্চাননের সমস্ত 'থান'টাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঠাকুরঘরের সামনে একপাশে, বহুকালের একটা প্রকাণ্ড মনসাগাছ আছে। গুরুর চেলারূপে আরো দু'-চারিটি চারা-মনসা পুরানো গাছটির আশে-পাশে সতেজে বর্ধিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে গুরু দেহরক্ষা করলে এদেরই একজন গুরুর আসন অলঙ্কৃত করবে। এখন এগুলি 'ঢেলা-বাঁধা'র যোগ্য হয় নি এবং তা হয়ও না ; হয়—ঐ বড় গাছটাতেই।

'ঢেলা-বাঁধা'। হ্যাঁ, 'ঢেলা-বাঁধা'ই কথাটা। খুলে বলি। বহু-কালের এই 'পঞ্চানন' ঠাকুর ও-অঞ্চলে খুব জাগ্রত ঠাকুর বলেই প্রসিদ্ধ। বন্ধ্যা নারীরা ঠাকুরের পূজো দিয়ে, মনসাগাছের ডালে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ঢেলা ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেই, কয়েকমাস পরে তাঁরা সন্তান-সম্ভবা হন। এই সূত্রেই চক্কোত্তি পরিবারের বেশ-কিছু অর্থাগম হয়ে থাকে।

সেদিনের মারা-মারিটা এই 'পঞ্চানন' ঠাকুরকে নিয়েই ঘটেছিল। হাট-তলায় সিমলাইদের কাপড়ের দোকানে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় গ্রামের লোক, তামাক পোড়াবার সঙ্গে সঙ্গে

নানা রকম আলাপ-আলোচনা ও গাল-গল্প করে থাকে। সেদিনকার আলোচনাটা ছিল 'পরিবার-নিয়ন্ত্রণ' সম্বন্ধে। নিয়ন্ত্রণের কর্তারা, হাটতলায় রাজু মিত্তিরের পাকা দালানটা ভাড়া নিয়ে তাঁদের অফিস খোলবার ব্যবস্থা করেছেন; এবং শীঘ্রই নাকি তা খোলা হবে। এই ব্যাপার নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে দুটো দল হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামবাসী এর পক্ষে, সামান্য কিছু এর বিপক্ষে। এই দু'-দলের মধ্যে সেদিনের আলোচনাটা সুরু হয়, আর মারা-মারির মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়; যদিও মাথা কারো ফাটে নি এবং মুখ দিয়ে রক্তও কারো বা'র হয় নি।

আগুন নিভে যাবার পরও যেমন তার ছাইগুলার মধ্যে থেকে দু'-একটা ফুল্‌কি চিকচিক করতে থাকে, তেমনি সেদিনের মারা-মারিটা হ'য়ে যাবার পরও, কথাটা নিয়ে ক'দিন ধরে সিমলাইদের দোকানে একটু-আধটু টীকা-টিপ্পনী, আলোচনা-আন্দোলন চলতে লাগল।

উপেন বলল—আমাদের গেরস্ত-ঘরে এই পরিবার-নিয়ন্ত্রণ জিনিসটা যে কত বড় মঙ্গলকর, একবার ভেবে দেখ, কার্তিক।

কার্তিক উৎসাহের সঙ্গে বলল—নিশ্চয়ই। ঐ অবিনেশের বউটার কি হল একবার ভাব দেখি! অস্থিচর্মসার হয়ে বারমাসই তাকে আঁতুড়ঘরে কাটাতে হয়েছে! শেষ পর্যন্ত বেচারা মরেই গেল।

বনমালী চাটুয্যে ফোঁস করে উঠল—দেখ, যে মরবার সে মরবে; যে বাঁচবার সে বাঁচবে; মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত। নারাণ সারখেলের যে এগারটা সন্তান; তার বৌয়ের বপুখানা একবার দেখেছ তো? ও রকম স্বাস্থ্য ক'টা মেয়েলোকের আছে?

—ঠিক তা নয়, চাড়ুয্যে!—ওদিক থেকে সুবল বলে উঠল—দেখতেই ঐ রকম গাবদা-গোবদা, ভেতরে কিছুই নেই! হঠাৎ একদিন হয়তো হার্টফেল হয়েই······

সুবলকে থামিয়ে দিয়ে করুণা বলল—কিন্তু আরো-একটা দিক তোমরা ভেবে দেখ। সারখেল-গিন্নী না হয় ধরলুম এক-শো'

বছরই বাঁচলো। কিন্তু কথা হচ্ছে, তিনি সন্তানই প্রসব করেছেন, মাঠের জমি তো ঐসঙ্গে প্রসব করেন নি। নারাণ সারখেলের বাবা ত্রিশ বিঘে জমি রেখে যান। তিনি মরে যাবার পর তাঁর তিন ছেলের প্রত্যেকের ভাগে পড়ল দশ বিঘে ক'রে। তারপর নারাণ সারখেলের তিন মেয়ে, আট ছেলে। ভগবান করুন, সব ছেলেগুলিই যেন বেঁচে থাকে,—তা হ'লে ধর, নারাণের অবর্তমানে প্রত্যেক ছেলের ভাগে যা পড়বে, তা'তে একটা প্রাণীর একবেলারও তো ভাত হবে না! কী তুর্দশায় ওরা পড়বে বল তো?

বিদ্যিনাথ ঘোষ একটু নড়ে-চড়ে ব'সে বলল—দেখ, ওটা মানুষের ভাগ্য। এই যে রতিকান্তদের এক ছটাকও জমি-জারাত নেই, তা ব'লে তারা কি উপোস ক'রে কাটাচ্ছে? সে উপায় ভগবানই ক'রে দেন।

—ভগবানই সব ক'রে দেবেন? নিজেদের কি কিছু করবার নেই? তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা সবই দিয়েছেন; সে হিসেবে, আমাদেরও তো কিছু করবার আছে।

—তা হয়তো আছে, কিন্তু এসব বিষয়ে 'খোদার ওপর খোদকারী' করাটাও তো ঠিক নয়।

সুরেশ একমুখ তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বলল—এটা ঠিক 'খোদার ওপর খোদকারী' নয়। একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি খরচ ক'রে ব্যাপারটা বুঝতে হয়। দেশে আগের তুলনায় যে রকম লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে ··

বাকি কথাটা উপেনই টপ ক'রে বলে ফেলল—তা'তে আর শেষ পর্যন্ত কেউ তু'বেলা পেট পুরে খেতেও পাবে না।

জগবন্ধু সিমলাই একখানা ন'হাতি ধুতি পাঁচ টাকা তের আনায় বিক্রি ক'রে টাকাটা বাক্সে রেখে বলল—তা উপীন যা বলছে, তা ঠিকই। কেন না, লোকের পুষ্যিই বাড়ছে, মাঠের জমি তো আর বাড়ছে না; যা ছিল তাই আছে। ভুঁইপাড়ার বেন্দা গয়লারা ছিল তু'টো ভাই আর তু'টো বউ; এখন একবার দেখে এস

ঠেলাখানা ! দু'বেলায় প্রায় তিরিশখানা পাতা পাড়তে হয়। সেদিন শুনলুম, ওদের ছোট বউটা না কি আবার শিগগির আঁতুড়ে ঢুকবে।

সুবল বলল—আরে, ভুঁইপাড়া পর্যন্ত যেতে হবে কেন, আমাদের সিদু চক্কোত্তিরই দেখ না কেন। স্কুল থেকে পায় তো মোটে বত্রিশটি টাকা, কিন্তু ছেলে-মেয়েতে একটি পাল। কথায় বলে—'একটা পেট সোনা দিয়ে ভরানো যায়, কিন্তু দশটা পেট ছাই দিয়েও ভরাতে পারা যায় না।' ঠিক কিনা, বল ?

পাঁচু ব'লে উঠল—কিন্তু যাই বল তোমরা, ভগবানের খুবই অবিচার। এক সংসারে বন্যার মত ছেলে-মেয়ে আসছে, আবার আর-এক সংসারে দেখ, একটা ছেলের জন্যে মাথা কুটে মরছে, তবু…

—তার মানে, কোন সংসার হ'ল ঠিক যেন, তোমার গিয়ে—'চেরাপুঞ্জী', আবার কোন সংসার—এক্কেবারে সাহারা-গোবি। —কথাটা ব'লেই উপেন হো হো ক'রে হসে উঠল।

পাঁচু বলতে লাগল—তবেই দেখ, ভগবানের এটা খুবই অবিচার নয় কি ? চেরাপুঞ্জীর দু'টো ফোঁটা তো তিনি সাহারাতে দিতে পারতেন। কত মেয়েলোক একটা ছেলের জন্যে নীলকণ্ঠ চক্কোত্তির 'পঞ্চানন'কে কত তোয়াজ করে পূজো দিয়ে যাচ্ছে, কত 'ঢেলা' বাঁধছে, কিন্তু……

বাধা দিয়ে জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বলে উঠল—থাক, 'পঞ্চানন' নিয়ে আর তক্কা-তক্কির দরকার নেই, আবার সেদিনের মত মারামারি বাধবে !

সুতরাং আন্দোলনটা সেদিন ঐখানেই থেমে গেল।

* * * *

রেল-ষ্টেশন থেকে গ্রামে ঢুকতেই মুন্সীপাড়া। মুন্সীপাড়ায় শিবকালী মুখুজ্যের বার-বাড়ীর নিকোনো বকুলগাছটার তলায় রোজ বিকেলের দিকে পাড়ার স্ত্রীলোকদের যেমন বৈঠক ব'সে থাকে, সেদিনও তেমনি ব'সে ছিল। বৈঠকে আলোচনাটা হচ্ছিল, 'পরিবার-নিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কে।

কেষ্টর মা বললে—সত্যি, ওরা যা করছে, তা খুবই ভাল।

নারাণের খুড়ী বলল—ভাল আবার নয়? কিন্তু ঘোষালের বৌটার কথা একবার ভাব দেখি। এ-বছর একটা, ও-বছর একটা। বৌটার চেহারা দেখেছ তো? ঠিক যেন মড়া-কাঠ!

দত্তদের ছোট গিন্নী বলল—শুধু কি তাই? পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিতেই তো বাপকে পথে বসতে হবে। তারপর, সাতটা ছেলে; তার একটাকেও লেখাপড়া শিখিয়ে যে মানুষ করতে পারবে, তা পারবে না। কী দুর্দশাই যে হবে ওদের···ঐ যে, ওঁরা দু'জন আসছেন।

রাস্তার দিকে মাটির পাঁচিলটা প'ড়ে গিয়ে ভেতর-বার এক হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল, দু'জন ভদ্রমহিলা এই দিকেই আসছিলেন। তাঁরা সামনে আসতে দত্তদের ছোটগিন্নী তাঁদের উদ্দেশে বলল—সেদিন স্কুল-ঘরে আপনাদের ম্যাজিক-লাণ্ঠান দেখলুম; খুবই আমাদের ভাল লাগল। আপনারা গেরস্তঘরের মস্ত একটা মঙ্গল করতে যাচ্ছেন। আসুন না।

—আসছি ভাই; একবার রাজুবাবুকে খবরটা দিয়ে আসি যে, পয়লা থেকে এখানে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু হবে। সেই দিন থেকেই আমাদের ডাক্তার এখানে আসছেন।

—তা ভাল, যান তা হ'লে; কিন্তু ফেরবার পথে আসবেন একবার, যেন লুকিয়ে পালিয়ে যাবেন না।

—না, তা যাব না। প্রথমদিন আমাদের দেখে, খ্রীষ্টান মিশনারী মেয়েলোক মনে ক'রে আপনারাই তো ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন; ছুটে গিয়ে, একেবারে দরজায় খিল! মনে আছে তো দিদি, সেদিনের কথা?—বলে, ওঁদের মধ্যে একজন হি হি ক'রে হেসে উঠলেন।

নারাণের খুড়ী বলল—দেখুন, তখন তো আপনাদের চিনতুম না। আমাদের ছোটবেলায় সত্যিই ঐ রকম সব মিশনারী মেয়ে-লোকেরা দুপুরের দিকে হাতে বইপত্তর-কাগজ নিয়ে লোকের বাড়ি

বাড়ি ঘুরে বেড়াত, বাড়ির ঝি-বউদের কত রকম কাগজ, বই, ছবি দিয়ে যেত, আর যীশুকিষ্টের গান গাইত। আমরা মনে করেছিলুম এতদিন পরে আবার বোধ হয় তাঁরাই আসতে শুরু করলেন।

হাসতে হাসতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি বলল—যাই হোক ভাই, এখন আমাদের দেখে সে জুজুবুড়ীর ভয় তো আর নেই?

—ফেরবার পথে যদি না আসেন, তা হ'লে জুজুবুড়ীর ভয় আমাদের থাকবে—ব'লে নারাণের খুড়ী হেসে উঠল।

ভদ্রমহিলাদ্বয় রাজু মিত্রের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বলল—আধ-ঘণ্টাটাক পরেই আসছি। সেদিনের মত মুচমুচে মুড়ি, বুঝেছেন তো, ঘানির তেল আর গোটা দিয়ে।

—সে তো আমাদের ভাগ্য ভাই।

পথের বাঁকে মহিলা দু'টি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

* * * *

—আপনারা থাকতে, এতবড় একটা ক্ষতি আমার হবে, মিত্তির মশাই?

—এতে তোমার ক্ষতিটা কি হবে?

—আমারই তো ষোল আনা ক্ষতি!

সন্ধ্যার পর রাজু মিত্রের বৈঠকখানায়, নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী ও রাজু মিত্রের সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছিল।

নীলকণ্ঠ বলল—আমারই তো ষোল আনা ক্ষতি মিত্তির মশাই! ভেবে দেখুন না। আমার যেটা চলবার পথ, সে পথ ওঁরা বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন।

—কিন্তু তা তো ঠিক দিচ্ছেন না!

—আজ্ঞে, তাই বৈকি। আমার 'পঞ্চানন'এর কাছে সকলে আসেন—সন্তানের জন্যে মানত করে, আর ওঁরা সেই সন্তান-হওয়া বন্ধ করবার ব্যবস্থা করবেন।

—আহা-হা, তোমার 'পঞ্চানন'কে তো ওঁরা উঠিয়ে দিচ্ছেন না। সন্তান কামনায় যাঁরা আসবার, তাঁরা ঠিকই আসবেন।

ওঁদের উদ্দেশ্য হল, এক জননীর বহু সন্তান হওয়াটা বন্ধ করা। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ।

—কিন্তু অন্যদিকেও তো ওঁরা হাত বাড়াচ্ছেন।

—তার মানে ?

—সন্তান হবার ব্যবস্থাও যে ওঁদের আছে; অর্থাৎ ওঁদের এদিক-ওদিক দু'-দিকের ব্যবস্থাই যে আছে।

—তুমিও দু'-দিকের ব্যবস্থা কর।

—তা কি করে হবে ?

—খুবই হবে। 'সোজা পঞ্চাননে'র সঙ্গে তুমি 'উল্টো পঞ্চাননে'র ব্যবস্থা করে ফেল। যাঁরা সন্তান-হওয়া বন্ধ করতে চান, তাঁরা 'উল্টো পঞ্চানন'এর পূজো দেবেন।

—উল্টো পঞ্চানন ?

—হ্যাঁ, উল্টো পঞ্চানন! যা বলি, শোন। তোমার ঠাকুর-ঘরের পেছনদিকের দেয়ালটা ফুটিয়ে, ওদিকেও একটা দরজা বসিয়ে দাও। সামনের দিকের মত, ওদিকেও, কোশা-কুশি, ঘণ্টা, শাঁখ, টাট, প্রদীপ—পূজোর সব সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখ। যে-সব স্ত্রীলোক সন্তান-হওয়া বন্ধ করতে চাইবে, তাঁদের জন্যে 'উল্টো পঞ্চানন' পূজো। বুঝতে পেরেছ ? অর্থাৎ ঠাকুরের পিঠের দিকে বসে পূজো করবে। আসল কথাটা—বিশ্বাস। যাঁরা পূজো দিতে আসবেন, ঐ বিশ্বাসের জোরেই কাজ হবে। যাও, তাই করে ফেল।

নীলকণ্ঠ কথাটা ভাবতে লাগল।

রাজুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, পেছন দিকে কি-একটা গাছ আছে না ?

—আজ্ঞে, নিমগাছ।

—ঠিক হয়েছে। সোজার বেলায় যেমন পূজো দিয়ে মনসাগাছে ঢেলা বাঁধতে হয়, উল্টোর বেলা ঐ নিমের ছোট একটা ডাল আঁকশি দিয়ে ভেঙে দিতে হবে। বুঝলে না? এতে তোমারও দু'-দিক বজায় থাকল।

গভীর চিন্তিতভাবে নীলকণ্ঠ বলল—কিন্তু……

—এতে আর কোন ‘কিন্তু’ নেই, নীলু। যাও, এই ব্যবস্থা কর গে। ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিল হাজার-পাঁচ ছাপিয়ে ফেল ; লিখো—‘স্বপ্নাদেশ’। ওঁদের হল—বৈজ্ঞানিক, তোমার হল—দৈবিক। জোর অবশ্য বিজ্ঞানেরই বেশি। তা হ’লেও আমাদের দেশে দৈবে বিশ্বাসীরও অভাব নেই। সুতরাং ওঁদের তো জোরের সঙ্গে চলবে, এবং তা চলা উচিতও ; তবে—তোমারও অচল থাকবে না, চলে যাবে। অবশ্য আমি এমন বলছি না, যে দৈবের কোন মূল্য নেই ; বরং দৈবই সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং মূল্যবান। তবে ক’জন লোক প্রকৃত দৈব-সাধক বল ? যা’ক, এসব কথা বেশি বলবার আর দরকার নেই। তবে, তোমার কোন ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। যা বললাম, তাই করগে যাও। জান তো—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু……।

নীলকণ্ঠ হতভম্ব হ’য়ে রাজুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নীতি-কাহিনী

পুরানো চাকর নীলমণি। এ-বাড়ীতে সে অনেকদিন থেকেই কাজ করছে। কী-একটু সামান্য ত্রুটিতে সেদিন যোগেশবাবু তার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠলেন ; বললেন,—নেই মাংতা, দূর হয়ে যা'ক ও। পয়সা ছড়ালে লোকের অভাব হয় ? ওকে আমি কিছুতেই রাখব না।

গৃহিণী এসে ওকালতি করলেন,—ও বলচে, এবার থেকে ও খুব সাবধান হ'বে, এবারটা ওকে মাপ কর।

যোগেশবাবু বললেন,—কিছুতেই নয়, আমি অন্য লোক রাখব।

নীলমণি অপরাধীর মত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে বললে,—একটু অন্যমনস্ক ছিলুম, তাই হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে। আর কখনো…

—ঐ নিয়ে তর্ক করতে গেলি কেন ? কিছুতেই তোকে আর রাখব না, তুই আজই এ-বাড়ি থেকে চলে যা।

—আপনি যেতে বললে যাব বই কি বাবু! কিন্তু…

—কিন্তু-টিন্তু আমি শুনব না। আমি অন্য লোক ঠিক করেছি, তুই আজই চলে যাবি। বুঝলি ? আজই।

নীলমণি আর কোন কথা বললে না. এক-পা এক-পা করে সেখান থেকে চলে গেল।

সন্ধ্যার পর গৃহিণী মণিমালা এসে যোগেশবাবুকে বললেন,—নীলুকে ত জবাব দিলে, অন্য একজন ত চাই।

—নিশ্চয়ই চাই, এবং কালই হয় ত পাওয়া যাবে। তা ও-বেটা গেল কখন ?

—তখনই চলে যাচ্ছিল ; আমি খাওয়া-দাওয়া করে যেতে বললুম, তাই গেছে। যাবার সময় তোমাকে খুঁজলে, পেন্নাম করে যাবে বলে। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে।

—তা হ'লে দুপুরবেলায়ই গেছে ?

—হ্যাঁ, খেয়ে-দেয়ে, সমস্ত বাসন-কোসন মেজে, রান্নাঘর ধুয়ে-মুছে, বৈঠকখানা ঝাঁট দিয়ে, তোমার তিন কলকে তামাক সেজে রেখে, চায়ের সরঞ্জাম সব গোছ-গাছ করে—বেলা তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় চলে গেছে।

—বেশ হ'য়েচে। আমি খুব ভাল লোক ঠিক করেচি; হয় ত কাল থেকেই আসবে।

পরের দিন একটি ফিট-ফাট জোয়ান ছোকরা চাকর এ-বাড়িতে দেখা দিল। যোগেশবাবু তাকে বললেন,—বেশ ভাল করে, দেখে-শুনে কাজকর্ম করবি; বুঝলি?

নতুন চাকর কোন জবাব দিল না; চুপ করে রইল।

তিন-চারদিন বেশ গেল। তারপর মণিমালা একদিন যোগেশ-বাবুকে বললেন,—চাকরটার মেজাজ একটু রোখা-চোখা গোছের বলে মনে হচ্চে।

—কেন বল ত?

—ওর ধরণ-ধারণে যেন বুঝতে পাচ্ছি। আজ সকালে বললুম, বাসনগুলো একটু চেপে মাজিস, বেশ-তেমন ঝক-ঝকে হয় না কেন? তা, আমাকে বললে—ভাল করেই মাজি, ঝক-ঝকে না হ'লে কী করব?

—তা এমন-কোন অন্যায় ত বলেনি। ভাল করেই হয়ত মাজে, ঝক-ঝকে না হয় ত ও তার কী করবে?

—তা নয়; কথাটা ভাল করে ত বলা যায়। যেন একটু রুক্ষ-রুক্ষ ভাব। তাই বলচি।

—ও কিছু নয়। খাঁটি লোক আর কি!

হপ্তা-খানেক কেটে গেল।

যোগেশবাবুর দু'তিনটি বন্ধু বেলা তিনটের সময় আসবেন। বেলা তখন প্রায় আড়াইটে। মণিমালাকে বললেন,—কিছু নোনতা আর মিষ্টি দোকান থেকে এনে রাখতে হ'বে, চাকরটাকে একবার ডাক ত?

উঠানের এক ধারে টালির-ছাওয়া ছোট একটা ঘর ছিল। তার একদিকে কয়লা-ঘুঁটে থাকত, বাকীটায় নীলমণি শু'ত। নতুন চাকরও সেইখানে শোয়। মণিমালা বাইরে থেকে দু'তিনবার ডেকে তার কোন সাড়া পেলেন না। তখন যোগেশবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন, সে ঘুমুচ্ছে।

—এই! ওরে! শুনছিস?

কোন সাড়া নেই।

—এই ছোকরা! এই দুর্মতি! এ যে কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমুচ্ছিস! ওঠ্ শিগ্গির—ওঠ!—ওঠ্—ওঠ্! এই দুর্মতি!

সোজা হয়ে উঠে বসে সে বললে,—নাম ভ্যাস্তা ক'রে আমায় ডাকবেন না, বলে রাখচি। আমার নাম কি—দুর্মতি?

সামনে সাপ দেখলে যেমন লোকে চমকে ওঠে, যোগেশবাবু সেই রকম চমকে উঠলেন। বললেন,—তোর ঐ দাঁত-ভাঙা নাম—দুর্গাপতি—সব সময় আমার খেয়ালে থাকে না।

—এবার থেকে একটু খেয়ালে রাখবেন।

—বটে! সাতদিনেই যে দেখচি তেল বেশ জমে উঠল! ষ্টুপিড কোথাকার!···আচ্ছা,···হচ্চে ব্যবস্থা। এখন উঠে পড় শিগ্গির; দোকান থেকে খাবার কিনে আনতে হবে। ওঠ্—ওঠ্!

চোখ-মুখ রগড়াইতে রগড়াইতে দুর্গাপতি বললে,—দুপুরবেলা ঘণ্টা দু-তিন বিশ্রামের সময়। আমি এখন কিছু করতে পারব না।

রাগে যোগেশবাবুর চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠল। কোনও কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বা'র হ'ল না। তাঁর 'খাঁটি লোক' তখন বলে উঠল,—ইউ টু বি ক্যান্ মাষ্টার, বাট্ আই ইস্ নট্ ইয়োর স্লেভ!

নির্মেঘ আকাশে বজ্রাঘাত!

দুর্গাপতির কথা শুনে, মিনিট-খানেক যোগেশবাবু পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তুমুলকাণ্ড বেঁধে গেল। যোগেশবাবু তাকে এই-মারতে-যান ত এই-মারতে-যান। যোগেশবাবু যত

বলেন,—সে-ও তত বলে। পাড়ার ১৫।২০ জন প্রতিবেশী এসে সেখানে জমায়েত হ'য়ে পড়ল। যোগেশবাবুর সেই তিনটি বন্ধুও এসে পড়লেন। ব্যাপার দেখে সকলেই অবাক!

ব্যাপারটা তুমুল হ'লেও, মূল রহস্যটি তখনি জানা গেল। ছোকরাটি গরীবের ছেলে। পর-পর ছু'বার স্কুল-ফ্যাইন্যাল ফেল করায়, বাপ খুব তিরস্কার করে। ছোকরার অভিমান আর রাগ ছিল খুব বেশী। অভিমানে বাড়ী থেকে কলকাতায় চলে আসে। উদ্দেশ্য—আর কখনো বাপের মুখ দেখবে না; ভিক্ষে করে খেতে হয়, লোকের বাড়ী চাকর থাকতে হয়, কুলিগিরি করতে হয়, তাতেও স্বীকার।

যাক, দুর্গাপতিকে সেইদিনই স-সম্মানে বিদায় দেওয়া হল।

মণিমালা বললেন,—কিন্তু চাকর একটা ত চাই, তা না হ'লে ত মহা মুশকিল হবে।

যোগেশবাবু বললেন,—কিছু মুশকিল হবে না। ছু'-এক দিনের ভেতরেই আমি ভাল চাকর যোগাড় করে ফেলব।

* * * * *

—তোমার দেশ কোথা?

—আজ্ঞে, দেশ আমার ডায়মণ্ড-হারবারের ঐ দিকে—ছিরাকোল।

—নাম কি তোমার?

—সদাই দাস। বাবা রেখেছিলেন—সদানন্দ; তা, সকলে ঐ সদাই বলে ডাকে।

—তা বেশ। এখন কথা হচ্চে, বেশ মন লাগিয়ে কাজ-কর্ম করতে পারবে ত? তোমার কথা-বার্তা শুনে ত মনে হয়, তুমি ভাল লোক, সরল, সাদা-সিদে,……

—সেটা বাবা আপনাদেরই আশীর্বাদ। বোকা হ'য়ে কী হ'বে বাবা? লোকে আমায় বলে—তুমি সাদা-সিদে মানুষ, তাই তোমার নামটা সোজা দিক দিয়েও যা, উল্টো দিক দিয়েও তা।

যোগেশবাবু বললেন,—ওঃ! সদাই দাস···হ্যাঁ, তাই ত বটে!

সদাই আকাশের দিকে চেয়ে, জোড়-হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে,—ঐ উঁনিই সত্য, বাবা—আর সবই ত মিছে। জাল-জুচ্চুরি, চুরি-ফাঁকিবাজি—এ-সবে কি পেট ভরে রে, বাবা? তাঁর ছি-চরণে মাথা দিয়ে পড়ে থাকলে, এই চামড়ার পেটটার জন্যে কাউকে কি আর ভাবতে হয়।

সদাই সেইদিন থেকে এ-বাড়ীতে বহাল হয়ে গেল। যোগেশ-বাবু মণিমালাকে বললেন,—ভগবান এবার ভাল লোক জুটিয়ে দিলেন।

গৃহিণী মণিমালা বললেন,—হ্যাঁ, লোকটি খুবই ভাল। মানুষের চেহারা আর কথা-বার্তাতেই অনেকটা বোঝা যায়। তোমার ঐ ছোকরা চাকরটার চেহারা আর কথা-বার্তা শুনেই আমার গোড়ায় একটু সন্দেহ হয়েছিল।

দেশের মধ্যে কত ঝড়-ঝাপ্টা ব'য়ে গেল। শিক্ষক-ধর্মঘট গেল; ছাত্র-ধর্মঘট গেল; ট্রাম-ষ্ট্রাইক হ'ল। যোগেশবাবুর সংসার কিন্তু দিব্যি চলতে লাগল। কোন গোলমাল নেই। যোগেশবাবু খান-দান, ঘুমোন, বেড়ান, সংসার করেন, ধর্ম করেন, সংসার-ধর্মও করেন, তা ছাড়া সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসে পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তাস-পাশা খেলেন এবং খবরের কাগজ পড়ে নানারূপ আন্দোলন-আলোচনাও করেন। স্ত্রী মণিমালা নিশ্চিন্তমনে রান্না-বান্না করেন, গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম করেন, অবসর-কালে পুরানো খবরের কাগজ বা মাসিক-পত্র পড়েন, মাঝে মাঝে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে গঙ্গাস্নান করে আসেন, দক্ষিণেশ্বরে যান, কালীঘাটে যান। আর সদাই, সদাই প্রফুল্ল তার অন্তর। সমস্তদিন সংসারের কাজকর্ম করে, কাজের ফুরসতে মণিমালার কাছে এসে বসে, পাঁচটা ভাল কথা শোনে ও শোনায়, কখনো-কখনো বা তা'র ঘরটির মধ্যে বসে গুন-গুন করে দুটো ঠাকুর-দেবতার গান গায়। এইভাবেই বেশ সহজে, শৃঙ্খলায় এবং নির্বিবাদে এ-বাড়ির দিন কাটতে লাগল।

একখানা বাংলা বই সিনেমা-মহলে খুব হুল্লোড়ের সৃষ্টি করেছে। মণিমালা বললেন—মিনুর মা, সুরোর দিদি, ও-বাড়ির জ্যেঠি-মা, ওরা সব যাচ্চে, আমাকে যেতে বলচে; যাব ওদের সঙ্গে আজ, বইখানা দেখে আসব?

যোগেশবাবু সম্মতি দিলেন। ছ'টা থেকে ন'টার শো। মণিমালা ওদের সঙ্গে পাঁচটার পরই বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই, প্রসন্নবাবু এসে যোগেশবাবুকে বললেন,—এক চাল হবে নাকি?—মানে, 'দাবা-বড়ে' খেলা। যোগেশবাবু বললেন,—তা, বসলে হয়। আজ বাড়িতে ওরা কেউ নেই, এস, বসে বসে দু-এক দান খেলাই যা'ক।—মতিবাবুও এসে দেখা দিলেন। খানিক পরে কিশোরীবাবুও এসে জমলেন। সুতরাং খেলাটাও বেশ জমল। খেলায় বসবার আগে, যোগেশবাবু সদাইকে বলে এলেন, তুই যেন কোথাও বেরোসনি; ওরা ন'টাতেই এসে পড়বে। সদরে খিল লাগিয়ে রাখবি, যেন খোলা রাখিসনি। সদাই বলল—সে আর আপনাকে বলতে হবে না, দেবতা; এই চায়ের কাপ-ডিশ চারখানা ধুয়ে রেখেই সদরে খিল লাগিয়ে দিয়ে বসব। আপনার চার কলকে তামাক সেজে-টেজে ঠিক করে রেখে দিয়েচি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা খুব জমে উঠল। নৌকো, গজ, ঘোড়া, কিস্তি ইত্যাদির জোর শব্দে বৈঠকখানার বদ্ধ বাতাস মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগল। সদাই চায়ের বাসন ধুয়ে, সদরে খিল লাগিয়ে, তা'র ঘরটির মধ্যে বসে গুন-গুন করে গান ধরল—

আমার সকল দুখ্যু দূর কর হে দুখ্য-হারি,
যেন জন্ম-জন্ম ঐ চরণ্যে থাকতে পারি।

ন'টার কিছু পরেই মণিমালা সিনেমা থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সদর দরজা খোলা হাঁ-হাঁ করছে; শোবার ঘরের দরজাও তাই; বৈঠকখানায় 'গজ-বড়ে'র চীৎকার চলেছে। সদাইয়ের কোন সাড়া-শব্দ নেই। ঘরের মধ্যে লাইটটা জ্বালাই ছিল। মণিমালা ব্যস্ত ও ভীত হ'য়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন···সর্বনাশ! ট্রাঙ্ক ভাঙা,

আলমারি খোলা ! সব চুরি হয়ে গেছে ! মণিমালার মাথা ঘুরে গেল। সদাই কোথা ? তার কোনই পাত্তা নেই ! সদা ! সদা ! সদাই ?

সেই সরল সাদা-সিধে, ভাল লোক—যার নামের এদিক-ওদিক দুদিকই সোজা, সেই সাধু সদাই দাস প্রায় হাজার দুই-আড়াই টাকার জিনিস চমৎকার চক্ষুদান দিয়ে সরে পড়েছে। চার ভরির হার একছড়া, ছ' ভরির তাবিজ, সোনার বোতাম, আংটি তিনটে, ফাউন্টেন পেন, রিষ্ট-ওয়াচ, চার-পাঁচখানা ভাল শাড়ি, দু'খানা আলোয়ান, একখানা শাল, একখানা ছুরি, দু'খানা কাঁচি, দুটো স্ক্রু-ড্রাইভার, এক কৌটো চা, আধ প্যাকেট সিগারেট, একটা সিগারেট-লাইটার, টর্চ, ছোট একটা পকেট আয়না, সেফ্‌টি ক্ষুর, গায়ে মাখবার তিনখানা সাবান, এক শিশি সেন্ট, একখানা বড় বিছানার চাদর—ইত্যাদি।

প্রসন্নবাবু বললেন,—লোকটাকে আমার যেন কেমন-কেমন লাগত। ওই যে গলায় তুলসীর মালা, অত্যন্ত বিনয়ী আর মিষ্টি-মিষ্টি কথা, তাইতেই আমার···

মতিবাবু বললেন,—ওর দেশে একবার খবর নিন। আর পুলিসেও একটা খবর দিয়ে রাখুন ; তবে ও হল পাকা চোর, ওকে পাওয়া আর···

কিশোরীবাবু বললেন,—যা গেছে তার আশা ছেড়ে দিন যোগেশবাবু। তবে, এবার থেকে সাবধান হোন।

অনেকে অনেক রকমই পরামর্শ দিলেন। যোগেশবাবু দিন-কতক একেবারেই মুষড়ে পড়লেন। মণিমালা বললেন,—যা হ'বার তা' ত হল, এখন বসে বসে হা-হুতাশ করে ত কোন লাভ নেই। এদিকে, চাকরও ত একজন চাই, নইলে সংসারের কাজ-কর্ম ত বসে থাকবে না।

দিন-দুই পরে, যোগেশবাবু একজন পশ্চিমা লোককে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা নাম ক্যেয়া হ্যায় ?

—হাম্‌রা নাম দীপাল ; হাম্‌কো ত আপ জানতা হায়, বাবু। ঐ বোস-বাবুকো কয়লাকা ছ্কানমে হাম কাম করা হায়। আপকো এ কুঠিমে হাম কয়লা দে গিয়া তিন চার দফে।

—এখন কি আর কাম কর না ওখানে ?

—থোড়া থোড়া কাম করতা হায়। দো-চার মোট হামকো দেতা হায় : দো-আনা করকে মোট মিলতা। উসমে হামকো ক্যায়সে চলেগা বাবু ; উসি লিয়ে হাম···

—তা, তোমায় আমি রাখতে পারি ; বাংলা কইতে পারবে ত ? কেঁও না, আওরাত-লোক তোমরা হিন্দী ত নেই সম্‌জাগা।

—হাঁ বাবু, হামি ত জানি ; ষোলা বরষ হামি বাংলামে আছি বাবু।

—তা ঠিক আছে। তা' হ'লে আজ থেকে কামমে লাগ যাও। ঐ যো হাম তোমকো বোলা হায়, শুকা বিশ রূপেয়া করকে তুমি পাবে।

—আউর দো রোপেয়া বাবুসাব মেহেরবাণী কিজিয়ে, নেই ত···

—বাংলামে বোলো—বাংলামে বোলো।

লোকটা হাসতে হাসতে বলল,—বাংলা ত আউর থাকবে না বাবু, কাগজমে লিখতা,—সব হিন্দীমে হ'য়ে যা'বে, হিন্দী বাত সব-কইকো বোলতে হোবে। বাবু, আউর দোঠো রূপেয়া···

—শোন, ঐ বিশ রূপেয়া এখন পা'বে : ছ' এক মাহিনা ভাল করে কাজ করলে, আর ছ' টাকা করে বাড়িয়ে দেবো।

দীপাল বাহাল হয়ে গেল। মাসে কুড়ি টাকা মাইনে ; শুকা। অর্থাৎ এখানে খাবে না। বাজারের দিকে ওর বাসা আছে। সেখানে ওর 'জেনানা' আছে। ছ'টায় এসে কাজ-কর্ম করে ১১টায় চলে যা'বে ; আবার তিনটেয় এসে রাত ৮৷৯টায় চলে যা'বে। যোগেশবাবু মণিমালাকে বললেন—দেখিয়ে-শুনিয়ে নিলে এ লোকটা নেহাত মন্দ হ'বে না। তবে, ও রাত্তিরে থাকতে পারবে না ; বাসায় ওর বউ আছে, সুতরাং···

যাই হোক, দীপাল সেইদিন থেকেই কাজ শুরু করে দিলে।

* * * * *

—ও মাইজি! মাইজি! মাইজি!

খ্যাঁক্‌-খেঁকে গলায়, উঠানে দাঁড়িয়ে কে ডাকল,—ও মাইজি! মাইজি!

বেলা তখন আন্দাজ দেড়টা। মণিমালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, কুশ্রী চেহারার একটা পশ্চিমা মেয়ে-লোক। পাহাড়ে জমির মত, দেহের চারি দিকে তার কোথাও-বা গর্ত, কোথাও-বা ঢিবি। কোমর-ভাঙা। একটা চোখের মণি চোখের বাইরে বেরিয়ে পড়েচে। কিন্তু চোখ ছুটোতে সযত্নে কাজল অথবা সুর্মা টানা। দাঁতগুলোর মধ্যে জ্যামিতির সব রকম 'ফিগার'ই আছে এবং সেগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। তাদের ছু-চারটে বেরিয়ে একটু ফাঁকায় আসবার জন্যে যেন ঠেলা-ঠেলি লাগিয়েছে। রংটাকে ঠিক কালো বলা যায় না। না কালো, না ফ্যাকাশে, না নীল, না মেটে, না ছাই রং। এই সবের একত্র মিশ্রণে যে একটা অসাধারণ রং হয়, সম্ভবত তাই। তবে, তার মধ্যে কালোরই বেশী প্রভাব। মাথা কেশ-শূন্যও নয়, কেশযুক্তও নয়; যে ক'গাছা ছাই-মেটে রংয়ের চুল আছে, তাই দিয়েই ছোট্ট একটা ঝুঁটির মত ঘাড়ের দিকে টেনে বাঁধা। বয়স তা'র আন্দাজ করতে কা'রোই সাধ্যে কুলোবে না। তা'র চেহারা দেখে বয়স বলা তার সৃষ্টিকর্তারও সাধ্যের অতীত। এ-হেন একটি অপরূপ মূর্তিকে ছুপুরবেলা উঠানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মণিমালা জিজ্ঞাসা করলেন,—কে তুমি? কী চাও?

—তোমরা হিঁয়া যো আদ্‌মি কাম করতা হ্যায়, ও হাম্‌রা আদমি হ্যায়, মাইজি। ও কাঁহা হ্যায়? জেরা বোলায় দিজিয়ে তো।—এই সূত্রে সে হিন্দীতে বাংলাতে মিশিয়ে যা বললে তা মোটামুটি এই—

সে দীপালের বউ। দীপাল তা'কে মোটেই দেখতে পারে না। সেই জন্যে ছুস্‌রি একটা মেয়ে-লোককে দীপাল 'সাদি' করে অন্য

ঘর ভাড়া করে আছে ; আগের বউকে দীপাল আর দেখে না—শোনে না ; লুকিয়ে লুকিয়ে, পালিয়ে থাকে। তাই তা'র একবার দেখা পেলে, সে তা'র গলায় গামছা বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যোগেশবাবু ঘর থেকে তেড়ে বাইরে এসে বললেন—আভি হ্যায় নেই। চলা যাও। হিঁয়া হল্লা মত্ করো। তোমারা ঘরমে উস্‌কো সাথ বোঝা-পড়া করো।

কিন্তু বকতে-বকতে সে বাড়ির বা'র হ'য়ে গেল।

বিকালে দীপাল এলে যোগেশবাবু তাকে বললেন,—আমার এখানে বাড়ীর মধ্যে এসে ও এ-রকম করে কেন? তা হলে ত তোমায় আমি রাখব না। এ-সব তোমাদের কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড?

—আরে বাবু, ও হাম্‌রা কই নেই আছে ; ও আওরাত…

খুব একটা ধমক দিয়ে যোগেশবাবু বললেন,—শূয়ার কাঁহেকা—এ সব এখানে চলবে না। তোম আর মত্ আও হিঁয়া।

পরের দিন সকালে, দীপাল কল-তলায় বাসন মাজছিল, সেই সময় এক পাল রং-বেরংয়ের কুলী-শ্রেণীর পশ্চিমা আর সেই মেয়েটি বাড়ির সামনেকার রাস্তায় এসে মহা হল্লা জুড়ে দিলে ও দীপালের উদ্দেশে নানারূপ অশ্লীল সম্বোধন বর্ষণ করতে লাগল। লোক-গুলোর মধ্যে কারো খালি গা, কা'রো-বা মাথায় ময়লা একখানা গামছা বাঁধা, আবার কা'রো মালকোঁচা-বাঁধা ময়লা কাপড়ের উপর সাবান-কাচা ফর্সা পাঞ্জাবি। যোগেশবাবু ও পাড়ার দু'একজন ভদ্রলোক তাদের চলে যেতে বললেন। কে কা'র কথা শোনে! তা'রা দীপালের উদ্দেশে সমানে হল্লা করে যেতে লাগল। তার উপর, সেই মেয়েটির কাংস্য-কণ্ঠ সমস্ত হল্লাকে ছাপিয়ে যেতে লাগল। যোগেশবাবু চীৎকার করে বললেন,—তোমলোককো সব পুলিসমে দেগা, উল্লুক কাঁহেকা। হিঁয়াপর হল্লা মত্ করো ; চলা যাও সব! তারপর তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে, এক গাছা

শঙ্কর মাছের চাবুক নিয়ে দীপালকে তেড়ে গেলেন। দীপাল ভয়ে বাইরে পালিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গেই সেই লোকগুলো তাকে জাপ্‌টে ধরে ফেললে, আর সেই মেয়েটি ছুটে এসে এক হাতে দীপালের কাপড় ধরে, আর এক হাতে এক গাছা ঝাঁটা নিয়ে তাকে মারতে মারতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কেলেঙ্কারির একশেষ! রাস্তায় বহুলোক জমে গেল।

অবস্থাটা কতক শান্ত হলে মণিমালা বললেন,—কি জঘন্য ব্যাপার! নীলমণিকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে এ সব কী হ'তে লাগল?

যোগেশবাবু একটি কথাও আর বললেন না; তেলের বাটি নিয়ে নীরবে তেল মাখতে লাগলেন।

সেই দিন স্নানাহার করে, জামা কাপড় পরে তিনি বেরিয়ে গেলেন; মণিমালাকে বলে গেলেন, ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

সন্ধ্যার পর মণিমালা রান্নাঘরে বসে কুট্‌নো কুটছিলেন, হঠাৎ কা'র পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখেন, নীলমণি চৌকাঠে মাথা রেখে তা'কে প্রণাম করছে। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—কে? নীলমণি?

—হ্যাঁ মা; ভাল আছেন ত? বাবু বারাসাতে গিয়ে আমাকে নিয়ে এলেন।

অকিঞ্চনের দাদা

॥ এক ॥

গ্রামে বারোয়ারী হইবে।

তাহারই সম্বন্ধে অন্য পাণ্ডাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় অকিঞ্চন বাহির হইতে বাড়ী ফিরিলে, স্ত্রী ক্ষান্তমণি রান্নাঘরের ভাতের হাঁড়ির কাছ হইতে উঠিয়া, মুখখানাকে ভাতের হাঁড়িরই মত করিয়া বলিয়া উঠিল,—যার রাজ্যি শুদ্ধ দেনা, সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতেই ব'সে থাকে। কেন না, পাঁচজনে তাগাদা করতে এসে তাকে পাবে না দেখতে, আর আমায় যে দশটা কথা শুনিয়ে যাবে, সে আমি সইতে পারব না।

অকিঞ্চন হুঁকার মাথা হইতে কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে কহিল,—তাগাদা করতে এসে কে তোমায় দশটা কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল, শুনি ?

—গাঁ শুদ্ধ পাওনাদার, ক'জনের নাম করব ? আর তা'দেরই বা দোষ কি ? তা'রা দিয়ে রেখেছে, আর চাইতে আসবে না ? তবে, তোমায় আমি ব'লে রাখছি, আমার কাছে কেউ যেন এসে মুখ-নাড়া দিয়ে দশ কথা না ব'লে যায়। নেবার সময় সব নিয়ে রেখেছ, আর এখন দেবার বেলা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়া'লে ত হ'বে না। সকালবেলা বিনে জেলের মা কি মুখ-নাড়াটাই না আমায় দিয়ে গেল !

বৎসর-দুই আগেও অকিঞ্চন প্রত্যহ স্নানান্তে গীতা-পাঠ করিত, মিথ্যা কথা কহিত না এবং ফেলী নাপতিনীর গচ্ছিত গহনা ও টাকা, তাহার গয়া-কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর কড়ায়-গণ্ডায় তাহাকে বুঝাইয়া ফেরৎ দিয়াছিল।

অকিঞ্চন কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, সহসা মুক্ত সদর-দরজার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় তৎক্ষণাৎ সেইখানেই সে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল, কাঁধের গামছাখানি মাথায় দুই তিন পাক জড়াইল

এবং সাজা তামাক ও টীকা মাটীতে ঢালিয়া ফেলিয়া, হুঁকা উল্টাইয়া তাহারই খানিকটা জল তাহাতে ঢালিয়া একটা প্রলেপের মত করিয়া কপালে ও ঘাড়ে বেশ করিয়া মাখাইয়া, শুইয়া শুইয়া গোঙাইতে লাগিল।

মুহূর্ত পরেই সদর-দরজায় লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল এবং অকিঞ্চনেরই ঠাকুরমশাই, ও-পাড়ার রাজু ঘোষাল ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ ঘোষালমশায় চোখে একটু কম দেখেন। লাঠিগাছটি পৈঠার পাশে ঠেসাইয়া রাখিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিতেই, ঘরের ভিতর হইতে ক্ষান্তমণি একখানি কম্বলের আসন হাতে করিয়া বাহিরে আসিল এবং সেখানি সেইখানে পাতিয়া দিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। অকিঞ্চন কহিল,—ঠাকুরমশাই, স'রে এসে পা-টা একটু এগিয়ে দিন, আমার আর মাথা তোলবার ক্ষমতা নেই।

ঘোষালমশায় তাহার কাছে আগাইয়া আসিলেন এবং ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাহার মাথার দিকে দেখিয়া কহিলেন,—কি হয়েছে বাবা, পড়ে-টড়ে গেছিস না কি ?

—পড়ে যাইনি ঠাকুরমশাই, লাঠির চোট! আপনার আশীর্বাদে যে ফিরে এসেছি, এই যথেষ্ট।

সপ্তাহ-খানেক আগে অকিঞ্চন ঘোষাল-মশায়ের বাড়ী গিয়া কথায় কথায় তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, সে দুই একদিনের মধ্যেই কোন একটা বিশেষ দরকারে একবার কলিকাতায় যাইবে। ঘোষাল মশাই ইহা শুনিয়াই তাঁহাব দুই নাতনীর জন্য দুইখানি ভাল দেখিয়া আল্‌পাকার ছাপা শাড়ী আনিয়া দিবার জন্য, শিষ্য অকিঞ্চনের হাতে তখনি দশটি টাকা গছাইয়াছিলেন। কয়দিনের পর আজ তাহারই খোঁজ লইতে বৃদ্ধ প্রায় অর্ধ-ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গ্রামের পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে শিষ্যের কাছে আসিয়াছেন।

অতঃপর লাঠির চোটের কাহিনী বলিতে গিয়া অকিঞ্চন কহিল,—আয়ু ছিল, তাই ফিরে এসেছি, নইলে—ঠিক সন্ধ্যেটি সবে হয়েছে। আপনার টাকা দশটা পকেটে নিয়ে কাপড় দু'খানা কেনবার জন্যে বেরুলুম। আমাদের রামবাগানের গলির ভেতরটায় তখনও গ্যাস জ্বালা হয়নি, খুবই অন্ধকার। গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়ব, এমন সময় পেছন থেকে মাথার ওপর এক লাঠি। তখুনি ঘুরে পড়লুম। কিন্তু টাকা দশটা তবুও ছাড়িনি, পকেটশুদ্ধ প্রাণপণে মুঠো ক'রে ধরেছিলুম। তারপর হাতের ওপর আর এক লাঠি। তারপর—ব্যস্!

—বলিস্ কি রে?

—সেইখানেই শুয়ে প'ড়ে ভাবলুম যে, ঠাকুরমশায়ের টাকা, যেমন ক'রে হোক কোন সময়ে তাঁকে এ ফিরিয়ে দিতেই হবে, নইলে মহাপাতকী হ'তে হ'বে।

—সে টাকা আর তোকে দিতে হবে না। ধরতে গেলে আমারই জন্যে এত বড় এই বিপদটা তোর ঘটলো। সে টাকা আবার আমি তোর কাছ থেকে গচ্ছা নেব? হ্যাঁ বাবা, মাথা ফেটে রক্ত-টক্ত বেরোয় নি ত?

—বোধ হয়, তা'ও বেরিয়েছিল, অন্ধকারে আর অতটা ঠাওর করতে পারিনি। এখন আশীর্বাদ করুন, শীগগীর যেন ভাল হ'য়ে উঠি—বলিয়া আর একবার অকিঞ্চন তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

তারপর উভয়ে আরও দুই চারিটি কথা হইল। ঠাকুরমশাই তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, ভাবনা করিতে নিষেধ করিলেন এবং টাকা দশটি যে তিনি কিছুতেই তাহার কাছ হইতে লইবেন না, বার বার সে কথা জানাইলেন এবং তৎপরে লাঠিগাছটি তুলিয়া লইয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে প্রাঙ্গণ পার হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল,—গুরুর কড়ি ফাঁকি দিয়ে খেলে, পাপের যে আর সীমে-পরিসীমে নেই। আমার

ইচ্ছে হচ্ছিল, ঘর থেকে ছুটে এসে বলি যে,—ঠাকুরমশাই, সব মিছে কথা। উঃ! কি হ'লে গো তুমি?

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া অকিঞ্চন বলিল,—এক ঘটি জল নিয়ে এস আগে, মুখটা ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলি। পাপের যে সীমে-পরিসীমে নেই, তা একবার নয়, লাখোবার সে কথা সত্যি। দুর্ভোগ কি কম! তামাক আর হুঁকোর জলের পচা গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবার যোগাড় হচ্ছে!

বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিয়া অকিঞ্চন পুনরায় কলিকা লইয়া তামাক সাজিল এবং হুঁকাটি লইয়া সদরের দরজার বাহিরে আসিয়া বসিল।

কাপড়ের দোকানের শরৎ নন্দী স্নান করিয়া ফিরিতেছিল, কহিল,—পালের পো, গামছার দরুণ ক'গণ্ডা পয়সা অনেকদিন থেকে বাকী প'ড়ে রয়েছে, ওটা দিয়ে দিলেই ভাল হয়।

অকিঞ্চন হুঁকায় একটা টান দিয়া কহিল,—খুচরো বলেই আর মনে থাকে না। ওর জন্যে ভয় বা তাগাদার কোন দরকার নেই। পাঁচ আনা বুঝি?

—পাঁচ আনা কি হে? দু'খানা চার হাতি গামছা—সাড়ে দশ আনা। তা, খুচরোটা আর বেশী দিন ফেলে রেখো না হে, দিয়ে দিও। বাঁড়ুয্যের কাছে তোমার বড় দেনার কি হ'ল? শুনলুম, সুদ নাকি আসল ছাপিয়ে উঠেছে?

অকিঞ্চন নীরব থাকিয়া তামাক টানিয়া যাইতে লাগিল নন্দী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কহিল,—যতই হোক, সুদে আসলে শ' চারেক হয়েছে। চার শ' টাকা দেনা আবার দেনা? কোলকাতা গিয়ে চার মাস থাকতে পারলেই শোধ করে দেবো। কিন্তু বেরুতেই যে পারছি না, সেই হয়েছে মুস্কিল।

সদর-দরজার কপাট বন্ধ করিয়া অকিঞ্চন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই দেখিল, স্বয়ং মহাজন কালী বাঁড়ুয্যে মহাশয় এক হাতে

একটি লাউ ঝুলাইয়া খিড়কী দিয়া বাটী ঢুকিতেছেন। অকিঞ্চনকে দেখিয়া কহিলেন,—কি রে বাপু, ব'লে ব'লে ত হার মানলুম। দু'শ টাকার ত আড়াইশ' টাকা সুদই হ'য়ে গেল। নালিশটা ঠুকে দিলে হাকিমই বলবে কি, আমিই বা বলব কি? আর তুই দিবিই বা কোত্থেকে? তাই ত বলি যে, অনর্থক সুদ না বাড়িয়ে, জমীটা না হয় রেজেস্ট্রী করেই দিয়ে দে, বিশ-পঁচিশ টাকা ওর ওপর না হয় আরও দিয়ে দেব এখন।

জোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া অকিঞ্চন কহিল,—কি বলছেন, খুড়ো ঠাকুর! পনর বিঘের জমীটা ঐ টাকাতে—

মুখের কথা চাপা দিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় কহিলেন,—শুনতে ঐ যা পনর বিঘে, কিন্তু জমীটার ভেতর কি আছে বাপু? একেবারে ফোঁপরা জমী! ধানের ত মুখ দেখবার যো নেই, যা দু'চার আঁটি হয় খড়। তা, তাই বা তোর দেখবার আবিশ্যকটা কি আছে। টাকা কিন্তু আমি আর ফেলে রাখতে পারব না, এই আষাঢ় কিস্তির ভেতরেই বেবাক টাকা সব আমায় চুকিয়ে দিয়ে দিতে হবে, নইলে—

উঠানের একটি চারা আমগাছ হইতে গোটা দুই চারি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া অকিঞ্চন কহিল,—বোশেখ মাসের এই রদ্দুরে আর মাথা গরম্ করবেন না, খুড়ো ঠাকুর, আসুন, তামাক খান। লাঠিটি বাগালেন কোত্থেকে?

প্রশ্ন বাঁড়ুযো মশায় কাণে তুলিলেন না। অকিঞ্চনের পিছন পিছন তিনি দাওয়ার উপর উঠিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া আম-পাতার নল পাকাইতে মনোযোগী হইলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পর বাড়ুয্যের এই দেনা লইয়া অকিঞ্চনের সহিত ক্ষান্তর খুব একচোট ঝগড়া হইয়া গেল এবং অকিঞ্চন রাগের মাথায় প্রদীপ, পিলসুজ, জলের ঘড়া, তেলের ভাঁড়, লক্ষ্মীর হাঁড়ি, হুকা, কলিকা, লণ্ঠন, বাল্‌তি আছাড় দিয়া ভাঙ্গিল, আম-কাঠের সিন্দুকের উপর শাবলের ঘা মারিল, দা দিয়া ক্ষান্তকে কাটিতে যাইয়া উঠানের সেই চারা আমগাছটির উপরই দুই চারি কোপ

বসাইয়া দিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে যদি যথার্থই ছিমন্ত পালের ছেলে হয় ত কালই সে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে এবং দেনার টাকা হাতে না করিয়া আর কখনও বাড়ী ফিরিবে না।

॥ দুই ॥

কিন্তু কালই তাহার যাওয়া হইল না।

পরের দিন সমস্ত সকালটা অকিঞ্চনকে ঘরে দেখা গেল না। গাঁয়েতে সে ছিল না। বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় পাশের গ্রাম হইতে সে ফিরিতেছিল।

কলিকাতা যাইতে হইলে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা তাহার দরকার এবং এ টাকা সে গাঁয়ের কাহারও কাছে হাত পাতিলে যে পাইবে না, তাহা সে ভালরূপই জানিত, তাই প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সে মামুদপুর গিয়াছিল। কিন্তু যাহার কাছে সে গিয়াছিল, সেখান হইতেও তাহাকে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

নদীর ঘাটে আসিয়া অকিঞ্চন দেখিল যে, দুইটি লোক বটগাছের ছায়ায় বসিয়া জলপান খাইতেছে। তাহাদের সহিত দুই একটি কথায় সে জানিতে পারিল যে, তাহারা ছাগলের পাইকার, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া ছাগল কিনিয়া তাহারা চালান দেয়। অকিঞ্চন তাহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাদের জলপান খাওয়া শেষ হইলে, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধার দিয়া আসিতে আসিতে একস্থলে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল,—ঐটি।

পাইকার দুইটি সেইখানে একটি গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। অকিঞ্চন যাহাকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, ঐটি, এক্ষণে কৌশলে সেই খাসী ছাগলটিকে ধরিয়া পাইকারদের কাছে টানিয়া আনিল। তাহারা তাহার মাজা টিপিয়া, সর্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া, দর-দস্তুর করিয়া শেষে পাঁচ টাকায় তাহার মূল্য রফা করিল, এবং কোমরের গেঁজে হইতে একজন পাঁচটি টাকা অকিঞ্চনের হাতে

গনিয়া দিয়া খাসীটির গলায় একগাছি দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে উভয়ে মামুদপুরের দিকে অগ্রসর হইল।

সে দিন অকিঞ্চন গৃহ হইতে বাহির হইল না। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়াই শুনিল, ফকির হাড়ির বড় ছাগলটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

পরদিন পাঁচটি টাকা, দুইখানি কাপড় ও একখানি গামছা সম্বল করিয়া অকিঞ্চন আড়াই ক্রোশ দূরবর্তী বর্ধমানের ষ্টেশনে আসিয়া প্রথম ট্রেণ ধরিবার জন্য অতি প্রত্যূষে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। ক্ষান্ত জিজ্ঞাসা করিল,—রাগ করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? প্রত্যুত্তরে অকিঞ্চন সদর্পে ও সলম্ফে দাওয়া হইতে প্রাঙ্গণে পড়িল এবং সশব্দে সদরের দরজা খুলিয়া নিশা-শেষের অল্পান্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

ষ্টেশনে পৌছিয়া গামছা-জড়ান কাপড়খানির খুঁটে বাঁধা পাঁচটি টাকা হইতে একটি টাকা খুলিয়া লইয়া অকিঞ্চন কলিকাতার টিকিট কিনিল। পনর আনা এক পয়সা টিকিটের দাম বাদে তিনটি পয়সা যাহা ফেরৎ পাইল, তাহা জামার পকেটে রাখিয়া বেঞ্চির উপর বসিতেই গাড়ীর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

বর্ধমানে দশ মিনিট গাড়ী থামিয়া থাকে।

গাড়ী আসিলে অকিঞ্চন গাড়ীর ভিতর আসিয়া বসিয়া চা-ওলাকে ডাকিল এবং কাপের শেষ বিন্দুটুকু পরম তৃপ্তিতে পান করিয়া বিকৃতমুখে চা-ওলাকে পকেটের সেই তিনটি পয়সা দিয়া কহিল,—এক্কেবারে ঠাণ্ডা আর তেঁতো, এসামাফিক চা আর কারুকে দেও, পুলিসমে দেগা। অকিঞ্চন কট্‌মট্ করিয়া তাহার দিকে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যে, সে চায়ের বাকী একটি পয়সার কথা আর উত্থাপন করিতেই অবসর পাইল না এবং নীরবে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

চায়ের পর পান এবং বিড়িও আবশ্যক। কিন্তু অকিঞ্চনের পকেটে এই অত্যাবশ্যক ব্যয়ের জন্য খুচরা পয়সা আর ছিল না।

দুইটা পয়সার জন্য টাকা ভাঙ্গাইতেও সে পারে না। সুতরাং সম্মুখ দিয়া অসংখ্য পান-বিড়িওয়ালা যাইলেও সে ডাকিল না। গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা এবং গার্ডের বাঁশী বাজিয়া ওটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, গাড়ী যখন অল্প অল্প চলিতে সুরু করিল, তখন অকিঞ্চন মুখ বাড়াইয়া একজন পান-বিড়ি-ওলাকে ডাকিল। এক পয়সার পান ও এক পয়সার বিড়ি লইয়া, দুই দিককার পকেটে অকিঞ্চনের পয়সা খুঁজিতে খুঁজিতেই পানওয়ালা ও গাড়ী একসঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে প্ল্যাটফরমের সীমান্তে আসিয়া পড়িল এবং গাড়ীর ভোঁস্-ভোঁসের সঙ্গে পানওয়ালার ফোঁস্-ফোঁস্ বৃথাই বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গেল।

সকাল বেলাকার গাড়ী, প্যাসেঞ্জারের তত ভিড় ছিল না। মগরাতে দুই একজন লোক অকিঞ্চনের কামরায় আসিয়া উঠিল এবং গাড়ী ছাড়িবার ঠিক পূর্বক্ষণে একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দরজা ঠেলিয়া এই কামরাটিতে উঠিয়া অকিঞ্চনের বেঞ্চের একধারে আসিয়া বসিল।

স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, দোহারা, মুখখানি ঢল-ঢল, চোখ দুটি আয়ত, দৃষ্টি উজ্জ্বল। পরনে একখানি দেশী তাঁতের তাবিজ-পাড় শাড়ী, নাকে ওপ্যালের নাকছাবি, কাণে কাণ-ফুল, কপালে উল্কী, মুখে দোক্তা-দেওয়া পাণ এবং তারই রসে ঠোঁট দুইটি টুক্‌টুকে। মাথায় একটুখানি যে ঘোমটা ছিল, বসিতে গিয়া সেটুকু খসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাই আবার তুলিয়া দিবার সময় অকিঞ্চন দেখিল, তাহার হাতে উল্কীতে লেখা রহিয়াছে—'পটল—হরিনাম সত্য'।

অকিঞ্চন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—মেয়েদের গাড়ীতে উঠলে না কেন. বাছা? কোথায় নামবে?

—হাওড়ায়। আপনি?

. —আমিও হাওড়ায়।

স্ত্রীলোকটি লজ্জা ও সঙ্কোচশূন্য হইলেও খুবই স্বল্পভাষী। কিন্তু একটি দুইটি করিয়া অকিঞ্চন অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত

অনেক কথারই আলাপ করিল, তাহার ফলে জানিতে পারিল যে পটল শুষ্ক কিংবা শস্যহীন নহে, তাহা যথেষ্ট সারবান এবং সরস, অর্থাৎ টাকা-কড়ি, গহনা-পত্র তাহার যথেষ্ট। আত্মীয়-স্বজন তাহার কেহ নাই, এক দূর সম্পর্কীয় বোন-পোকে আনিয়া কিছু দিন নিজের কাছে আনিয়াছিল, কিন্তু সে নেশা-টেশা করিতে শেখায় তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

অকিঞ্চন কহিল,—তোমার কোন ভয় নেই বাছা, হাওড়ায় নেমে তোমার বাসায় আমি পৌঁছে দিয়ে না হয় যাব'খন। তুমি স্ত্রীলোক, এটুকু উপ্‌গারও যদি না করি—

গাড়ী লিলুয়াতে আসিয়া থামিল।

কিছু পরেই টিকিট-কলেক্টারবাবু গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সকলের টিকিট চাহিয়া লইল। যাইবার সময় দেখিল, পাইখানার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া দরজায় দুইটি ধাক্কা দিল। অকিঞ্চন কহিল,—একটি মেয়েলোক গেছে। আরও কয় সেকেণ্ড দাঁড়াইয়া থাকিয়া টিকিটবাবু অকিঞ্চনের দিকে চাহিয়া বলিল,—পাশের গাড়ীতে আমি থাকলুম, টিকিটখানা বার ক'রে রাখতে বলবেন, আমি আসছি।

কিন্তু পুনরায় তাহার আসিবার পূর্বেই ঘণ্টা দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল এবং পটল আসিয়া তাহার আসনে বসিল। অকিঞ্চন টিকিটের কথা বলিলে বলিল,—টিকিট আমাদের থাকে না, পাশ আছে।

হাওড়ায় নামিয়া অকিঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল,—তা হ'লে সঙ্গে যেতে হবে কি ?

একটুখানি হাসিয়া পটল কহিল,—যেতেও পারেন, না গেলেও কোন ক্ষতি হবে না। একখানা গাড়ী করলেই হবে'খন। তবে আমার এই গামছাখানা দয়া ক'রে একটু ভিজিয়ে এনে দিন। সেই ওদিকে বোধ হয় কল আছে।

পটল তত্রত্য একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। অকিঞ্চন তাহার কাপড়ের পোঁটলাটা তাহার পার্শ্বে রাখিয়া গামছা

ভিজাইতে চলিয়া গেল এবং মিনিট পাঁচ-সাত পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তথায় পটল কিংবা পোঁট্‌লা দুইটির কোনটিই নাই। সেইখানে দাঁড়াইয়া অকিঞ্চন চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনখানেই পটলকে দেখিতে পাইল না। নিমেষে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার কাছে যে আর একটি পয়সাও নাই! এই বিদেশে একেবারে রিক্তহস্তে—পটলের ভিজা গামছাখানি উত্তপ্ত মস্তকে দিয়া অকিঞ্চন তখন চারিদিকে ঘুরিয়া তাহার সন্ধান করিতে লাগিল।

॥ তিন ॥

হাটখোলার ডালপট্টি ছাড়াইয়া একটু উত্তরে রাস্তার উপর একখানি টিনের মাঠগুদাম—দোতলা। তাহারই নীচে বারান্দার একাংশে কেহ পুণ্যসঞ্চয়োদ্দেশে এই বৈশাখে জল-সত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অকিঞ্চন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চারিটি ভিজা ছোলা ও একরত্তি গুড় হাত পাতিয়া লইয়া, তাহাই চিবাইয়া এক পেট জল পান করিবার পর একটু বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে সেই বারান্দারই এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

ভিতরের ঘরখানির একধারে একখানি তক্তাপোষ পাতা ছিল। তদুপরি গৃহের অধিকারী দে মহাশয় একটি কাঠের বড় বাক্স সম্মুখে লইয়া, দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার খর্ব দেহের উপরকার ক্ষুদ্র মস্তকটি ক্ষুর দিয়া মুণ্ডিত, কণ্ঠে তিন হালি তুলসীর মালা, নাসাগ্রে তিলক, বক্ষে ও কপালে গঙ্গা-মৃত্তিকার ছাপ।

দে মহাশয়ের সদর নীচের তলার এই ঘরখানি, অন্দর দ্বিতলে। তথায় তাঁহার নিঃসন্তান গৃহিণী কর্ত্রীরূপে সর্বদা বিরাজ করেন।

বহুদিন পাটের আড়তে কয়ালের কার্য করিয়া দে মহাশয় বেশ দু'পয়সা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রৌঢ় বয়সে অর্থ

সঞ্চয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের দিকে মনোযোগী হইয়াছেন। প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করেন, সকাল-সন্ধ্যায় নাম জপ করেন, বৎসর বৎসর জল-সত্র দেন এবং প্রতিবাসী কুলী, মজুর, কারিকর, গাড়োয়ান, ফেরিওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতিকে চোটায় ও খতে টাকা কর্জ দিয়া, একদিকে তাহাদের সাহায্য করেন ও অপরদিকে নিজের সময় কাটান। বন্ধকী কারবারও কিছু কিছু তাঁহার আছে।

প্রায় মিনিট পনের বসিয়া থাকিবার পর অকিঞ্চন উঠিয়া দরজার পাশ হইতে উঁকি দিয়া দেখিতেই, দে মহাশয় তাহাকে ভিতরে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথায় থাক, বাপু ?

অকিঞ্চন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—একটু থাকবার স্থানই খুঁজে বেড়াচ্ছি। দেশ থেকে আজই এখানে এসেছি। গাড়ীতে এক মেয়ে-জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়ে পোঁটলা-শুদ্ধ টাকা-কড়ি সব খুইয়ে বসেছি। তাই ঘুরে ঘুরে ক্ষিধেও যেমন পেয়েছে, তেষ্টাও তেমনই লেগেছে।

অকিঞ্চন দে-মহাশয়ের কাছে তাহার অদ্যকার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণন করিল। সমস্ত শুনিয়া দে মহাশয় কহিলেন,—এইখানেই থেকে যাও, বাপু। এ শুনে কি ক'রে আর মুখটি বুজে থাকি বল। নিজের দিকে ত কখনই চাই না, পরের দিকে কিন্তু না চেয়ে থাকতে পারি না। কারুর কষ্ট-বিপদের কথা শুনলেই মনটা অমনি ধড়ফড় ক'রে ওঠে।

অকিঞ্চন তক্তপোষের একধারে বসিয়া পড়িল। দে-মহাশয়ের সহিত তাহার অনেক কথা হইল এবং সেইদিন হইতে তাঁহার আশ্রয়ে নিঃসম্বল নিরাশ্রয় অকিঞ্চনের স্থানলাভ হইল।

দে-মহাশয় কহিলেন,—ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি, শূদ্রস্য শূদ্রণং গতি। কে কারে খাওয়ায় বাপু, নারায়ণই সব করেন, করান। অকিঞ্চন দুর্ভাবনার হাত হইতে কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

সন্ধ্যার পর অকিঞ্চন দেখিল, দে-মহাশয়ের চোটার কারবারটি নেহাৎ সামান্য নহে। অনেক টাকাই তাঁহার এই কারবারে আসিতেছে, যাইতেছে। একটি টাকা কেহ চোটায় ধার করিলে দে মহাশয়কে প্রত্যহ একটি করিয়া পয়সা দিয়া যাইতে হয়। এইরূপ দুই মাস পনের দিন দিলে ঐ টাকাটি উসুল যায়। এক টাকা লইলে যেমন প্রত্যহ এক পয়সা, তেমনই পাঁচ টাকা লইলে প্রত্যহ পাঁচ পয়সা, পঁচিশ টাকা লইলে প্রত্যহ পঁচিশ পয়সা, এই হিসাবে দিবার রীতি। কিন্তু সময় দুই মাস পনের দিন। যে যত টাকা লউক না কেন, তত পয়সা হিসাবে তাহাকে ঐ দুই মাস পনের দিন দিয়া যাইতে হইবে। তবে দে মহাশয়ের আর একটি নিয়ম আছে। টাকা কর্জের সময়, গৃহীত টাকা হইতে সিকি অংশ অর্থাৎ টাকা প্রতি চার আনা দে মহাশয়কে তখনি দিয়া দিতে হয়। দে মহাশয় বলেন,—ঐ চারি আনার মধ্যে দু'পাই দালালী, ছ' পাই বারোয়ারী, দু' পাই ৺বৃত্তি, দেড় পাই আফিস খরচ, আর বাকী পয়সাটা দরিদ্র-ভাণ্ডার,— অর্থাৎ দে মহাশয়ের ঘরের দেওয়ালে ঝোলান, পয়সা ফেলিবার ছিদ্রযুক্ত, চাবি-তালা-লাগান একটি ক্ষুদ্র টীনের বাক্স। টাকা কর্জ দিবার সময়, খাতকের নিজ হাত দিয়াই দে মহাশয় নির্দিষ্ট পয়সা উহার মধ্যে ফেলাইয়া দেন, নিজে তাহা স্পর্শ করেন না। কাণা-খোঁড়াকে দান, ভিখারীদের মুষ্টি-ভিক্ষা, বৈশাখ মাসের জলসত্র প্রভৃতি ইহা হইতেই হয়।

যাহা হউক, দে মহাশয়ের আশ্রয়ে প্রথমদিন অকিঞ্চনের একরূপ কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনে সে একটু নাকমুখ সিঁটকাইল। তৃতীয় দিনে বুঝিল যে, এখানে তাহার থাকা চলিবে না। পাঁচ-সাত দিন পরে সে একেবারেই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। এই কয়দিনেই দে মহাশয় তাহাকে যে যে কাজের ভার দিয়াছিলেন, তাহা এই:— অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সর্বাগ্রে তাহাকে গঙ্গা হইতে বড় এক ঘড়া গঙ্গাজল আনিতে হয়। কারণ, রৌদ্রাধিক্য বশতঃ দে মহাশয় হাটিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে পারেন না, বাড়ীতেই গঙ্গাজলে

প্রাতঃস্নান করেন। গঙ্গাজল আনিয়া দিয়াই অকিঞ্চনকে রাস্তার কল হইতে জল তুলিয়া জল-সত্রের বড় বড় জালা তুইটি ভরিতে হয়। তাহার পর আফিস-ঘর, বারান্দা, অন্দর, সদর সর্বত্র ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা, বাজার যাওয়া ও বাজারের হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া। বাজার করা অপেক্ষা, দে মহাশয়ের কাছে বাজারের হিসাব দেওয়াই কঠিন কার্য। একটি করিয়া সিকি তাঁহার বাঁধা বাজার-খরচ ছিল। এই এক সিকির হিসাব দিতেই অকিঞ্চন বাহিরে যেমন ঘামিয়া উঠিত, ভিতরে তেমনই ফুলিয়া উঠিত। যাহা হউক, বাজারের হিসাব দিবার পরই তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সেই বাজার হাতে লইয়া তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে হয়। কারণ, তাহার আসিবার পর হইতেই দে-গৃহিণী সকাল বেলাটায় আর আগুনের তাতে যান না, কারণ, তু'বেলা আগুনের তাত তাঁহার সহ্য হয় না। সুতরাং রন্ধন শেষ করিয়া কর্তা-গৃহিণীর আহারের পর তাহার খাইতে প্রত্যহই বেলা তুইটা আড়াইটা বাজিয়া যায়। তাহার পর, কোন দিন মশারি, কোন দিন বালিসের ওয়াড়, কোন দিন বিছানার চাদর, কোন দিন বা দে-গৃহিণীর পরণের শাড়ী কিংবা দে মহাশয়ের আট হাত ধুতি বা ফতুয়া এবং তৎসহ ছুঁচ ও সূতা তাহার কাছে আসিয়া পড়ে। দে মহাশয় তাহাকে বলেন,—কাজকে ভয় কর্‌তে নেই হে, কাজই হচ্ছে লক্ষ্মী। আমি তোমায় আল্‌সে হয়ে ব'সে থাকতে কখনই দিচ্ছি না; পর ব'লে ত তোমাকে আমি মনে করি না। তাহার পর সন্ধ্যা হইলেই, দে-মহাশয়কে তাঁহার বাক্স এবং টাকা-পয়সা, চোটা, দালালী, বারোয়ারী, ৶বৃত্তি প্রভৃতি লইয়া এবং অকিঞ্চনকে হিসাবের খাতা-পত্র দোয়াত-কলম লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়।

লেখা-পড়া, হিসাব-পত্রের কাজ এখন সমস্তই অকিঞ্চনের উপর পড়িয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে সুরু করিয়া টাকার লেন-দেন, জমা-খরচ, বকা-বকি প্রভৃতি যখন শেষ হয়, তখন ঘড়ীর বড় বড় ঘণ্টাগুলি সবই বাজিয়া যায়। তাহার পর দে মহাশয়ের পিছন

পিছন, তাঁহার সেই প্রকাণ্ড বাক্সটি মাথায় করিয়া দ্বিতলে তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার পর তবে অকিঞ্চন অব্যাহতি পায়। রাত্রিতে শুধু দু'টি ভাত দে-গৃহিণী নিজেই রাঁধিয়া লয়। তরকারি সকালেরই থাকে, শুধু তাহা গরম করিয়া লওয়া হয় মাত্র।

সে দিন ঠিক সন্ধ্যার পরই একটি প্রৌঢ় বয়সের স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দে মহাশয় তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—কালীর মা বুঝি, কিছু খবর আছে গা?

স্ত্রীলোকটি দরজার ধারে একটু সরিয়া আসিয়া কহিল,—হ্যাঁ বাবা। গয়নাগুলো দিতে হবে, নিয়ে যাব।

এক-পা এক-পা করিয়া কালীর মা ভিতরে যাইয়া দাঁড়াইল।

দে মহাশয় তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—টাকা সব হিসেব ক'রে এনেছ?

—হিসেব আপনি কর না, বাবা। কার্তিক মাসের ২০শে ত আমি টাকা নিয়ে গেছি। কার্তিক ছেড়ে দিলে, তা হ'লে ছ'মাস হয়। একশ' টাকা আসল আর ছ' মাসে ছ' টাকা সুদ—

—তা কি হয়? কার্তিকের ২০শে হলে কি আর কার্তিক বাদ দিতে পারি?

—তা, যেমনেই ধর বাবা, একমাস ত বাদ যাবে। কার্তিক ধ'রে নাও ত বোশেখের সুদ বাদ যাবে।

—তা কি হয়, কালীর মা? বোশেখেরও ত অর্ধেক হয়ে গেল। ও সাত মাসের সাত টাকাই তোমায় দিতে হবে বাছা।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কালীর মা কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর কহিল,—আচ্ছা বাবা, যা নিলে ভাল হয়, তাই নাও। কত কষ্ট ক'রে যে এই সুদের টাকা দেওয়া, তা ওপরের ঐ যিনি রাত-দিনের কর্ত্তা, তিনিই জানেন। নেহাৎ দায়ে ঠেকে বউটার গা থেকে খুলে এনে তখন দিয়েছিলুম, তাই এই ছ' মাস না-খেয়ে না-দেয়ে ঋণ শোধ করতে এসেছি।—বলিয়া আঁচলের গেঁরো খুলিয়া

দশখানি দশ টাকার নোট ও ছয়টি টাকা দে মহাশয়ের সম্মুখে তক্তপোষের উপর রাখিয়া কহিল,—একটা টাকা কাল সকালে তা হ'লে দিয়ে যাব।

নোট কয়খানি ও টাকা কয়টি গণিয়া লইয়া দে মহাশয় বাক্সর মধ্যে রাখিয়া বন্ধ করিলেন এবং তৎপরে খাতা খুলিয়া কালীর মা'র হিসাবটা একবার দেখিয়া লইয়া, অকিঞ্চনকে টাকাটা জমা করিয়া লইতে বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরেই কয়েকটি সোনার জিনিষ আনিয়া দে মহাশয় কালীর মা'র হাতে দিলেন। কালীর মা সেগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া কহিল,—হার ছড়াটা?

দে মহাশয় কহিলেন,—হার? হার-টার ত কিছু ছিল না বাপু। যেমন দিয়েছিলে, তেমনই—

—সে কি বাবা! আমার নাতির গলার সরু বিচে-হার? আপনি ভাল ক'রে দেখ গিয়ে! হার যে আমি এর সঙ্গে দিয়ে গেছি। দোহাই বাবা, ভাল ক'রে খুঁজে—

—কি মুস্কিল! ভাল ক'রে আর খুঁজবো কোথায়? দেখি হে খাতাখানা। এই দেখ—২০শে কার্তিক, মারফত কালীর মা, এক জোড়া সোনার বালা, ২টা আংটী, একখানা চিরুণী, এক জোড়া মাকড়ি। লেখার কড়ি কি কখনও বাঘে খায়, বাছা। হার যদি দিয়ে যেতে ত এই খাতাতেই আমার থাকতো। তোমাদের মেয়ে-মানুষের এই সব হ্যাঙ্গামে-কাজে—সেবার হরিপদর পিসী এই রকম মিছে কি-রকম হৈ-চৈটা বাধালে, কিন্তু ভাগ্যে আমার খাতা ছিল, তাই ত রক্ষে পেয়ে গেলুম।

কালীর মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—বাবা ওপরে ভগবান্ আছেন, এখনও চন্দর-সূয্যি উঠছে, এর সঙ্গে আমার নাতির গলার বিচে-হার দিয়ে গেছি। এক ভরি দশ আনা দিয়ে আমার কালী যে দিন তৈরী করে আনলে, তার দু'দিন পরেই দিয়ে গেছি বাবা। বাছা আমার আর গলায় দিতে পারে নি। খাতা তোমার ভাল

ক'রে দেখ, ঠিকই লেখা আছে। না থাকে, লিখতে ভুলে গেছ, নিশ্চয়ই ভুলে গেছ।

—কিছু ভুল হয় নি—ভুল হয় নি, খাতায় যে লেখা নেই।

কালীর মা'র কাঁদাই শুধু সার হইল। অনেক তর্ক, অনেক কথা, অনেক চোখের জল ফেলার পর, চোখের জল মুছিতে মুছিতে কালীর মা চলিয়া গেল।

দে মহাশয় বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেইখানে তাকিয়ায় মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিলেন—ভাল হ্যাঙ্গামা যা হোক, মাগী শাপ-মন্দ কতকগুলো দিয়ে গেল। আস্পর্ধা দেখ একবার, ছোটলোক কোথাকার!

পরদিন প্রাতঃকালে দোতলার বারান্দায় রাঁধিতে রাঁধিতে উঁকি দিয়া অকিঞ্চন দেখিল, ছেলেদের গলার একগাছি নূতন বিচে-হার হাতে লইয়া দে-গৃহিণী দে মহাশয়ের সহিত ফিস্-ফিস্ করিয়া কি কথা কহিতেছে।

সেইদিন রাত্রিতে খাতকদের দেনা-পাওনা কাজ-কর্ম শেষ হইলে অকিঞ্চন দে মশাইকে কহিল,—আট ন'দিন হয়ে গেল, আমার একটা মাইনে ঠিক ক'রে তা হলে—

চমকিত হইয়া দে মহাশয় কহিলেন,—মাইনে?—মাইনে-টাইনের ব্যবস্থা ক'রে পরের মত তোমায় আমি দেখতে পারব না। কোন্ দিন গিন্নী হয় ত তা হ'লে ব'লে বসবেন—মাইনে। ছেলে-পুলে, ভাইপো, ভাগ্‌নে কোথাও কেউ নেই। টাকা-কড়ি যা হোক কিছু করেছি। চিরকাল আর এ সব নিয়ে অবিশ্যি থাকবো না। হয় ত শীগ্‌গীরই ছ'জনে আমরা বৃন্দাবনে চ'লে যাব। এইগুলো স্থির হয়ে ভাল ক'রে বুঝে দেখো। এর বেশী আর আমি কিছু বলব না।

অকিঞ্চন আর বেশী কিছু বলিল না।

অনেকক্ষণ পরে কি-একটা বলিতে যাইয়া দেখিল, অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থাতেই দে মহাশয়ের নাক ডাকিতেছে। অকিঞ্চন একটু উচ্চ-কণ্ঠে কহিল,—আপনি কি ঘুমুলেন?

একটু নড়িয়া উঠিয়া দে মহাশয় কহিলেন,—বেশ ঝির-ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, চোখ দু'টো যেন ঘুমে জড়িয়ে আস্‌ছে। একটু শুই। তুমি ততক্ষণ বাক্সটা ওপরে দিয়ে এস আর আমাদের ভাত বাড়তে বল গে।

অকিঞ্চন তক্তপোষ হইতে নামিয়া মেজের উপর দাঁড়াইল। ঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল যে, দশটা বাজিতে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী আছে। তাহার পর একবার বাহিরের দিকে দেখিয়া, উপরে দিয়া আসিবার জন্য বাক্সটি দুই হাতে তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

ঝির্‌-ঝিরে হাওয়াতে সেদিন দে মহাশয়ের নাক ডাকার শব্দ ক্রমেই পর্দার পর পর্দায় চড়িতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার বাক্স যে সে দিন আর উপরে পৌঁছাইল না, বহুক্ষণ অবধি সে সংবাদ আর তিনি জানিতে পারিলেন না।

॥ চার ॥

বেলা পাঁচটা তেইশ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে যে গাড়ী বর্ধমানে আসিয়া থামে, সেই গাড়ী হইতে নামিয়া অকিঞ্চন ফটকে টিকিট দিয়া প্ল্যাটফরমের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পায়ে চীনাবাড়ীর বার্ণিস জুতা, পরণে নূতন কোরা ধুতি, গায়ে ধব-ধবে লংক্লথের নূতন কামিজ। এক হাতে নানা দ্রব্যপূর্ণ একটি বড় পোঁটলা, অপর হাতে ক্যাম্বিসের একটি নূতন ব্যাগ।

বাহিরে আসিয়া সে একখানি ছই-দেওয়া গরুর গাড়ী ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া সম্মুখের একখানি মিঠাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিল।

আড়াই ক্রোশ কাঁচা মেঠো পথ গো-যানের সাহায্যে মন্থরগতিতে আসিতে রাত প্রায় এক প্রহর হইল। ক্ষান্ত তখন প্রদীপ নিভাইয়া শুইবার উপক্রম করিতেছিল। অকিঞ্চনের ডাকা-ডাকিতে সদরের খিল খুলিয়া দিয়া কহিল,—ভাল যা হোক, রাগ এতদিনে পড়ল ?

অকিঞ্চন কোন কথা না বলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল এবং পোঁট্‌লাটা ক্ষান্তর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—উনুন ধরিয়ে আগে একটু চা করে দাও, দেহটা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সারাদিনটা এই রোদে গাড়ীতে কেটেছে। তারপর ঘোরা-ঘুরিও বড় কম হয় নি ত!

ক্ষান্ত পোট্‌লাটা খুলিতে খুলিতে কহিল,—তা দিচ্ছি, কিন্তু এই রকম করে যে আমায় একলা ফেলে গেলে, কি হয় বল দেখি আমার? কি করে যে এই ক'দিন কাটিয়েছি, তা নারায়ণ জানেন। দুর্ভাবনায় মুখে অন্ন দিতে পারি নি, চোখে নিদ্রে আসে নি। তার ওপর বাড়ুয্যে মশায়ের তাগাদা। ক'দিন ধরে বাড়ীর মাটি আর রাখে নি। রোজ তিনবেলা এসে বামুন খোঁজ নিয়েছে যে, তুমি ফেরার হয়ে পালিয়েছ, না ফিরে এসেছ।

—খবর নেওয়াচ্ছি আমি। টাকা আর নোটের চাবুক তৈরী করে, তাই দিয়ে বামনার হাতে গুণে গুণে মারবো।—বলিয়া পেট-কাপড় হইতে কি-একটা রুমালে বাঁধা জিনিস ক্ষান্তর কপোল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল।

চমকিত হইয়া ক্ষান্ত তাহা তুলিয়া লইল এবং খুলিয়া দেখিতে দেখিতে কহিল,—এ কি গো,—এ যে নোটের তাড়া! কত টাকার নোট?

—গুণে দেখ।

তিনবার গণিয়া, হিসাব করিয়া ক্ষান্ত চোখ কপালে তুলিয়া কহিল,—এই ক'দিনে তিনশ' টাকা এনেছ তুমি?

ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়া টাকার শব্দ করিতে করিতে অকিঞ্চন কহিল,—তিনশোর স্যাঙ্গাৎ-ভাইরা আবার এখানে সব আছে।

—ও কত?

—তা প্রায় শ'খানেক।

চমকের বেগ কতক কাটিয়া গেলে, ক্ষান্ত স্বামীর সহিত আরও দুই-চারিটি কথা কহিয়া, চা তৈয়ারী করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে বাঁড়ুয্যে মহাশয় আসিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই, অকিঞ্চন কহিল,—টাকা আপনাকে সবই এখনই শোধ করে দিতে পারি, কিন্তু দেব না। কেননা, আপনিই বলেছেন যে, আষাঢ় মাসের ভেতর দিতে। তাই দেব আপনাকে। তবে, সুদ কিছু না হয় দিয়ে দেবো এখন, ওবেলা একবার আসবেন। পরশু এদের সব নিয়ে আমায় আবার যেতে হবে। সেখানে বিস্তর কাজ ফেঁদে এসেছি, বেশী দিন ত আর এখানে পড়ে থাকতে পারব না।

বৈকালের দিকে বাঁড়ুয্যে মহাশয় আবার আসিলেন এবং অকিঞ্চন তাঁহাকে সুদের বাবত ৫০ টাকা দিয়া কহিল, হয় ত আষাঢ় মাসও লাগবে না : ও-মাসেই আপনাব বেবাক দিয়ে ফেলবো।

পরদিন গোছ-গাছ করিতেই কাটিয়া গেল এবং তৎপরদিন ক্ষান্তকে লইয়া অকিঞ্চন কলিকাতা রওনা হইল।

কলিকাতায় সে কোনও বাসার ঠিক না করিয়াই ক্ষান্তকে লইয়া গেল, সুতরাং হাওড়ায় নামিয়া সে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বরাবর কালীঘাটে মন্দিরেব নিকটবর্তী এক যাত্রি-নিবাসে গিয়া উঠিল। সেখানে দৈনিক ৮ আনা হারে ৭ দিনের জন্য একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিবার পব অনেক অনুসন্ধান করিয়া চেতলার হাটের ঐ দিকে ১৫ টাকা ভাড়ায় একটি ছোট টীনের বাড়ী ভাড়া করিল।

অতঃপর অকিঞ্চন সুবিধামত একটি কাজের সন্ধানে প্রত্যহ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল এবং সকাল-সন্ধ্যায় পাঁচ জায়গায় যাতায়াত করিতে লাগিল।

॥ পাঁচ ॥

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর 'দৈনিক জগৎ' সংবাদ-পত্রের সুবৃহৎ কার্যালয়। প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া যেখানে উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক দিনের কাগজ কাঠের বোর্ডে আঁটা হইয়া ঝুলিতে থাকে, সেখানে সদা-সর্বদাই অসংখ্য পাঠকের সমাবেশে বাহির হইতে

ভিতরে প্রবেশ করা দুষ্কর হয়। কর্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠের জন্যই অধিকাংশ পাঠক ব্যস্ত। এইখান হইতেই বামপদে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অকিঞ্চন দুই দিন চলিতে পারে নাই।

দ্বিতলে সুবিস্তৃত হলে শ্রেণীবদ্ধভাবে অসংখ্য কর্মচারী নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত। তাহারই একদিকে সম্পাদকের গৃহ, বিজ্ঞাপন বিভাগ, সহকারী সম্পাদক, চিত্র-বিভাগ ক্যাশ প্রভৃতি এবং অপরদিকে প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ঘরে স্বত্বাধিকারী যতীশবাবুর খাস আফিস।

খসখসের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইতে একটি ভদ্রলোক এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,--কি খবর, হঠাৎ তলব কেন ?

যতীশবাবু কিসের একটা হিসাব দেখিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়া কহিলেন,—বসুন, কয়েকটা নালিশ রুজু করে দিতে হবে।

ভদ্রলোকটি যতীশবাবুরই উকীল এবং বন্ধু। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ী-ভাড়ার নালিশ ত ?

--শুধু ভাড়া নয়। ভাড়া আছে, হ্যাণ্ডনোট আছে, মর্টগেজ আছে, চিটিং আছে—

–ঠ'কে ঠ'কে এত সাবধান হয়েও আবার চিটিংএর কেশ ?

—কি করি বলুন, মতিবাবু। সাবধান হয়েও পারি নি। মানুষ হয়ে মানুষকে কত অবিশ্বাস করি বলুন ? খুব সাবধান হয়েই কাজ করি, তাই রক্ষে, নইলে আমাকেই এতদিনে কেউ না কেউ 'চিট' করে নিয়ে গিয়ে মানুষ বেচার দেশে হয় ত বিক্রী করে দিয়ে আসতো।

একটু থামিয়া যতীশবাবু আবার কহিলেন,—কিন্তু জুচ্চুরী, বাটপাড়ি, ঠকামী করেও ত কেউ কিছু সুবিধে করতে পারে না, আগেও যেমন তা'দের হা-ভাত, পরেও ঠিক তাই। তবু এরা সৎপথে চলে না কেন, তাই শুধু আমি ভাবি।

—সৎপথের প্রথম দিকটায় চলতে বড্ড হোঁচট লাগে কি না। যাক্, আপনার হরেকেষ্টর খবর কি ?

—তার কথা আর বলবেন না। বাপের শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ সব মিছে কথা। ঐ বলে এক মাসের মাইনে ফাঁকি দিয়ে একেবারেই সরে পড়েছে। খবর নিলুম, তার বাপই ছিল না।

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাপই ছিল না কি রকম ?

—বাস্তবিকই ওর বাপ ছিল না। ওর জন্মের ৩।৪ মাস আগেই নাকি ওর বাপ মারা যায়। কিন্তু হরেকেষ্টর জায়গায়, মতিবাবু, এতদিনে খুব ভাল একটি লোক পেয়েছি ; সত্যই ভাল।

—কিন্তু তা'র ঐ চেয়ারের গুণে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়, তা বোধ হয় বলা যায় না।

—এর বিষয়ে খুব পারা যায়। এ লোকটির চেহারা, কথা-বার্তা, হাব-ভাব, কাজ-কর্ম দেখলেই বলা যায় যে, এর দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হতে পারে না। সংসারের টান নেই, কারণ, সংসারে এর কেউ নেই। সন্ন্যাসীর মতই থাকে। তবে ভগবানের ওপর এর বড় অভিমান।

—তার কারণ ?

—তার কারণ, চিরকাল ভগবানকে ডেকেই এর দিন কেটেছে, অথচ বছর কতক হ'ল, সাতদিনের মধ্যেই কলেরায় এর পরিবার, ছেলে, মেয়ে, এক বিধবা ভগিনী, গুষ্ঠীশুদ্ধ সব মারা যায়। তারপরে, পাড়া-প্রতিবাসীরা এক-জোট হ'য়ে এর দু'চার বিঘে জমি-জমা যা ছিল, তাও ফাঁকি দিয়ে নেয়। সেই ধিক্কারে লোকটি দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। তাই ভগবানের ওপর এর যত নালিশ আর অভিমান। অভিমান বটে, অথচ দিনের ভেতর পঞ্চাশবার তাঁর নাম করতেও ছাড়বে না।

এই সময়ে একটি লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীশবাবু তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—পাওয়া গেল ?

গোটা-চারেক কলের মুখের 'ষ্টপ-কক' টেবিলের উপর রাখিয়া লোকটি কহিল,—খুব ভাল 'মেক'ই এনেছি বটে, তবে ঘুরে ঘুরে আঠার আনার কমে কোথাও আর পেলুম না। চারটেতে সাড়ে চার টাকা নিয়েছে।

চমকিত হইয়া যতীশবাবু কহিলেন,—বল কি হে? হরেকেষ্ট বরাবর ড়ু'টাকা করে এনেছে! বোধ হয়, ড়ু'একবার ন'সিকে করেও নিয়েছে। যাক। তা হলে দশ টাকার সাড়ে পাঁচ টাকা ফিরেছে বলো?

পকেট হইতে একখানা ১০ টাকার নোট ও সাড়ে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া যতীশবাবুর সম্মুখে রাখিয়া লোকটি কহিল,—সাড়ে পনর টাকা ফিরেছে।

বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে যতীশবাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—দশ টাকা দিলুম, সাড়ে পনর টাকা ফিরল কি রকম?

—ড়ু'খানা নোট দিয়েছিলেন, বাবু! বোধ হয়, তাড়া-তাড়িতে ভুল হয়েছিল। নতুন নোট, গায়-গায় চেপে বসেছিল আর কি —বলিয়া লোকটি ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিল,—একটা পয়সা আমায় দিন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক পয়সার বাতাসা এনে একটু জল খাই।

যতীশবাবু টেবিলের উপর হইতে একটি আনি তুলিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন,—তেষ্টা পেয়েছিল ত এই থেকেই পয়সা নিয়ে সরবং খেয়ে এলে পারতে।

—তা কি পারি বাবু! আপনার বিনা অনুমতিতে কি সেটা কখন সম্ভব হয়?

লোকটি চলিয়া গেলে মতিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—এরই কথা আপনি বলছিলেন বোধ হয়?

—হ্যাঁ।

—এর বাড়ী কোথায়?

—বীরভূম জেলা। এখানে শ্যামবাজারের ওদিকে টীনের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।

—কি নাম ?

—ধর্ম্মদাস মিত্তির।

*   *   *   *   *

মাস-খানেক পরে হঠাৎ একদিন যতীশবাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া মতিবাবু ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিলেন,—কি খবর, যতীশবাবু ?

যতীশবাবু কহিলেন,—আরে মশাই, বেটা একরাশ টাকা-কড়ি নিয়ে ভেগেছে।

—কে ?

—সেই ভণ্ড, বিটলে, বাটপাড়, র‍্যাসকেল্—

—আপনার সেই ধর্ম্মদাস মিত্তির ?

—আরে হ্যাঁ মশাই ! বেটা মহা জোচ্চোর, ধড়ীবাজ ! ভণ্ডের শিরোমণি !

—কি নিয়ে সরেছে ?

—তা বেশ ভাল রকমই নিয়ে গেছে। খান সাত-আট বিল আদায় করে প্রায় শ'পাঁচেক টাকা নিয়েছে। দত্ত কোম্পানীর দোকান থেকে বারো ভরির এক ছড়া সোণার হার তাকে দিয়েই কাল আনতে পাঠিয়েছিলুম, সেটা নিয়েছে, আমার সোণার ঘড়ীটা এই ড্রয়ার থেকে নিয়েছে, জামা থেকে সোণার বোতাম সেটটা—

—ভগবানের ওপর অভিমান করেই নিয়েছেন আর কি, নইলে ধর্ম্মদাস কখনও এতটা অধর্ম্ম করতে পারেন কি ?

—আরে ও নামই বোধ হয় ওর নয়। তার একখানা গীতা তার ডেস্কের মধ্যে ছিল, সেখানা সে প্রায়ই পড়তো। গীতাখানা সে ফেলে গেছে। তাতে নাম লেখা—অকিঞ্চন পাল।

—শ্যামবাজারে তার বাসায় খোঁজ নিয়েছিলেন ?

—সে সবই মিথ্যে, মতিবাবু, সবই মিথ্যে। সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, টীনের বাড়ী-টাড়ী নেই, রাজসাহীর কে একজন জমীদারের প্রকাণ্ড চারতলা এক বাড়ী।

মতিবাবু যতীশবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

॥ ছয় ॥

সকাল সাতটা সাতাশ মিনিটের সময় 'আগরা ক্যাণ্টনমেণ্ট এক্সপ্রেস' হাওড়া হইতে ছাড়িয়া দিবার জন্য যখন তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল, তখন এক হাতে ক্ষান্তর একখানা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে ছুটিতে অকিঞ্চন তাড়াতাড়ি কাছের যে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা পাইল, তাহাতেই উঠিয়া পড়িল। সঙ্গের কুলী প্রকাণ্ড এক ষ্টীলের তোরঙ্গ ও বিছানার একটা মোট তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া পয়সা লইয়া গেলেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সেখানি মেয়েদের গাড়ী। অকিঞ্চন দেখিল, সকল আরোহীই পশ্চিমা স্ত্রীলোক। কি-একটা কথা লইয়া সকলেই মহা কলরবের সৃষ্টি করিয়াছে। ও-দিককার খালি বেঞ্চে ক্ষান্তকে বসাইয়া দিয়া অকিঞ্চন তাহার মুখের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—ব্যস্, কাজ ফতে, আমায় পায় কে, এইবার হরদম স্ফূর্তি—বাকী কথা মুখের ভিতরই রাখিয়া, পকেট হইতে বিড়ি দেশলাই বাহির করিয়া অকিঞ্চন বিঁড়ি ধরাইল!

গাড়ী শ্রীরামপুর আসিলে, একজন চেকার আসিয়া কহিল,—এটা মেয়েদের গাড়ী, আপনাকে অন্য গাড়ীতে যেতে হবে। অকিঞ্চন একটা যুক্তি দেখাইয়া কি বলিতে গেল, চেকার মাথা নাড়িয়া কহিল,—না না, মেয়েদের গাড়ীতে পুরুষ থাকবে কি রকম? নেমে যান, নেমে যান! অগত্যা অকিঞ্চন অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সে কামরাটিতে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে তখন এক মহা তর্ক চলিতেছিল। তর্ক—পুরুষদের জুয়াচুরি ও মেয়েদের

জুয়াচুরি সম্বন্ধে। অবশ্য এ দেশের নহে—বিলাতের। অকিঞ্চন মাঝখানে আসিয়া তর্ককে আরও প্রবল করিয়া তুলিল; কহিল,—মশাই, ও জাত পুরুষের ঘাড়ে—বুঝতে পেরেছেন ত? তার সাক্ষী আরব্য উপন্যাস পড়েছেন ত? সুতরাং—

তর্ক আলোচনা তুমুলভাবে চলিতে লাগিল। গাড়ীও ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিতে লাগিল।

* * * * *

শ্যাওড়াফুলি ষ্টেশনে একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক মেয়ে-কামরায় উঠিয়া ক্ষান্তর সম্মুখে আসিয়া বসিল।

স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, দোহারা, মুখখানি ঢল-ঢল, চোখ দুটি আয়ত, দৃষ্টি উজ্জ্বল। তাহার পরনে শান্তিপুরী একখানি কার্নিসপাড় শাড়ী, নাকে ওপ্যালের নাকছাবি, কানে কানফুল, কপালে উল্কি, মুখে দোক্তা দেওয়া পান, এবং তাহারই রসে ঠোঁট দু'টি টুক্‌টুকে।

স্ত্রীলোকটি বসিয়া ক্ষান্তকে জিজ্ঞাসা করিল,—কোথা যাবে ভাই?

ক্ষান্ত কহিল,—বর্ধমান।

—আমিও যাব। সেখানে আমার ভাই রেলেতেই কাজ করে। তোমাকে যেন কোথাও দেখেছি ভাই, কোন্ গাঁয়ে বাড়ী বল ত?

—বর্ধমান থেকে আড়াই কোশ তিন কোশ যেতে হয়,—তালচটী।

—তালচটী? তালচটীতে যে আমি প্রায়ই যাই,—আমার মাসতুত বোনের শ্বশুরবাড়ী।

—কাদের বাড়ী, দিদি?

—সরকারদের বাড়ী, জান?

—সরকারদের? না দিদি।

—চিনবে কি ক'রে বোন্, বৌ-মানুষ ত?

তখন উভয়ে অনেক কথা, অনেক গল্প হইল। ক্ষান্ত কহিল,—হ্যাঁ দিদি, একলা এই রকম গাড়ীতে যেতে তোমার ভয় করে না?

—ভয় কিসের? আমরা ত ধরতে গেলে এক-রকম রেলেরই লোক। তবে, আজকাল ভাই মেয়ে-গাড়ীতে বড্ড চুরি হ'তে আরম্ভ হয়েছে। প্রায় রোজই হচ্চে। এই সে দিন, গাড়ী মগরার ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তু'জন লোক হঠাৎ ঢুকে, চক্ষের নিমেষে একজনদের তোরঙ্গ তুলে নিয়ে চলে গেল, কেউ ধরতেও পারলে না।

—বল কি দিদি?

—কালও ব্যাণ্ডেলে ঐ রকম ব্যাপার হ'য়ে গেছে। তোমার ও তোরঙ্গে খালি কাপড়-চোপড় আছে ত? পয়সা-কড়ি কিছু থাকে ত' বার ক'রে নিয়ে পেট-কাপড়ে বেঁধে রাখ।

—আঁ্যা! টাকা-কড়ি? হ্যাঁ—না—আমার ক্যাশ-বাক্স ওর মধ্যে আছে।

—সেটা বোন্, বা'র করে কোলে করে ধরে নিয়ে বস। কি জানি, বিপদ হ'তে বেশীক্ষণ লাগে না।

ক্ষান্ত তোরঙ্গ খুলিয়া, ষ্টীলের ছোট ক্যাশবাক্সটি বাহির করিয়া কোলের উপর লইয়া বসিল।

দিদি কহিল,—আমি থাকতে অবিশ্যি কোন ভয় নেই, কেন না, আমরা রেলেরই লোক, ভাই-আমার রেলের সব চেয়ে বড় বাবু, এই যেখানকার যত মাষ্টার, সক্কলের ওপরে; তবুও ভাই, সাবধানের মার নেই—বলিয়া দিদি প্রস্রাবের ঘরে যাইয়া ঢুকিল, ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই ক্ষান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—আমিও একবার—

—যাবে? যাও। এই ব্যাণ্ডেলে এসে পড়ল। এখানে বড্ড ভীড় হবে ভাই, এই বেলা সেরে এস।

বাক্সটি দিদির হাতে দিয়া ক্ষান্ত প্রস্রাব করিবার ঘরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও মন্থরগতিতে আসিয়া ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্লাটফরমের কোলে আসিয়া পড়িল।

ব্যাণ্ডেলে গাড়ী পাঁচ মিনিট থামিবে জানিয়া অকিঞ্চন স্ত্রীর খোজ লইবার জন্য মেয়ে-গাড়ীর সামনে একবার আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ক্ষান্ত অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, জানালায় মুখ বাড়াইয়া চারিদিকে কি যেন খুঁজিয়া দেখিতেছে। অকিঞ্চনকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল,—শীগ্‌গির এস, সর্বনাশ হয়েছে !

তখনি গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া অকিঞ্চন কহিল,—কি হ'য়েছে ?

অধীরভাবে হাউ-মাউ করিয়া উঠিয়া ক্ষান্ত কহিল,—ক্যাশ-বাক্স নিয়ে চলে গেছে। ওগো, কি হল গো ! ওরে বাবা রে !

দুই চোখ কপালে তুলিয়া অকিঞ্চন চীৎকার করিয়া কহিল,—ক্যাশ-বাক্স ? ক্যাশ-বাক্স নিয়ে চলে গেছে ! কে—কে—কে নিয়ে গেল ?

—আমি কি চিনি ছাই ! নাকে নাকছাবি, কপালে উল্কী, বাঁ হাতে নাম লেখা, পটল—হরিনাম সত্য। ওগো, বাক্স নিয়ে দিদি কোথায় গেল গো !

—পটল ? হরিনাম সত্য ?—দুই হাতে মাথার দুই পাশ চাপিয়া ধরিয়া অকিঞ্চন সেইখানে নির্জীবের মত বসিয়া পড়িয়া অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনে কহিল,—দিদি নয়, দিদি নয়, সে তোমার ভাসুর—ভাসুর—আমার-ই সে দাদা !

সকাল বেলা।

টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল।

নিশিকান্ত আকাশের দিকে চাহিল; এবং চাহিয়াই রহিল। কিন্তু একথা খুবই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, তাহার মনে কোন প্রকার কবিত্ববোধ জাগে নাই। জাগিয়াছিল গরম-গরম ছোলা-ভাজার বোধ। তাই—শূন্য আকাশ-পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, আধ-পয়সার ছোলা-ভাজা কিনিলেই একটা পয়সা ভাঙ্গাইতে হইবে। বাকী আধলাটাও থাকিবে না, কোন-কিছুতে ঠিক খরচ হইয়া যাইবে; গোটা-জিনিস ভাঙ্গাইলে যা হইয়া থাকে। সুতরাং ছোলা-ভাজার কথাটা ভুলিবার জন্য সে এইভাবে তাহার মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যথা,—মেঘগুলো যেন ঠিক পেঁজা-তূলো। এত মেঘ আসে কোত্থেকে? বারো মাস যদি বৃষ্টি হতো, তা হলে পৃথিবী ভেসে যেতো। ওঃ! রাস্তায় কত জল দাঁড়িয়েচে! লোকটা ভিজতে-ভিজতেই চলেছে। বোধ হয় ছোলাভাজা-টোলাভাজা কিছু কিনতে যাচ্চে আর কি।—নিশিকান্ত একান্ত চেষ্টায় যতই ছোলা-ভাজার কথাটা মনের মধ্যে চাপা দিতে চায়, তাহা ততই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া পড়ে। অবশেষে মনটাকে বিষয়ান্তরে ভাল-ভাবে নিবিষ্ট করিবার উদ্দেশে রন্ধনশালায় রন্ধনরত স্ত্রীর কাছে আসিয়া একটা বাজে গল্পের উপক্রমণিকা সুরু করিতেই, বনমালা বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল,—নিষ্কর্মা লোকের বাজে বকবার সময় থাকতে পারে: কিন্তু কাজের লোকের তা শোনবার সময় থাকে না।—বলিয়াই বনমালা, পাঁচ-ফোড়নের দরকার না থাকিলেও ভাঁড়ার হইতে পাঁচ-ফোড়ন আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে কহিল,—কোন কাজ না থাকে, খই ভাজো গে।—আবার সেই ভাজা। খই-ভাজা, মুড়ি-ভাজা, চাল-ভাজা—ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী, তারপর আসে—ছোলাভাজা।

বনমালার কথার ধাক্কায় নিশিকান্ত প্রথমে সদর দরজায় এবং পরে সেখান হইতে এক-পা এক-পা করিয়া নিকটস্থ চাল-ছোলা ভাজার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং আধ-পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া আনিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া তাহারই ভক্ষণ কার্যে মনোনিবেশ করিল।

আধ-পয়সার ছোলাভাজা; এক মিনিটেই শেষ! আধেয় গিয়াছে উদরে, আধারটি রহিয়াছে হাতে,—কাগজের তৈয়ারী একরত্তি শূন্য ঠোঙ্গাটি। সেইটি নাড়িতে নাড়িতে, যেখানে উহার বুকটি লম্বাভাবে বরাবর আঠা দিয়া জোড়া ছিল, নিশিকাঁন্ত সেইখানটা খুলিয়া ফেলিল। গোল-গাল ঠোঙ্গাটা পাত্ হইয়া তাহার পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। তাহা 'দৈনিক বঙ্গভাষী' পত্রিকার একটুখানি ছিন্ন অংশ। যে কয়টা লাইন তাহার উপর দিকে লেখা ছিল, নিশিকান্ত তাহা পড়িতে সুরু করিল,—'শীঘ্রই কথা-কহার জন্য গৃহে গৃহে ট্যাক্স বসিবে। অবশ্য এই ট্যাক্সই যে শেষ, তাহাও আমাদের মনে হয় না। কথা-কহার ট্যাক্সের পরে হয় ত বায়ু হইতে প্রশ্বাস লইবার জন্যও প্রত্যেকের উপর ট্যাক্স বসিবে; সুতরাং ইহা লইয়া টীকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।'—ইহার পর অন্য সংবাদ লিখিত ছিল। কিন্তু উপরের ঐ সংবাদটুকু পড়িয়াই নিশিকান্ত তৎপ্রতি অতিমাত্রায় মনোযোগী হইয়া পড়িল।—ভারি দরকারী খবর ত! শীঘ্রই কথা-কহার জন্য ট্যাক্স বসিবে? কি সর্বনাশ! কবেকার বঙ্গভাষী?

খবরটার গোড়ার দিকের লাইন কয়টা নাই, সেখান থেকেই কাটা পড়িয়াছে। কাটা পড়িবার আগে, সংবাদটা যাহারা পড়িয়াছিল, তাহারা এইরূপ পড়িয়াছিল,—'গভর্ণমেণ্ট এখন হইতে তামাকের উপর ট্যাক্স বসাইলেন। দিয়াশালাইয়ের উপরও ট্যাক্স বসিয়াছে। চম্‌কাইবার কিছু নাই। হয় ত শীঘ্রই কথা-কহার জন্য গৃহে গৃহে ট্যাক্স বসিবে। অবশ্য এই ট্যাক্সই যে শেষ, তাহাও আমাদের…'ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিধা-বিভক্ত লেখাটার প্রথমাংশটুকু

না থাকাতে, যেটুকু আছে তা পড়িয়া নিশিকান্ত একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। কথা-কহার উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। যেহেতু ঘরে বাহিরে তাহার মস্ত দুর্ণাম যে, সে নাকি বড় বেশী কথা কয়। দুর্ণাম অবশ্য আরও দু'একটা আছে। তাহার মত কৃপণ নাকি জগতে নাই, কথাটা যে মিথ্যা তাহা সে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে। তাহাপেক্ষাও বেশী কৃপণ কে-একজন নাকি কাশীতে আছেন। বরানগরেও একজন ওই রকমই মহাকৃপণ আছেন! সুতরাং তাহার মত কৃপণ 'জগতে নাই'—কথাটা নিঃসন্দেহে অত্যুক্তি দোষদুষ্ট। তারপর, লোকে যে বলে—নিশিকান্ত হলো একটা খাজা মূর্খ,—কথাটা একেবারে বাজে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত সে পড়িয়াছে এবং একবার ছাড়া সে কখনো পরীক্ষায় ফেল হয় নাই। সুতরাং……

তবে—কথাটা সে একটু বেশী বলে বটে, এটা সে নিজেও স্বীকার করে। ইহার একটু বৈজ্ঞানিক কারণও থাকিতে পারে। উচিত মত অর্থব্যয় যেখানে নাই, সেখানে অনুচিত মত বাক্যব্যয় দ্বারা হয়ত সেই 'নাই'-য়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু লোকে সেদিকটা একবার ভাবিয়াও দেখে না।

কিন্তু এ সব কথা ভাবিয়া এখন কোন ফল নাই। কথা-কহার ট্যাক্স বসিলে…। কবে হইতে বসিবে? 'বঙ্গভাষী'তে যখন বাহির হইয়াছে তখন খবরটা যে খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু…।

এই কিন্তুর সূত্র ধরিয়া, বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত নিশিকান্তর মনের আকাশেও দুশ্চিন্তার মেঘ জমিয়া উঠিতে লাগিল। কাগজখানা হাতে করিয়া সে রাস্তার দিকের জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা পূবে বাতাসের ঝাপটা আসিয়া তাহার হাতের কাগজখানাকে, প্রথমে ঘর হইতে দালানে এবং পরে দালান হইতে উঠানে উড়াইয়া লইয়া গেল।

দণ্ডাদেশযুক্ত রায়ের নকল যেমন আসামীর কাছে প্রিয় না হইলেও সে তাহাকে হস্তগত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে, নিশিকান্তও তদ্রূপ হস্ত হইতে পলায়িত, ট্যাক্সের সংবাদ সমন্বিত সেই কাগজ-খণ্ডকে ধরিবার জন্য উহার পিছু-পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে এলোমেলো বাতাসের ঝাপটায় নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে পাইখানার দরজা খোলা পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং 'প্যানের' মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। অগত্যা নিশিকান্ত বিফল-মনোরথ হইয়া পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া বসিল।

সামনের ফুটপাত দিয়া শিবকালী বাজার করিয়া ফিরিতেছিল। নিশিকান্ত তাহাকে ডাকিয়া কহিল,—শুনেছ, কথা-বলার যে ট্যাক্‌সো বস্‌চে!

শিবকালীর বাড়ীতে কুটুম আসিয়াছে। সে খুবই ব্যস্ত। বাজার লইয়া গেলে তবে রান্না চড়িবে। শিবুর মন সেইদিকেই পড়িয়া আছে। সুতরাং নিশিকান্তর কথাগুলো তাহার কানে ঠিক মত পৌঁছাইল না। সে যেন শুনিল,—'কথা-বলা ট্যাক্‌সি এসেচে।' শিবকালী আর না দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে কহিল,—শুনিছি নিশি দা। সেদিন বঙ্কুবাবুর বাড়ী থেকে শুনে এলুম।

চম্‌কাইয়া উঠিয়া নিশিকান্ত মনে মনে বলিল,—বঙ্কুবাবু! সেখান থেকে শিবু এ খবর শুনে এসেছে! তা হ'লে আর কোন সন্দেহ নাই,—একেবারে নীট্‌ খবর!

আসল কথাটা কিন্তু এই—বঙ্কুবাবুর বাড়ীতে সেদিন কে-এক বাবু বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। গাড়ী-বারান্দার মধ্যে তাঁর শূন্য মোটরটি ছিল দাঁড়াইয়া আর তাহার মধ্য হইতে 'রেডিও'-সংযোগে কিসের একটা বক্তৃতা চলিতেছিল। সেই দিনই শিবকালী বঙ্কুবাবুর নিকট হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল যে, আজকাল মোটর-ট্যাক্সীতে রেডিও বসান হইতেছে। সুতরাং কথা-কওয়া মোটর বা ট্যাক্সীর কথা সে যে শুনিয়াছে তাহা ত ঠিকই।

নিশিকান্ত ভাবিল, বঙ্কুবাবু হ'লেন হাকিম লোক; খবরের গেজেট বললেই হয়। সুতরাং শিবু যখন ওইখান থেকে কথাটা শুনে এসেছে, তখন এ কথা একেবারেই পাকা।

এমন সময় নন্দলাল পান চিবাইতে চিবাইতে এবং সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আফিস যাইতেছিল। নিশিকান্তের ডাকে সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিশিকান্ত কহিল—শোননি বোধ হয়, কথা বলার ওপর যে ট্যাক্স বসবার ব্যবস্থা হচ্চে।

নন্দলাল হইল সেই প্রকৃতির লোক, যে সব বিষয়েই—সত্য করিয়াই হউক, আর মিথ্যা করিয়াই হউক—'সব-জান্তা' হইতে চায়। কেহ যে তাহার অপেক্ষা কিছু বেশী জানিবে বা আগে জানিবে, ইহা সে হইতে দিবে না। সুতরাং টপ্ করিয়া বলিল,—অনেকদিন আগে শুনিচি। আইনের যখন খসড়া তৈরী হয়, তখনই আমি···হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ! মিষ্টার তাজমল খাঁর ভাইপোর ভায়রা-ভাই হলো আমার একেবারে—যাকে বলে বুজুম-ফ্রেণ্ড! সুতরাং···।

আফিসের সময় হইয়া আসিয়াছিল। নন্দলালের যদিও আরও কিছু বলিবার অভিলাষ ছিল, কিন্তু পারিল না। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিশিকান্ত তাহার উদ্দেশে মনে মনে বলিল,—তোমাদের আর কি বল? সারাদিনটা ত তোমাদের কাটে আফিসে। যত কথা, যত গাল-গল্প—সব ত তোমাদের সেইখানেই। এদিকে বউটিকে ত খেয়ে বসে আছ; ঘরে আছে খালি এক বুড়ো পিসী। বাড়ীতে তার সঙ্গে আর কি-এমন কথা কইবে? বিপদ আমার! আমার না আছে আফিস, না আছে বুড়ো পিসী। যিনি ঘরে আছেন, তাঁকে পাঁচশটা কথা বললে তবে একটার উত্তর পাওয়া যায়। সুতরাং রোজ হাজার-পাঁচেক কথা তাঁর উদ্দেশেই আমাকে কইতে হয়। বিপদ ত আমারি!

নিশিকান্ত চিন্তার অকূল সাগরে হাবু-ডুবু খাইতে লাগিল।— কথা বলার ট্যাক্‌সো দিতে হ'লে, সকলের আগে আমাকেই ত মরতে হবে। কত করে ট্যাক্‌স ধরবে? আচ্ছা, কত কথা কওয়া হ'ল, তার ঠিক পাবে কেমন করে?—তা'র আর কি; মিটার বসাবে। মিটারে সব উঠে পড়বে। যা উঠবে, তার থেকে সম্ভবমত 'লেস্ ডিস্‌কাউন্ট' (Less Discount) বাদ দিয়ে, তার ওপর ট্যাক্‌স ধরবে।—উঃ! সারবে আমাকে এইবার।—কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—ট্যাক্‌স আমি কিছুতেই দিচ্চি না! তা হ'লে মরেই যাব! বরং কথা কহাই আমি বন্ধ করব।—হ্যাঁ করব। ঠিকই করব। নিশ্চয়ই করব।

কিন্তু—হ্যাঁ করব, নিশ্চয়ই করব বলিলেই ত আর হয় না। কি করিয়া করিবে? রোজ কম পক্ষে সে হাজার-পাঁচেক কথা বলে। খুব চেষ্টার দ্বারা না হয় সংখ্যাটাকে কমাইয়া সে হাজারে আনিতে পারে। লেস্ ডিস্‌কাউন্ট (Less Discount) আর কতই হইবে? না হয় এক-শো, বা দেড়-শো? বড় জোর না হয় দুই-শো? তাহা হইলেও মিটারে রোজ আট-শো উঠিবে। তাহা হইলেই মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার কথার উপর ট্যাক্‌স ধার্য হইবে। হাজারে চার আনা হিসাবে যদি ট্যাক্‌স ধরা হয়, তাহা হইলেই ত মাসে সওয়া ছয় টাকা। ইহার বেশীও হইতে পারে। তাহা নির্ভর করে বনমালার উপর। অর্থাৎ বনমালার মেজাজ যদি অন্তত মাসের অর্ধেক দিন একটু বেশী রকম সন্তোষজনক থাকে, তাহা হইলে সওয়া ছ'য়ের স্থলে সওয়া বারো—এমন কি তাহারও বেশী হওয়া বিচিত্র নহে।

নিশিকান্ত প্রতিজ্ঞা করিল, সে দৈনিক বিশ-পঁচিশটির বেশী কথা কিছুতেই কহিবে না,—তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও না। আজই সে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। আজ সে একটা কথাও কহিবে না, আধখানাও না। আজ যদি সে মোটে কথা না কহিয়া কাটাইতে পারে, তাহা হইলে ট্যাক্‌স বসিলে সে অনায়াসে

বিশ-পঞ্চাশটা বা ঊর্ধসংখ্যা একশোটা কথা কহিয়া কাটাইয়া দিতে পারিবে।

কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—

অর্থাৎ—হঠাৎ আজ একটা কোন কারণ ছাড়া কথা একেবারে বন্ধ করেই বা কি করিয়া? কথা বন্ধের একটা হেতু বা উপলক্ষ চাই ত!

বহুক্ষণ পর্যন্ত উপলক্ষের বিষয় চিন্তা করিবার পর নিশিকান্ত দেখিল যে, বনমালার উপর ভীষণ রাগ করা ছাড়া উপায় নাই। সারাটা দিন-ই আজ তাহার উপর খুব রাগ করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু শুধু-শুধুই বা তাহার উপর রাগ করে কি করিয়া। বনমালার প্রতি অকারণে—

অকারণ ত নয়। বেশ সুন্দর কারণ রহিয়াছে। কেন সে নিশিকান্তকে খৈ-ভাজার কথা বলিল? সে ত অন্য কিছু বলিতে পারিত। নিশিকান্ত ভাজিবে—খৈ! সে কি পুরুষ মানুষ নয়, মেয়ে-ছেলে—যে সে খৈ ভাজিবে? তাহার চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেহ কখনো খৈ ভাজে নাই। তাহার খুড়ার মাছ ধরার সখ ছিল বলিয়া কখনো-কখনো চারের মশলা ভাজিত বটে কিন্তু খৈ…! এত বড় স্পর্ধা!

নিশিকান্ত ভীষণভাবে চটিয়া গেল এবং কিছু পরে গুম্ হইয়া বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তেল মাখিল। তাহার পর স্নানান্তে ভাতের অপেক্ষায় নীরবে বসিয়া রহিল।

আজ বনমালা ডা'লে নুন দিতে ভুলিয়াছে। ঝোলেও ঝালের মাত্রা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। নিশিকান্ত বিনা বাক্য-ব্যয়ে কোন রকমে আধ-খাওয়া খাইয়া বিরক্তমুখে উঠিয়া গেল।

যে প্রচণ্ড রাগ খৈ-য়েতে সুরু হইয়াছে, তাহা ডা'লে ও ঝোলে মিশিয়া প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল।

বেলা প্রায় একটার সময় আহারাদি সারিয়া বনমালা শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার 'বনমালী'টি মুখখানাকে বিকট করিয়া,—

কট্-মট্ দৃষ্টিতে দেওয়ালে বিলম্বিত তাহারি কুমারী আমলের একখানা ফটোর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কহিল,—আসল মানুষ সামনে থাকতে, ছবিখানাকে ভস্ম করে আর লাভ কি ?

নির্বাক থাকিয়া নিশিকান্ত বিরক্ত মুখখানাকে অন্যদিকে ফিরাইল।

—ডা'লে নুন দিতে ভুলেচি বলে খুব রাগ হয়েছে তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তখন যদি বলতে ত একটু নুন দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারতুম।

কিন্তু শুধু ডালে নুন লইয়া ত কথা নয়। আসল কথা—খৈ-ভাজা। তার উপর আলুনি ডা'ল আর ঝোলের ঝাল মিলিয়া তাহার রাগকে ত্রিশক্তিসমন্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

নিশিকান্তর ইচ্ছা—খুব একচোট্ শুনাইয়া দেয়, কিন্তু তাহার ত কথা কহিবার উপায় নাই। বরং বনমালার এই অসময়ের ভূমিকাটাতে সে নিজেকে ভিতর ভিতর আরও রাগান্বিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকাল হইতে এই বেলা একটা পর্যন্ত সে কথা না বলিয়া কাটাইয়াছে। আর কয়েক ঘণ্টা কাটাইতে পারিলেই ত হয়। তাহা হইলে, কেমন করিয়া তাহার ট্যাক্স বসে, সে একবার দেখিয়া লইবে।

বনমালা দেখিল, এত রাগ ত নিশিকান্ত কোনদিনই করে না। হোক না কেন ডা'ল আলুনি, ঝোলে ঝাল, কোনদিনই তাহার প্রিয়তমটি ত এরূপ কঠিনতম হয় না। তাহার উপর রাগ করা দূরের কথা, একদণ্ড তাহাকে না দেখিয়া বা তাহার সহিত কথা না কহিয়া সে থাকিতে পারে না। কিন্তু আজ···!

কিন্তু রাগ যখন হইয়াই পড়িয়াছে, তখন আর উপায় কি ? এরূপ ক্ষেত্রে যাহা কর্তব্য, অতঃপর বনমালা তাহাই করিল। অর্থাৎ ভাল করিয়া দুই খিলি পান সাজিয়া আনিয়া হাসিমুখে স্বামীর সামনে ধরিল। বলিল,—মুখের রস আজ একেবারেই শুকিয়ে গেছে ; পান দু'খিলি খাও দিকি, একটু সরস হবে'খন।

গম্ভীর মুখখানাকে নিশিকান্ত অন্যদিকে ফিরাইল।

তখন বনমালা অতি মৃদুকণ্ঠে সুর করিয়া বলিল—

হ'য়ে থাকি অপরাধী,
এস ওগো গুণনিধি,
তব প্রেম-পাশে বাঁধি,
সাজা দেও দাসীরে।

ধাঁ করিয়া বনমালার হাত হইতে পানের খিলি দুইটা ছিনাইয়া লইয়া নিশিকান্ত ঘরের এক কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বনমালা কহিল,—বুঝতে পেরেছি। আজ যে পেট-ই খালি। খালি পেটে পান —দাঁড়াও, আমি দোকান থেকে খাবার আনিয়ে দিচ্চি। বলিয়া বনমালা বালিসের তলা থেকে বাক্সের চাবিটা লইল।

নিশিকান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি করিয়া সে বারণ করে? এখনি হয়ত চার গণ্ডা পয়সার খাবার আনিয়া সর্বনাশ ঘটাইয়া বসিবে! কাগজে লিখিয়া বনমালার চোখের সামনে ধরিলে হয়। কিন্তু ঘরে ত সাদা কাগজ নাই। পেন্সিল দিয়া ঘরের মেজেতে লিখিয়া দিলেও চলে। কিন্তু পেন্সিলই বা কোথায়? দোকান হইতে কিনিতে গেলে এখনি একটা পয়সা দাম লইবে। আর সে সময়ও নাই। খোলাম-কুচি দিয়া লিখিলেও হয়। পায়খানার পিছন দিকটায় অনেকগুলো খোলাম-কুচি পড়িয়া আছে। নিশিকান্ত আনিতে ছুটিল।

এদিকে বনমালা পাশের বাড়ীর গৌরকে ডাকিয়াছে। গৌর আসিলে বনমালা তাহাকে বলিল,—তোর কাকাবাবুর আজ খাওয়া হয়নি বাবা! ঐ মোড়ের দোকান থেকে এক টাকার ভাল দেখে খাবার আনতে পারবি?

গৌর সোৎসাহে বলিল,—পারব খুড়ীমা।

বনমালা বাক্স খুলিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিল।

নিশিকান্ত অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার হাতের খোলাম-কুচি হাতেই রহিল।

বনমালা গৌরের দিকে চাহিয়া কহিল,—সিঙ্গাড়া, কচুরি মিহিদানা, রসগোল্লা—সব রকম মিলিয়ে এক টাকার এনো।

নিশিকান্ত ছট্-ফট্ করিতে লাগিল, তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল ; গা ঘামিয়া উঠিল।

বনমালা কহিল,—দেরী করো না বাবা ; ছুটে যাও।

চক্ষের নিমিষে নিশিকান্ত লাফাইয়া উঠিল। গৌরের মুঠার মধ্যে টাকাটা চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বনমালাকে বলিয়া উঠিল,—আহা হা, কর কি ছাই! রাগ আমি করিনি কো! টেক্‌সোর জন্যে আজ···

—টেক্‌সো! কিসের টেক্‌সো?

—কথার টেক্‌সো! কথার টেক্‌সো। এস, সব বলচি।

নৌকা মাঝ-দরিয়ার কাছাকাছি আসিয়া ডুবিয়া গেল।

আর সেই সঙ্গে বনমালা অবাক হইয়া নিশিকান্তর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

হেডফোন

অবশেষে উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়িল। কেমন করিয়া এই অঘটন ঘটিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

শ্রীমান্‌টি ছিল ভবানীপুরে,
শ্রীমতী ছিল কালীঘাটে;
একদা কোন্ ফাঁকে আলাপ হ'লো দোঁহে,
সন্ধ্যায় 'লেক'-এর মাঠে।

তখন একদিন সন্ধ্যায় লেকের কুঞ্জবনের তলে বসিয়া মতিলাল বলিল,—তোমাকে না পেলে আমি ঐ সামনের রেল-লাইনের ওপর শু'য়ে পড়ে ট্রেনের চাকার তলায় প্রাণ দোবো।

সবিতা বলিল,—আর আমি তা'হলে লেকের জলে ডুববো।

আকাশের প্রান্তে বড় এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়া মতিলাল কহিল,—তোমাকে আর একদণ্ড না দেখে আমি থাকতে পারি না, সবু। কি ভাবে যে সারাটা দিন ছট্‌-ফট্ করে কাটিয়ে বিকেলের অপেক্ষায় থাকি, আমিই জানি।

মতিলালের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সবিতা কহিল,—আমার মনের কণ্ঠে মতির মালা হ'য়ে তুমি চব্বিশ ঘণ্টাই তুলচো। যখন চোখের সামনে তোমাকে পাই না, তখন চোখ বুজলে তোমাকে পাই।

দিন দুই পরে একদিন দুপুরবেলা মতিলাল অতিমাত্রায় কাতর হইয়া ভূপেনের বৈঠকখানায় ঢুকিল ও পাখার সুইচটা টিপিয়া দিয়া তক্তাপোষের উপর চিং হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল—উঃ!

ভূপেন সম্পর্কে তাহার জ্ঞাতি ভাই। বয়সে পাঁচ-সাত বৎসরের বড়। ভূপেন কহিল,—কি হ'লো রে মোতে? ও-রকম করে শু'য়ে পড়লি কেন?

—উঃ! গেলুম ভূপি-দা!

—বেশই ত ছিলি; আবার তোব বুক ধড়-ফড়ানী আরম্ভ হলো না কি?

বুক চাপিয়া ধরিয়া, চক্ষু বুজাইয়া, মতিলাল কহিল,—ভয়ানক! বাঁচাও ভূপি-দা, বাঁচাও!

—না, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না! তোর বিয়ের ত সব ঠিক্‌-ঠাক্‌ করে ফেলেচি। সেই পদ্মরাণী মেয়েটিকে একদিন—

—আরে রাম রাম! সেই জঘন্য মেয়েটাকে—। তোমরা যে কী-ঈ-ঈ—

—তা তুই আর কোন মেয়েকে পছন্দ-টছন্দ করে থাকিস্‌ যদি ত খুলে বল না; খুড়ীমাকে বলে আমি রাজী করাব এখন।

লাফাইয়া উঠিয়া মতিলাল কহিল,—তাই করাও ভূপি-দা, নইলে আমি প্রাণে বাঁচবো না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি……।

—তোর পছন্দ হ'য়েচে?

—খুব।

—স্বভাব-চরিত্র বা দেখতে-শুনতে ভাল ত?

—একেবারে অতি চমৎকার।

—একে যোগাড় করলি কোত্থেকে? নাম কি মেয়েটির?

—সবিতা। সবিতাকে না পেলে ভূপি-দা আমি আত্মহত্যা করব! তোমার পায়ে পড়ি ভূপি-দা……।

পায়ে পড়ার বদলে, মতিলাল ভূপেনের হাত দুইটা জাপ্টাইয়া ধরিয়া তাহার বাকী কথাগুলো সকাতর চাহনি দ্বারা প্রকাশ করিল।

বিধবা মায়ের মতিলাল একমাত্র সন্তান। ভূপেনের সাহায্য বা পরামর্শ না লইয়া মতির মা কোন কাজই করেন না। ধরিতে গেলে ভূপেনই ও-বাড়ির অভিভাবক। ভূপেন বলিল,—তোকে কোন-এক জায়গায় গছিয়ে দিতে পারলে, তুইও বাঁচিস্‌, আমরাও বাঁচি। আচ্ছা, খুড়ীমাকে বলে-ক'য়ে রাজী করাবো এখন।

মতিলাল প্রফুল্লমনে ভূপেনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে আবার মতিলাল সেদিনের মতই নির্জীব ও কাতর হইয়া আসিয়া ভূপেনের তক্তাপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

ভূপেন কহিল,—আবার ও-রকম করে পড়লি কেন? খুড়ীমাকে ত সব কথা বলেচি! তাঁর মত ত হয়েচে। সেই সবিতা মেয়েটির······।

—ছাড়ান দাও ভূপি-দা। ও আর দরকার নেই।

—আবার কি হলো রে?

—আরে অতি জঘন্য! যেমন রূপ, তেমন গুণ! যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই! ন্যাস্‌টি!

মৃদু হাসিতে হাসিতে ভূপেন কহিল,—তোকে নিয়ে দেখচি মহা-মুস্কিল হলো, মোতে!

বুকটা চাপিয়া ধরিয়া মতিলাল কহিল,—এইবার ভূপি-দা, মুস্কিলের আসান্ হবে তোমাদের। এইবার ঠিক মরব! উঃ!

—আবার বুক ধড়-ফড়ানী সুরু হলো না কি? হ্যাঁরে মোতে?

—না ভূপি-দা, আমার কিছু হয়নি। আমার শরীর খুব ভাল আছে; আর মরে না যাওয়া পর্যন্ত খুব ভালই থাকবে। উঃ!

—তুই মরবার আগে, তোকে নিয়ে যে আমরাই মলুম। তা আর কোন মেয়ে-টেয়ে ঠিক-ঠাক্ করেছিস্ নাকি? সব কথা খুলে বলবি। করেছিস্?

মতিলাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে—করিয়াছে।

ভূপেন কহিল,—এ মেয়েটি তোর সত্যিই পছন্দ ত?

—একে না পেলে আমি নির্ঘাত বিষ খাবো, এটা ঠিকই জেনো।

—এর নামটি কি?

—লাবণ্য, বালীগঞ্জে বাড়ী। তার বাপ-মায়েরও আমাকে খুব পছন্দ হয়েচে।

—পছন্দ ত হ'বারই কথা। তা, হ্যাঁরে মোতে, এত সব যোগাড় করে ফেলিস্‌ কোত্থেকে ? তোর বাহাদুরী আছে।

একটু নীরব থাকিবার পর মতিলাল কহিল—শুধু একলার বাহাদুরী নয় ভূপি-দা, ও-পক্ষেরও বাহাদুরী !—বলিয়া মতিলাল বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—উঃ ! বুক গেল রে বাবা !

* *

বালীগঞ্জ।

লাবণ্যদের বাটী।

মতিলাল লাবণ্যের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—যুগে যুগে তুমি আমারই, আমি তোমারই, লাবু—ছিলুম, আছি এবং থাকবো।

প্রশান্ত আনন্দভরে লাবণ্য কহিল,—স্বপ্নরাজ্যের ভেতর এতদিন আমরা দু'জনে দু'জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। জীবনের এক শুভতম ক্ষণে দু'জনে দু'জনকে পেয়ে গেলুম।—মা আসচে !

লাবণ্যর মা দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন—চা খাও, বাবা। কর্তা তোমার টাকা দু'শো পেয়ে কি আহ্লাদ ! বলেছিলেন, দু'দিন পরে আমার জামাই হবে বটে, কিন্তু ও আমার জামাই ত নয়, আমার ছেলে।—হ্যাঁ বাবা মতিলাল, টাকা যে দিলে, তোমার মা রাগ্‌-টাগ্‌ ত করবেন না ?

চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে মতিলাল কহিল,—মা ত জানেন না। আর ও-টাকা ত আমার নিজের।

—সুখে থাক বাবা। লাবু চা খাওয়া হ'লে মতিলালকে পান এনে দিও—বলিয়া লাবণ্যর মা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

—লাবু, পান্নার দুল-জোড়াতে তোমার সুন্দর মুখখানা আরও যে কত সুন্দর দেখাচ্ছে, তা আর কি বলবো !

—৭০ টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেচো, ভালো হবে না ? তা এ পেত্নীর জন্যে এতগুলো টাকা—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মতিলাল কহিল—অতগুলো টাকা! যদি ইন্দ্রের মত স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হতুম, তা হ'লে সে স্বর্গরাজ্যও তোমার জন্যে অকাতরে আমি দিতে পারতুম লাবু।

মতিলালের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া লাবণ্য পান আনিতে উঠিয়া গেল।

* * * *

আজ ২০শে।

২৬শে শ্রীমতী লাবণ্যর সহিত শ্রীমান মতিলালের শুভ-বিবাহ।

কিন্তু বেলা ৫টা ৪৭ মিনিটের সময় মতিলাল পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায়, বহুকালের রোগীর মত টলিতে টলিতে বাহির হইতে আসিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

প্রভেদের মধ্যে এবার নিজের বাড়ী এবং নিজের শয্যা। এবং এবার চিং নহে—উপুড়।

নীচের দালানে তখন ভুপেন আসিয়া মতিলালের মাতার সহিত কি-সব কথা কহিতেছিল। মতিলালের অবস্থা দেখিয়া, ভুপেন তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কী হলো রে, মোতে?

—শীগ্‌গির একজন ডাক্তার আনো ভুপি-দা, বোধ হয় হার্টফেল হয়ে যেতে পারি!

—কেন? আবার তোর হ'লো কি? এই ক'টা দিন বাদেই ত—।

কম্পিত কাতরকণ্ঠে মতিলাল কহিল—সে আর হ'বে না, ভুপি-দা!

—হ'বে না মানে?

—হ'বে না মানে—হ'বে না। সে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলেচে!

—বলিস্ কি রে!

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি সেই গানের মাষ্টার ব্যাটাকে যদি না খুন করি ত আমার নাম মতিলাল নয়।

উত্তেজিত হইয়া মতিলাল ঘুসি পাকাইয়া উঠিয়া বসিল।

কয়েক সেকেণ্ড নির্বাক থাকিবার পর ভূপেন কহিল,—নাঃ! তার বিয়ে নিয়ে দেখছি মুস্কিলেই পড়া গেল! একেবারেই যাকে বলে—হোপ্‌লেস্‌।

কিন্তু ভূপেন যাহাই বলুক না কেন, হোপ্‌লেস্‌ কিছুতেই নয়। কারণ, তিন-চারদিন পরেই দেখা গেল, সিনেমা-হাউসের সামনে মতিলাল আর-একটি তরুণীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং দু'জনেরই চোখে-মুখে হাসি ছিটকাইয়া পড়িতেছে।